সব ভুতুড়ে লীলা মজুমদার

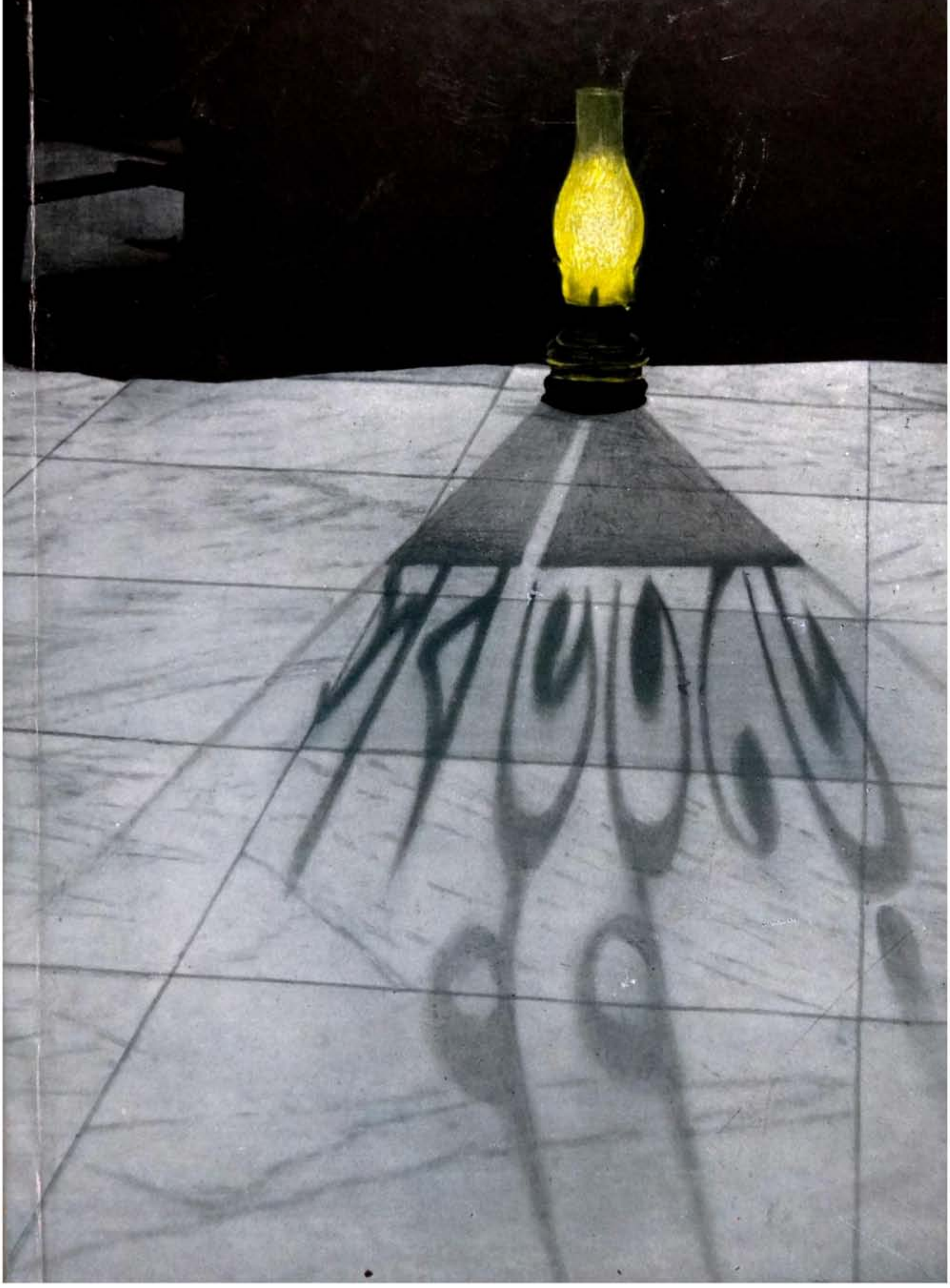

সত্যিসত্যি ভূতের দেখা পেয়েছেন, এমন ভাগ্যবান মানুষ ক'জন আছেন জানি না, কিন্তু ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগে না, এমন মানুষ বোধহয় একজনও নেই। ছোট থেকে বড়— সকলেরই প্রিয় ভূতের গল্প। সে একলা ঘরে বসে ভয়-ছমছম বুকে বই পড়াতেই হোক, কি আড্ডায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ভূতের গল্প শোনাতেই হোক। সে এক আলাদা রোমাঞ্চ।

লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পে অবশ্য দুটো স্বাদই একসঙ্গে। পড়ার আনন্দ তো আছেই, কিন্তু আড্ডার আমেজও মিশে থাকে তাঁর লেখায়। আসলে তাঁর ভঙ্গিটিই এমন মজলিশি, জমাটি আর ফুরফুরে কৌতুকমেশানো যে, তিনি যখন ভূতের গল্প শোনান, তখন তা শুধুই ভয়ের গল্প হয়ে শেষ হয় না।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা মুছে গিয়ে এমন একটা নতুন রসের সৃষ্টি হয়, যেখানে সব ছাপিয়ে থাকে মজা।

আর এই মজা যাতে বজায় থাকে, সেই কারণেই বোধ করি, লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পে ভূত ঠিক ভূতের তথাকথিত বীভৎস চেহারা নিয়ে হাজির হয় না। অর্থাৎ, ভাঁটার মতো চোখ, মুলোর মতো দাঁত, মাংস নেই, শুধু অস্থিসার— এমনতরো মামুলি ভূত তাঁর গল্পে অনুপস্থিত। তাঁর গল্পে ভূতের চেহারা নিপাট ভালমানুষের মতন, শুধু হাবেভাবে মালুম হয় যে তারা ভূত। তাও তারা মানুষের যে কোনও ক্ষতি করে না, এ-কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এহেন লীলা মজুমদারের যাবতীয় ভূতের গল্প একত্র করে বেরুল এই সংকলন— 'সব ভুতুড়ে'। সন্দেহ নেই, ছোটদের, বড়দের, সকলের জন্য এ এক দুর্দান্ত উপহার।

....

ISBN 81-7066-821-2

লীলা মজুমদারের জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। কলকাতায়, জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে। বাবা প্রমদারঞ্জন রায় 'বনের খবর' প্রণেতা এবং ভারতীয় জরিপ বিভাগের কর্মী। স্বামী ডাঃ সুধীরকুমার মজুমদার। শৈশব কেটেছে শিলং পাহাড়ে। ১৯২০ সাল থেকে কলকাতায়। বি-এ এবং এম-এ দুই পরীক্ষাতেই ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন। দার্জিলিঙে, শান্তিনিকেতনে, কলকাতার আশুতোষ কলেজের মেয়েদের বিভাগে। তারপর সারা জীবন স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চা। মধ্যে শুধু বেতার প্রযোজক হয়েছিলেন কিছুকাল। প্রথম ছোটদের বই: 'বদ্যিনাথের বড়ি'। প্রথম বড়দের উপন্যাস: 'শ্রীমতী'। গত কুড়ি বছর ধরে 'সন্দেশ' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। বহু পুরস্কারে সম্মানিত, যার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, ভারতীয় শিশুসাহিত্যের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রভৃতি।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ নির্মলেন্দু মণ্ডল

সব ভুতুড়ে

লীলা মজুমদার

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৮৩
চতুর্দশ মুদ্রণ মার্চ ২০১২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-821-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

SAB VUTURE
[Horror Stories]
by
Lila Majumder

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১২৫.০০

অনেক দিনের অনেক প্রীতির চিহ্নস্বরূপ
আমার এই শখের বই
প্রিয় বন্ধু

অশোককুমার সরকারের
স্মৃতিতে--

ভূতে বিশ্বাস করে কি না, এ-কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না। বিশ্বাস না করলেও কিছু এসে যায় না। তবে একটি কথা বলি। শুনেছি মরে গেলে শরীরের এক কণাও নষ্ট হয় না। সবই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে চিরকাল রক্ষা পায়। তাহলে মানুষের সত্তার শ্রেষ্ঠাংশই বা বিনষ্ট হবে কেন? আরো বলি, মরে গেলে সেই শ্রেষ্ঠাংশের একটা অশুভ পরিণতিই বা হবে কেন? বিধাতার মঙ্গলবিধানে আমার আস্থা আছে, তাই আমার এই ভূতদের একটু সুনজরে দেখতে হবে। এ-সমস্তর একটিও সত্যি ঘটনা নয়। সব আমি বানিয়েছি। বহু বছর ধরে নানা পত্রিকায়, ও পরে ছোট বই হয়েও কিছু বেরিয়েছে। এখন যতগুলোকে সম্ভব একসঙ্গে করে এই বই হল। তোমরা সকলে বইটি উপভোগ কর। ইতি--

লেখক

সূচী

পেনেটিতে	...	১
আহিরিটোলার বাড়ি	...	৪
অহিদিদির বন্ধুরা	...	৬
ভূতুরে গল্প	...	১১
খাগায় নমঃ	...	১৪
লক্ষ্মী	...	১৮
কাঠপুতলি	...	২২
সত্যি নয়	...	২৫
যুগান্তর	...	২৮
ফ্যাণ্টাস্টিক	...	৩০
পাশের বাড়ি	...	৩৪
দামুকাকার বিপত্তি	...	৩৬
চোর	...	৩৯
বাপের ভিটে	...	৪২
স্পাই	...	৪৫
নটরাজ	...	৪৮
দজ্জাল বৌ	...	৫২
কলম সরদার	...	৫৪
কর্তাদাদার কেরদানি	...	৫৭
আকাশ পিদ্দিম	...	৬২
ছায়া	...	৬৩

সূচী

চেতলায়	...	৬৮
পিলখানা	...	৭১
রাত্রে	...	৭৫
গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস	...	৭৭
অশরীরী	...	৮১
ট্যাঁপার অভিজ্ঞতা	...	৮৪
ভয়	...	৮৬
তেপান্তরের পারের বাড়ি	...	৮৯
সন্ধ্যা হোল	...	৯২
লাল টিনের ছাদের বাড়ী	...	৯৬
সোহম	...	৯৯
আলোছায়া	...	১০২
সোনালি-রুপালি	...	১০৫
পাঠশালা	...	১১০
নাথু	...	১১৪
শেল্টার	...	১১৭
মোটেল	...	১২৪
তোজো	...	১২৮
ভূ-ভূত	...	১৩৩
ভাগ্যদেবী ব্রাঞ্চ হোটেল	...	১৩৫
হরু হবকরার একগুঁয়েমি		১৪০

পেনেটিতে

পেনেটিতে, একেবারে গঙ্গার ধারে, আমার বড় মামা একটা বাড়ি কিনে বসলেন। শুনলাম বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব তাই কেউ সেখানে থাকতে চায় না। সেইজন্য বড় মামা ওটাকে খুব সস্তাতেই পেয়েছিলেন।

যাই হোক, বিয়ে-টিয়ে করেননি, আপত্তি করবার লোকও ছিল না। মেজো মাসিমা একবার বলেছিলেন বটে, "নাই-বা কিনলে দাদা, কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেউ থাকে না কেন?"

বড় মামা রেগে-মেগে বাড়ির কাগজপত্র সই করবার আগে ওঁদের কুস্তির আড্ডার দুজন ষণ্ডাকে নিয়ে সেখানে দিব্যি আরামে দু রাত কাটিয়ে এলেন। ষণ্ডাদের অবিশ্যি সব কথা ভেঙে বলা হয়নি। তারা দুবেলা মুরগি খাবার লোভে মহাখুশি হয়েই থাকতে রাজী হয়েছিল। পরে আড্ডায় ফিরে এসে যখন বড় মামা ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন তখন তারা বেজায় চটে গিয়েছিল। "যদি কিছু হত দাদা? গায়ের জোর দিয়ে তো ওনাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যেত না!"

দুমাস পরে বড় মামা সেখানে রেগুলার বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে গেল বঙ্কু ঠাকুর, তার রান্না যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভোলেনি; আর গেল নটবর বেয়ারা, তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, রোজ সকালে বিকেলে আধ-ঘণ্টা করে দুটো আধমণি মুগুর ভাঁজে। আর ঝগড়ু জমাদার, সে চার-পাঁচ বার জেল খেটে এসেছে গুণ্ডামি-টুণ্ডামির জন্য। এরা কেউ, শুধু ভূত কেন, ভগবানেও বিশ্বাস করে না।

আমরা বরানগরে ছিলাম, আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি। এমন সময় বাবা পাটনা বদলি হয়ে গেলেন আর আমার স্কুল নিয়েই হল মুশকিল। বড় মামা তাই শুনে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, এমন কিছু দূরত্ব পড়বে না। ব্যাটা বঙ্কুর রান্না খাবে আর আমিও আমার নতুন কবিতাগুলো শোনাবার লোক পাব, বন্ধুরা তো আজকাল আর শুনতে চায় না! ভালোই হল।"

শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হল। মা'রা যেদিন সকালে পাটনা চলে গেলেন, আমার জিনিসপত্র বড় মামার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর আমিও সারাদিন স্কুল করে

বিকেলে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম।

মনটা তেমন ভালো ছিল না, মা'রাও চলে গেছেন আবার আমাদের ক্লাসের জগু আর ভুটে বলে দুই ক্যাপ্তেন কিছুদিন থেকে এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে স্কুলে টেকা দায় হয়ে উঠেছিল। আগে ওরাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, কিন্তু পুজোর ছুটির সময় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা এমন পয়ে আকার ছোটলোকের মত ব্যবহার আরম্ভ করেছিল যে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম এখন ওরাই হলেন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, ক্লাবের সেক্রেটারি। সেদিনও ওদের সঙ্গে বেশ একটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে ; সে আবার অঙ্ক ক্লাসে। আমার একার দোষ নয়, কিন্তু ধরা পড়ে বকুনি খেলাম আমিই। ওরা দেখলাম খাতার আড়ালে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

বাড়ি এসেও মনটা একটু খারাপই ছিল! একেবারে জলের মধ্যে থেকে ঘাটের সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। বিশাল বিশাল ঘর, ঝগড়ু আর নটবর তক্‌তকে করে রেখেছে। প্রায় সবগুলোই খালি, শুধু নীচের তলায় বসবার ও খাবার ঘরে আর দোতলায় দুটো শোবার ঘরে বড় মামা কয়েকটা দরকারি আসবাব কিনে সাজিয়েছেন।

কেউ কোথাও নেই। বড় মামাও কোথায় বেরিয়ে গেছেন। নীচে থেকে বঙ্কুর রান্না লুচি-আলুরদম খেয়ে উপরে গেলাম। বই রেখে, আমার ঘরের সামনের চওড়া বারান্দা থেকে দেখি বাগানময় ঝোপঝাপ, আমগাছ, কাঁঠালগাছও গোটা কতক আছে। গঙ্গার ধার দিয়ে জবা ফুলের গাছ দিয়ে আড়াল-করা একটা সরু রাস্তা একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে। সেখানে তিনজন মাঝি গোছের লোক মাছ ধরার ছিপ সারাচ্ছে। একজন বুড়ো আর দুজন আমার চেয়ে একটু বড় হবে। ওখানকারই লোক বোধ হয়। আমাকে দেখতে পেয়ে তারা নিজের থেকেই ডাকল। দেখতে দেখতে বেশ ভাব জমে গেল। ওরা বলল, পিছন দিকের পুকুরে আমাকে মাছ ধরা শেখাবে, শনিবার নদীতে জাল ফেলবে, নিশ্চয় নিশ্চয় যেন আসি। বুড়োর নাম শিবু, ছেলে দুটো ওর ভাইপো, সিজি আর গুজি।

বেশ লোকগুলো। বাড়ির মধ্যে আসত-টাসত না, চাকরবাকরদের এড়িয়ে চলত, কিন্তু আমার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম হয়ে গেল। আমাকে সাপ-কামড়ানোর ওষুধ, বিছুটি লাগার ওষুধ, এই-সব শিখিয়ে দিল। আমাদের বাগানেই পাওয়া যায়।

মামা মাঝে মাঝে খুব রাত করে বাড়ি ফিরত। আর দোতলায় একা একা আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। শিবুদের কাছে সে কথা জানাতেই, যেদিনই মামা বেরোতেন, সেদিনই ওরা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে, বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে কত যে গল্প করত তার ঠিক নেই। সব মাঝিদের গল্প, ঝড়ের কথা, নৌকাডুবির কথা, কুমির আসার কথা, হাঙর মারার কথা, সমুদ্রের কথা।

ওদিকে স্কুলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এমন হল যে ঐ জগু, ভুটে আর নেলো বলে ওদের যে এক সাকরেদ জুটেছে, এই তিনজনকে অন্তত আচ্ছা করে শিক্ষা না দিলে চলে না। শিবু বললে, "বাবু, এইখানে ডেকে এনে সবাই মিলে কষে পিটুনি লাগাই।"

বললাম, "না-রে, শেষটা ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। তার চেয়ে এখানে এনে এমনি ভূতের ভয় দেখাই যে বাছাধনদের চুলদাড়ি সব খাড়া হয়ে উঠবে।" তাই শুনে ওরা তিনজনেই হেসে লুটোপুটি।

আমি বললাম, "দেখ, তোদের তিনজনকে কিন্তু ভূত সাজতে হবে আর আমি ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনব। তোদের সব সাজিয়ে-গুজিয়ে দেব।"

"অ্যাঁ! সাজিয়ে-গুজিয়ে দেবেন কেনে বাবু? রঙ-টঙ মেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। তিনটে চাদর দেবেন। আমরা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে, গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে এমনি এমনি করে হাত নাড়তে থাকব আর ওঁ ওঁ শব্দ করব, দেখবেন ওনাদের

পেলে চমকে যাবে।" ছেঁড়া চাদর তিনটে দিয়ে দিলাম। সত্যি ওদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলুম না! ভালোই হবে, তা হলে আমাকে কেউ সন্দেহও করবে না, বাড়িটার একটা অপবাদ তো আছেই।

শুক্রবার ইস্কুলে গিয়ে জগু ভুটেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। বাবা! ওদের রাগ দেখে কে! "কি রে, হতভাগা, ভারি ল্যাটসাহেব হয়েছিস যে? কথা বলছিস না যে বড়?"

বললাম, "মেয়েদের সঙ্গে আমি বড় একটা কথা বলি না। ব্যাচেলর মামার শিক্ষা।" তারা তো রেগে কাঁই—"মেয়েদের সঙ্গে মানে? মেয়েদের আবার কোথায় দেখলি?"

বললাম, "যারা ভুতের ভয়ে আমাদের বাড়ি যায় না, তাদের সঙ্গে মেয়েদের আবার কি তফাত?"

জগু রাগে ফোঁস্-ফোঁস্ করতে করতে বলল—"যা মুখে আসবে, খবরদার বলবি না, গুপে।"

"একশো বার বলব, তোমরা ভীতু, কাপুরুষ, মেয়েমানুষ।" জগু আমাকে মারে আর কি! শুধু অঙ্কের মাস্টারমশাই এসে পড়লেন বলে বেঁচে গেলাম।

স্কুল ছুটির সময় ভুটে পিছন থেকে এসে আমার কানে কানে বললে, "সন্ধেবেলা সাতটার সময় তোমাদের বাড়ির বাগানে আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বেড়াব। দেখি তোমাদের ভুতের দৌড় কতখানি! হুঃ, আমাদের চিনতে এখনো তোমার ঢের বাকি আছে।"

আমি তো তাই চাই; শিবুরা আজকের কথাই বলে রেখেছিল।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরলাম, ওদের দেখতে পেলাম না। একটু একটু নার্ভাস লাগছিল, যদি ভুলে যায়। নদীর ধারে একটা ঝোপের পিছন থেকে গুজি ডেকে বলল—"বাবু, সব ঠিক আছে আমাদের।" প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জগু, ভুটে, নেলো তিন কাপ্তেন এসে হাজির।

বড় মামা বেরোচ্ছিলেন, ওদের দেখে আমাকে বললেন, "বন্ধুদের কেষ্টনগরের মিষ্টি-টিষ্টি দিস, সব একা একা খেয়ে ফেলিস না যেন।" কথাটা যেন না বললেই হত না। ওরা তো হেসেই গড়াগড়ি, যেন ভারি রসিকতা হল।

বড় মামা গেলে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বাগানে গেলাম। এক্ষুনি বাছারা টের পাবেন! চারি দিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু একটু চাঁদের আলোতে সব যেন কিরকম ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে, আমার গা ছম্‌ছম্ করছে। গল্প করতে করতে ওদের গঙ্গার ধারের সেই সরু রাস্তাটাতে নিয়ে এলাম। বাড়ি থেকে এ জায়গাটা আড়াল করা। পথের বাঁক ঘুরতেই, আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিল—ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি! মাথা মুখ হাত সব ঢাকা, আবার হাত তুলে তুলে যেন ডাকছে আর অদ্ভুত একটা ওঁ ওঁ শব্দ! একটু একটু হাসিও পাচ্ছিল।

জগুরা এক মিনিটের জন্য ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, তার পর আমার দিকে তাকিয়ে—"তবে রে হতভাগা! চালাকি করবার জায়গা পাস নি!"—বলে ছুটে গিয়ে চাদরসুদ্ধ মূর্তিগুলোকে জাপটে ধরল।

তার পরের কথা আমি নিজের চোখে দেখেও যখন বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমরা আর কি করবে? ছোঁবামাত্র মূর্তিগুলো যেন ঝুর্‌ঝুর্ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, শুধু চাদর তিনটে মাটিতে পড়ে গেল।

জগু, ভুটে, নেলোও তক্ষুনি মূর্ছা গেল।

আমি পাগলের মতো "ও শিবু, ও সিজি, ও গুজি" করে ছুটে বেড়াতে লাগলাম; গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আর গোলযোগ শুনে বঙ্কু, নটবর আর ঝগড়ু হল্লা করতে করতে এসে হাজির হল। ওরা জগুদের তুলে, ঘরে নিয়ে গিয়ে,

চোখে মুখে জল দিল। আমার গায়ে মাথায়ও মিছিমিছি এক বাল্‌তি জল ঢালল!

মামাকেও পাড়া থেকে ডেকে আনা হল। এসেই আমাকে কি বকুনি!

"বল্‌ লক্ষ্মীছাড়া, চাদর নিয়ে গিয়েছিলি কেন?"

যত বলি শিবু সিজি গুজির কথা, কেউ বিশ্বাস করে না।

"তারা আবার কে? এতদিন আছি, কেউ তাদের কোনোদিনও দেখে নি শোনে নি; এ আবার কি কথা? আন্‌ তা হলে তাদের খুঁজে।" কিন্তু তাদের কি আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়? তারা তো আমার চোখের সামনে ঝুর্‌ঝুর্‌ করে কর্পূরের মতো উবে গেছে।

আহিরিটোলার বাড়ি

আহিরিটোলা কোথায় জানো তো? সেখানে গঙ্গার ধারে আমার পূর্বপুরুষদের একটা মস্ত বাড়ি আছে। সেখানে কেউ থাকে না। দরজা-জানলা ঝুলে রয়েছে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেয়ালে সব ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। শুধু ইঁদুর বাদুড়ের বাস, আর সব জায়গায় একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বাড়িটা বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কোম্পানির আমলে তৈরি করেছিলেন, কলকাতা শহরই তখন সবে তৈরি হচ্ছে। দিব্যি চকমেলান দোমহলা বাড়ি, দেয়ালে সব রং ধরে যাওয়া চিত্র-টিত্র করা, বিরাট পাথরের সিঁড়ি। টাকারও তাঁদের অভাব ছিল না, কি সব চোরাকারবার চলত; তখনকার দিনে অত আইন-আদালতের হাঙ্গামা ছিল না। মোট কথা, বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভয়ংকর ধনী লোক ছিলেন। প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ি ছিল, তাতে চারটে কালো কুচ্‌কুচে ঘোড়া জোড়া হত, বাড়ির পিছন দিকে বিশাল আস্তাবল ছিল। সে-সব কবে বিক্রি হয়ে গেছে, তার জায়গায় তিনতলা সব বাড়ি হয়ে, সেগুলো পর্যন্ত ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সেবার প্রি-টেস্টে অঙ্কে পনেরো পেলাম। তাই নিয়ে বাড়িময় সে যে কিরকম হৈ চৈ লেগে গেল সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বাবা পর্যন্ত এমন কাণ্ড আরম্ভ করলেন যে শেষ অবধি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম। কাউকে কিছু না বলে, সন্ধ্যেবেলায় কয়েকটা কাপড়জামার পুঁটলি কাঁধে নিয়ে, ঘড়ি কিনবার জমানো টাকাগুলো পকেটে পুরে, একেবারে আহিরিটোলার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সেখানে আলো-টালো নেই, রাস্তার আলো এসে যা একটু ভাঙা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকছে, অদ্ভুত সব ছায়া পড়েছে। সামনের দরজায় তালামারা। কিন্তু জানলায় শিক নোনা ধরে ভেঙে গেছে, ঢুকতে কোনো অসুবিধা হল না। একটু যে ভয় করছিল না তাও নয়, আর কতরকম শেডের যে অন্ধকার হয়, তাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। খিদেও পেয়েছে প্রচুর, আবার রাগও হয়েছে। নীচের তলাটা কেমন যেন ঘুপ্‌সিপানা, পুঁটলি বগলে ধুলোমাখা সিঁড়ি দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে উপর তলায় উঠ যাচ্ছি। এমন সময় সিঁড়ির ঠিক উপর থেকে কে বলল—"আহা। তোদের জ্বালায় কি সন্ধেবেলাতেও

হাত মুখ ধুয়ে আলবোলাটা নিয়ে একটু চুপ করে বসা যাবে না? সারাদিন শুধু দাও, দাও, দাও, দাও, এটা নেই, ওটা নেই, এটা চাই, ওটা চাই, এবার একটু ক্ষান্তি দে।” ভুর্‌ভুর্‌ করে নাকে একটা ধুপধুনোর সঙ্গে গোলাপজল আর ভালো তামাকের গন্ধ এল! চেয়ে দেখি তারার আলোতে সিঁড়ির উপর একজন বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভুষ্কো রঙের লম্বা জোব্বা পরনে, পায়ে সাদা নাগরাই জুতো, মাথায় ভুষ্কো একটা ছোট্ট সাদা টুপি, আর ডান হাতের বকবার আঙুলে একটা মস্ত সবুজ পাথরের আংটি।

যেমন সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে উঠেছি, আশ্চর্য হয়ে বললেন, “এ্যাঁ, তোকে তো আগে দেখি নি। তুই এখানে কেন এসেছিস? কি চাস তাই বল্‌ দেখি বাবা?” খিদেয় পেটটা খালি খালি লাগছিল, বললাম, “কেন আসব না, এটা আমার বাবার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার বাড়ি!” ভীষণ চমকিয়ে গিয়ে লোকটি কাছে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বাবার নাম কি? তোমার ঠাকুরদাদার নাম কি? নাম শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কোথাও জনমানুষ নেই, চারি দিকে অন্ধকার, রেলিং-এর কাছে গিয়ে বুড়ো হাঁক দিলেন, “পরদেশি! আমিন! বলি, কাজের সময় গেলি কোথায়, আলো দিবি না?” নীচের তলার অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট একটা সাড়া এল, তার পর লম্বা একটা কাচের ঢাকনি পরানো সেজ হাতে কুচ্‌কুচে কালো, ডিগ্‌ডিগে লম্বা, গোলাপী গেঞ্জি, মিহি ধুতি আর গলায় সোনার মাদুলি পরা একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

“ছিলি কোথায় হতভাগা? বাড়িতে লোক এলে দেখতে পাস না?”

“এজ্ঞে, বারোয়ারিতলায় হাফ-আখড়াইটা একবার দেখে এলাম।”

আমার দিকে ফিরে বলল, “যাবে না, খোকাবাবু, হাফ-আখড়াইতে? কেমন সব সঙ বেনিয়েছে, গান-বাজনা হতেছে!” বুড়ো বললে—“চোপ্‌, ও-সব ছেলেমানুষের জায়গা নয়। এসো, দাদা তুমি আমার সঙ্গে এসো।”

সামনের ঘরে গেলাম। মেঝেতে লাল গালচে পাতা, মস্ত নিচু তক্তপোষে হলদে মখমলের চাদর বিছানো। এক কোনায় গোঁফ ঝোলা, চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়, কানে মাকড়ি একজন লোক দাঁড়িয়ে। তাকে বললেন—“যাও এখন, বলছি তো দশ টাকা চাঁদা আর পাঁচ ভরি আতর দেব তোমাদের বারোয়ারী পুজোর জন্য, এখন কেটে পড়ো।”

লোকটি চলে গেলে, আমাকে তক্তপোষে বসিয়ে পুঁটলির দিকে চেয়ে বললেন. “ওতে কি? পালিয়ে এসেছ নাকি? কেন?” বলত হল সব কথা। খানিকটা ভেবে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, “পনেরো পেইছিস? হতভাগা, তোর লজ্জা করে না? আঁক হয় না কেন? শুভংকরী পড়িস না? মুখ অমন পাংশুপানা কেন? খেইছিস? এ্যাঁ, খাস নি এখনো? পরদেশি, যা দিকিনি, পচ্চুকে বল গে যা।” পরদেশি চলে গেলে বললেন. “আমার কক্ষনো একটা আঁক কষতে ভুল হত না, আর তুই ব্যাটা একেবারে পনেরো পেলি! জানিস নবাবের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেইছিলাম, হৌসের সব হিসেবের ভুল শুধরে দিয়েছিলাম বলে। দাঁড়া কুট্টিকে ডেকে পাঠাই. সে তোকে আঁক শিখিয়ে দেবে।”

পরদেশি একটা রুপোর থালায় করে লুচি, সন্দেশ, ছানামাখা, আর এক গেলাস বাদামের সরবত এনে দিল।

তারপর বারান্দার কোনে শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো স্নানের ঘরে আরাম করে হাত-পা ধুয়ে, পাশের ঘরে কারিকুরি করা খাটে সাদা বিছানায় শুয়ে সারারাত ঘুমোলাম।

সকালে পরদেশি এসে ডেকে দিল, “কুট্টিবাবু আঁক শেখাতে এসেছেন।” কুট্টিবাবুও এসে, চিত্র-করা পাটিতে বসে সারাটা সকাল আমাকে অঙ্ক কষালেন। পরদেশি কোনো কথা না বলে দুজনকে দুই গেলাস দুধ দিয়ে গেল। বই নেই, পুঁটলিতে খাতা পেনসিল

ছিল, তাই দেখে কুট্টিবাবু মহাখুশি। কি বলব, যে-সব অঙ্ক সারা বছর ধরে বুঝতে পারছিলাম না, সব যেন জলের মতো সোজা হয়ে গেল। কুট্টিবাবুর বই দরকার হয় না, সব মাথার মধ্যে ঠাসা।

উনি চলে গেলে, বারান্দায় বেরিয়ে দিনের আলোতে ভালো করে চেয়ে দেখি এরা সব বাড়িঘর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করে ফেলেছে। উঠোনের ধারে ধারে বড়-বড় টবে করে কতরকম পাতাবাহারের গাছ, আর উঠোনে দাঁড়ের উপর লাল নীল হলদে সবুজ মস্ত-মস্ত তোতা পাখি রোদে বসে ছোলা খাচ্ছে।

দেয়াল ঠেস দিয়ে পরদেশি মুচকি মুচকি হাসছে। "কাকে খুঁজছ, খোকাবাবু?" বুড়ো লোকটির খোঁজ করলাম। "কি তার নাম পরদেশি? বড্ড ভালো লোক।" পিছন থেকে তিনি নিজে বললেন, আমার নাম শিবেন্দ্রনারায়ণ, লোকে শিবুবাবু বলে ডাকে। তুমি নাকি ভালো করে অঙ্ক কষেছ, কুট্টি বলছিল! এই নাও তার পুরস্কার। আমার হাতে একটা মস্ত সোনার মোহর গুঁজে দিলেন। "ও কি পরদেশি?" বাইরের দরজায় কারা যেন মহা ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি করছে। "সওরা নয় তো পরদেশি?" পরদেশি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, আমি বললাম, "এই রে, তবে নিশ্চয় বাবা এসেছেন আমাকে খুঁজতে।" ছুটে নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম, মা, বাবা, বড় কাকা আর পিসেমশাই এসেছেন। "ইস্, কি সাংঘাতিক ছেলে বাপু তুমি। এই খালি বাড়িতে অন্ধকারে, কালি-ঝুলের মধ্যে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই দিব্যি রাত কাটিয়ে দিলে? বলিহারি তোমাকে।" অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি এক মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার তক্‌তকে উঠোন, তোতা পাখির সারি, পাতাবাহারের গাছ, সব উড়ে গেছে। পাগলের মতো দৌড়ে উপরে উঠলাম, খালি ঘর খাঁ খাঁ করছে, ভাঙা স্নানের ঘরে শ্বেতপাথরের সব টালি খুলে পড়ে আছে। "পরদেশি, ও পরদেশি, শিবুবাবু, কোথায় তোমরা?"

বাবা আমাকে খপ্ করে ধরে ফেললেন, "জানিস না, শিবুবাবু আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, পরদেশি তাঁর খাস খানসামা।"

আস্তে আস্তে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে মোহরটাকে পকেটে পুরে বললাম, "চলো, টেস্টে আমি অঙ্কে ভালো নম্বর পাব, দেখো।" কাউকে কিছু বলতে পারলাম না।

আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আহিরিটোলার বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে সেখানেই থাকব। গঙ্গাটাও বেশ সামনে আছে।

আহিদিদির বন্ধুরা

আহিদিদির স্বামী যখন পেন্‌শন্ নেবার পর গেরিয়া ছাড়িয়ে কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে নতুন-খোলা এক হাতের কাজ শেখাবার স্কুলের প্রায় মিনি-মাগনার অধ্যক্ষ হয়ে, সপরিবারে সেখানে চলে গেলেন, কেউ বলল "পাগল", কেউ বলল "স্টুপিড্" আর বেশির ভাগ বলল, "ঠিক ওঁরই উপযুক্ত কাজ হয়েছে!" পরিবার বলতে আহিদিদি

আর তাঁর বুড়ি শাশুড়ি।

অবিশ্যি অজ পাড়াগাঁ ঠিক নয়, এককালে ভাবি বর্ধিষ্ণু শহর ছিল, বোধ হয়। একটা মজা নদী গিয়ে গঙ্গায় পড়ত ; নাকি মস্ত বন্দর ছিল ; ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাঁটি, বড় বড় বজরা এসে নোঙর ফেলত। মস্ত মস্ত ভাঙা ঘাট এখনো দেখা যায়। কিছুদিন আগে গ্রাম-সংস্কারক দুর্দান্ত ছেলেরা কাদা তুলতে গিয়ে মর্চে ধরা নোঙর আর অনেক মরা মানুষের কঙ্কাল তুলে, কাজ ফেলে পালিয়েছিল। অহিদিদির দেওর ধরণীবাবু বলেছিলেন কাদার নিচে নিশ্চয় মেলা ডুবো জাহাজ আছে। সরকার যদি বুদ্ধি করে এখানে হাতের কাজ শেখার ইস্কুল না করে, নদীর কাদা তোলার ব্যবসা খুলত, তাহলে তিন ডবল লোক চাকরি পেত আর সোনা-দানায় সব ব্যাটার ট্যাঁক ভরতি হত। অহিদিদির স্বামী সুরেনবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও, অহিদিদি একবার গিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখে হতাশ হলেন। মজা নদীতে বর্ষা কালেও হাঁটু জল হয় না, এখন পুজোর সময় পায়ের কব্জি ডোবে না। তলাটা ইঁটের মতো শক্ত।

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বুড়ি শাশুড়ি বেজায় খিট্‌খিটে ; তার ওপর দুধের ফরমায়েস নিতে এসে গয়লা ফিরে গেছিল ; মাছের জন্য হাটে লোক পাঠানো হয়নি ; তোলা উনুন নিবে-টিবে একাকার।

গুছিয়ে বসতেই দিন চারেক গেল। এ অঞ্চলটাতে বহু পুরনো পোড়ো-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ; কয়েকটার দুটো একটা মহল মেরামত করে মালিকরা বাসযোগ্য করে রেখেছে। কয়েকটা পড়ে গিয়ে ইটের স্তূপ হয়ে আছে ; যত রাজ্যের সাপ-খোপের বাস। আর কতকগুলো যে-কোনো সময় ধ্বসে পড়বে সেদিক দিয়ে বাসিন্দাদের অদ্ভুত রকম নিশ্চিন্ত বলতে হবে। চারদিকে মস্ত মস্ত আম কাঁঠালের বাগান, যত্নের অভাবে নাকি ফল হয় না। মস্ত মস্ত পুকুর, তার পাঁক তোলা হয় না ; মাছের চাইতে ব্যাঙ বেশি। একটা বেজায় পুরনো পাথরের তৈরি বিষ্ণু মন্দির, তাতে কষ্টি-পাথরের বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী। পুজারী নেই ; গয়লাপাড়ার বাসিন্দারা দু বেলা ফুল, গঙ্গাজল, বাতাসা দিয়ে আসে। এ দিকটাই নাকি সেকালে বড়লোক শেঠদের পাড়া ছিল। গুপ্তধন থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। গয়লারা শেঠদের দুধ জোগাত, ফাই-ফরমায়েস খাটত।

মোট কথা, দিনের বেলা অত কিছু মনে না হলেও, সন্ধ্যেবেলায় জায়গাটা বেজায় নির্জন হয়ে যেত ; তার ওপর চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালিঘাটের সরু রাস্তাটাতে প্রত্যেকটা বাড়ির প্রত্যেকটা কথা শোনা যেত। এত গায়ে গায়ে বাড়ি যে চোর ঢুকবার জায়গা ছিল না। দিনের লোকদের হট্টগোল থামলেই, রাতের লোকদের হট্টগোল শুরু হত। মাত্র দু ঘণ্টার জন্য, রাত দুটো থেকে চারটে একটু নিঝুম হত। এখানে সন্ধ্যা না নামতেই মাঝরাত।

সুরেনবাবু কিছু দেখে শুনে বাড়ি নেননি। যা দিয়েছে, অমনি এসে উঠেছেন। কাছে পিঠে অন্য কেউ নেই। যত রাজ্যের পোড়ো বাড়ি আর মান্ধাতার আমলের আম-বাগান। এ-বাড়িটারও নয়-ভাগ ভেঙে এই একটা ভাগ টিকে আছে। তবে এটাকে ভালো করে মেরামত করা হয়েছে। সেকালে হয়তো এটা কোনো বড় লোকের অন্দর মহলের খানিকটা ছিল। দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিনখানা শ্বেত-পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, পাশে কল-ঘর, আর পুব দিকে এই রান্নাঘর, এর মধ্যেই ভাঁড়ার ঘর। আলাদা ভাঁড়ারের কি দরকার ? সব খুলে ফেলে রেখে দিলেও কেউ নেবে না। কালিঘাটে জানলার শিকের ওপর জাল দিতে হয়েছিল, নইলে আঁকশি ঢুকিয়ে পুরনো গামছা পর্যন্ত নিয়ে যেত। আর এখানে ভুলে সারারাত পেতলের ঘড়া বাইরে ফেলে রাখলেন, সকালে উঠে দেখলেন ঘড়া তো খোয়া যায়নি, বরং কিছু লাভ হয়েছে। পুরনো গন্ধরাজ লেবু গাছের মগডালের

রস-টুস্‌টুসে লেবুগুলো কেমন করে খসে পড়ে আছে ঘড়ার ভিতরে।

রান্নাঘরের সামনে চওড়া রক ; তারপর সান বাঁধানো উঠোন ; উঠোনের ধারে কুয়ো, লেবু-গাছ, সজনে-গাছ, বেল গাছ আর রান্নাঘরের মুখোমুখি ভাঙাচোরা গোয়াল-ঘর। সেখানে শেষ গোরু হয়তো থেকে গেছে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে। গয়লানী সকালে আড়াই সের আর এ-বেলা আধ সের ঘন লালচে সুগন্ধী দুধ দিয়ে গেছে। খিট্‌খিটে শাশুড়ি আজকাল রান্নাঘরে আসেন না ; এক দিক দিয়ে সেটা কিছু মন্দ না। তিনি দু বেলা দু বাটি এক-বল্‌কা দুধ খান। সেটা আলাদা করে তুলে রাখা হয়। দু বেলার চায়ের দুধ-ও আলাদা করা হয়। বাকিটা পড়ন্ত আঁচে বসিয়ে রাখা হয় ; আধ ইঞ্চি পুরু সর পড়ে ; সোনালী রঙ, তাতে চাঁদের গায়ের মতো ফুট্‌-ফুট্‌ দাগ। রাতে সেই সর তুলে মধ্যিখানে কাশীর বাটা চিনি ছড়িয়ে, ভাঁজ করে রাখেন অহিদিদি। শাশুড়ি এক চিলতে খান ; সুরেনবাবু অর্ধেকটা মতো খান ; কেউ এলে একটু খায় ; কিছু বাকি থাকলে অহিদিদি চাখেন। রান্নাঘরের দরজায় শিক্‌লি তোলা থাকে, জানলায় বেড়ালের ভয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষই নতুন জাল লাগিয়ে দিয়েছেন। সরটি রোজ সুগন্ধী গোল টৈ-টম্বুর হয়ে থাকে।

দুপুরের একটু মাছ তোলা থাকে। রাতে জনতা স্টোভে একটু ছক্কা করেন অহিদিদি, দুজনার জন্য খান-কতক হাত রুটি করেন, কি অল্প তেলে পরটা ভাজেন। ঘণ্টা খানেকও লাগে না। বিকেলে স্কুলের কারখানার ফোরম্যানবাবুর স্ত্রী এসে বললেন, “ওমা! ভয় করে না দিদি? গোয়াল-ঘরের পেছনের দেয়ালে তো এতখানি ফাঁক! একটা দুটো ছোট ছেলে কি রোগা-পানা মানুষ দিব্যি গলে আসতে পারে। আর আপনি কিনা দুধের সর আর রাজ্যের বাসনপত্র ছড়িয়ে রেখে, দরজায় শুধু শিক্‌লি তুলে ও ঘরে গিয়ে রেডিও শোনেন? বলিহারি আপনাকে।”

কর্তা-গিন্নি তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। কিন্তু রাতে হ্যারিকেন জেবলে রান্না ঘরে গিয়ে অহিদিদি দেখলেন সরের এক পাশ থেকে খানিকটা কে ছিঁড়ে নিয়েছে ; মেঝেতে টপ টপ করে দুধ ফেলেছে ; নতুন রঙ করা দেয়ালে ছোট ছোট আঙুল মুছেছে। অহিদিদি কাউকে কিছু না বলে, ঐ দিক থেকে একটুখানি সর কেটে ফেলে দিয়ে, বাকিটাতে চিনি ছড়ালেন। পাথরের বাটিতে তিন জনের জন্য চিনি-পাতা দৈ বসিয়ে, বাটিটা ডেকচিতে রেখে, ঢাকা দিয়ে, শিল-চাপা দিলেন। চায়ের দুধ খাবার ঘরের ডুলিতে রাখলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সকালে গিয়ে গোয়াল ঘরটা দেখলেন। বাড়ি সারানোর জিনিস ছাড়া কিছু ছিল না। তবে পাশের পাঁচিলে সত্যিই খানিকটা ফাঁক। সুরেনবাবু সেইদিনই সেটা সারাবার ব্যবস্থা করলেন। সকালে জেলে-বৌ পঁচাত্তর পয়সায় এক রাশি ছোট ছোট তেল টসটসে খয়রা মাছ দিয়ে গেল। অহিদিদি সবটা তেলে ভেজে, অর্ধেকটা দিয়ে দুপুরে চচ্চড়ি করলেন, বাকিটা রান্নাঘরের ছাদ থেকে ঝোলা শিকের ওপরে তুলে রাখলেন। সন্ধ্যা-বেলায় দেখলেন, ঝাঁপি কাত, নিচে মেঝের ওপর দুটি মাছ পড়ে আছে, শিকেয় তোলা মাছ বেশ কম। অহিদিদি একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গোয়াল ঘরের দিকে চোখ গেল। গোয়ালঘরের উঠোনের দিকে দেয়াল ছিল না, খালি অহিদিদির কোমর অবধি উঁচু শক্ত একটা বাঁশের বেড়া। হঠাৎ মনে হল অন্ধকারের মধ্যে সারি সারি গোটা দশেক ছোট ছোট মাথা যেন বাঁশের বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর অনেকগুলো রোগা রোগা কালো কালো হাত এ-ওকে ঠেলে সরিয়ে, নিজের জন্য জায়গা করে নেবার চেষ্টা করছে।

অহিদিদির বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। আছে তাহলে ছেলেপুলে এই নির্বান্ধব

পুরীতেও। কালীঘাটের বাড়িতে ছেলেপুলে ছিল না। বাড়িটা ছিল শ্মশান। অহিদিদির ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাশুড়ি কোনো ছোট ছেলের গলার আওয়াজ পেলে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যেতেন। কেউ আসত না ওঁদের বাড়িতে, কেউ গল্প শুনতে চাইত না, খাবার চুরি করে খেত না। বাড়ি, না কি শ্মশান! অহিদিদি গলা তুলে ডাক দিলেন।

"কে রে আমার সর খায়, মাছ খায়?" অন্ধকারের মধ্যে ঠেলাঠেলি চুপ।

অহিদিদি বললেন, "আয়! গোলাপী বাতাসা দেব, ভাজা-মশলা দেব, পরীদের দ্বীপের গল্প বলব্।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে তারা বাঁশের বেড়া টপকে এগিয়ে এল। আট দশটা রোগা রোগা ছেলেমেয়ে, গায়ে জামা নেই, রুক্ষ চুল, সাদা সাদা দাঁত বের করে ফিক্-ফিক্ করে হাসছে।

অহিদিদি গোলাপী বাতাসার কৌটো খুলে বললেন, "কাছে আয়, হাত পাত!" অমনি দশটা নোংরা নোংরা হাত পাতা হল। অহিদিদি একটা করে বড় বাতাসা, একটা করে ভাজা-মশলা দিয়ে সামনেরটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর নাম কি রে?"

ছেলেটা একটু খোনা। বলল "বংগেশ।"

"এরা বুঝি তোর দল? দ্যাখ, ও-সব খাবার দাবার-এ হাত দিস্ নে। কেউ ছুঁলে বুড়ি ঠাকুমার খাবার নষ্ট হয়। আমি রোজ তোদের খাবার দেব।"

বগেশ বলল, "কিং দেবে?"

"কেন, মুড়ি ল্যাবেনচুশ দেব, পান দেব, কুচো নিমকি দেব, নোন্‌তা বিস্কুট দেব, আলু-নারকেল ঘুগনি দেব, কুচো-চিংড়ি ভাজা দেব। কিন্তু নিজেরা কিচ্ছুটি নিবি না, কেমন?"

বগেশ মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

অহিদিদি তাড়াতাড়ি জনতা-স্টোভ রকে এনে, আটার নেচি কাটতে কাটতে বললেন, "এখন তোদের খাওয়া হলে ঐখেনে বসে পড়, আমি তোদের পরীদের দ্বীপের গল্প বলি।"

ওরা যে যেখানে ছিল শান-বাঁধানো উঠোনের ওপর এসে বসে পড়ল। অহিদিদি বললেন, "অনেক অনেক দিন আগে রমেশ বলে একটা দুষ্টু ছেলে ছিল, তার মা ছিল না, সৎমা ছিল।"

বগেশ বলল, "রংমেশ না, বংগেশ।"

অহিদিদি বললেন, "বেশ, তাই হবে, রমেশ না বগেশ। সৎমা বগেশকে খেতে দিত না, পরতে দিত না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটাত। শোবার জন্য খাট দিত না, রাতে বগেশ ছাগলদের সঙ্গে শুত।..."

অহিদিদি গল্প বলে চলেন আর ক্রমে ওরা কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। ক্রমে অহিদিদির পরটা ছক্কা রান্নাও শেষ হয়, গল্পও শেষ হয়। আগে একটু জায়গা নিয়ে রেষারেষি, কোঁৎ কাঁৎ শব্দ হচ্ছিল, শেষের দিকে সব চুপ।

অহিদিদি গল্প শেষ করলেন, "তারপর রক্তাক্ত গায়ে ধুঁকতে ধুঁকতে, হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁদতে কাঁদতে বগেশ গিয়ে সমুদ্রের তীরে আছড়ে পড়ল। অমনি সেই সুঁটকো বুড়ির নৌকো এসে তীরে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির গা থেকে আলো বেরোতে লাগল, সুঁটকো বুড়ি পরী হয়ে গেল আর মা, মা, মা বলে বগেশ তার কোলে লাফিয়ে পড়ল। দুজনকে নিয়ে নৌকো পরীদের দ্বীপে চলে গেল।"

গল্প শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েগুলো অহিদিদির পায়ের কাছে গাদাগাদি হয়ে

পড়েছিল। অহিদিদি স্টোভ নিবিয়ে, খাবার তুলে, বললেন, "আজকের মতো হল, মানিক, বুড়ি ঠাকুমার খাবার সময় হল, কাল আবার আসিস। ঝুরি ভাজা খেতে দেব আর ঘুঁটে-কুড়ুনীর রানী হবার গল্প বলব।"

এই বলে রান্নাঘরের দোরে শিকলি তুলে, এদিক ফিরে দেখলে ছেলেমেয়েগুলো নিমেষের মধ্যে ভেগেছে।

আর খাবার চুরি হত না সে দিন থেকে। আর অহিদিদি একা পড়তেন না। সন্ধ্যা-বেলার ভয়-ভাবনা একেবারে দূর হয়ে গেল। কোনো চোর বা ভূত বা দুষ্টুলোক ঐ ছোঁড়াগুলোর চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না। বগেশ আমসি চুষতে চুষতে বলত, "কোনো ব্যাটা-চ্ছেলেকে এদিকে এগুতে দেব না মা।" অহিদিদি গল্প শেষ করে বললেন, "তোরা সব এত রোগা কেন রে? থাকিস্ কোথায়?" বগেশ পুরনো আম কাঁঠাল বটের বনের দিকে দেখিয়ে বলত, "ঐ হোথা মোদের আস্তানা।" অহিদিদি বলতেন, "ওগুলো কথা বলে না কেন? সব বোবা নাকি?" তাই শুনে সব খিলখিল করে হেসে উঠত। বগেশ বলত, "লজ্জা পায়। জিব-কাটাদের বড় লজ্জা, মা।" অহিদিদি বললেন, "দূর ব্যাটা, যারা বস্ড কথা বলে তাদের জিবকাটা বলে। কাল তালের বড়া করব, তালের ক্ষীর করব। খাবি তো?" তাই শুনে সব এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল! অহিদিদিও রকে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন। আহা, খেতে পায় না নিশ্চয়, নিশ্চয় পাতার কুঁড়েতে থাকে; মা-বাবাগুলো মানুষ না; অভাবে অনটনে—হয়তো এগুলোকে বেদম পেটায়! ওদের সুখী কর ঠাকুর।

এমনি করে প্রায় চারটে মাস কেটে গেল। সুরেনবাবুদের জন্য স্কুলের হাতায় চমৎকার নতুন কোয়ার্টার তৈরি হয়ে গেল। অহিদিদি বললেন, "ওমা, বলে কি, পৌষ-মাসে কখনো বাড়ি বদলাতে হয়? মাঘ পলে যাব।"

ছেলেপিলেগুলোর ওপর বেজায় মায়া; দিনগুলোকে ওরা দিব্যি জমিয়ে রেখেছিল। ওরা যে নতুন কোয়ার্টারে যাবে না, সে বিষয়ে অহিদিদির কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রাণ ধরে চলে যাবার কথাটা ওদের বলতে পারছিলেন না। ওদেরও নিশ্চয় কষ্ট হবে, কে খাওয়াবে কালো কালো রোগা গরীবের ছেলেদের।

পৌষ পার্বণে অহিদিদি পাটিসাপটা, গোকুলপিঠে, নারকেল-নাড়ু, দুধ-পুলি করে সবাইকে খাওয়ালেন। সুরেনবাবুর সহকর্মীরা বেজায় প্রশংসা করলেন। শাশুড়ি বারণ শুনলেন না, তিনটে পাটিসাপ্টা, এক বাটি দুধ-পুলি খেয়ে ফেললেন। আর সবাই চলে গেলে, সুরেনবাবুও তাস খেলতে মুকুন্দদের ওখানে গেলে, অহিদিদি রান্নাঘরের রকে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "অ্যাই, বগেশ!" অমনি ফিক-ফিক করে হাসতে হাসতে দশটা ছেলেমেয়ে হাজির হল। অহিদিদি সাধ মিটিয়ে ওদের খাওয়ালেন। তার আগে ঘটি থেকে জল ঢেলে হাত ধোয়ালেন।

খাওয়া শেষ হলে সবাইকে একটা করে পান দিয়ে অহিদিদি বললেন, "আমরা ইস্কুল পাড়ায় উঠে যাচ্ছি, জানিস্ বোধ হয়?"

বগেশ সকলের হয়ে বলল, "হুঁ!"

"যাবিনে আমাদের নতুন বাড়িতে?" সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়ল। অহিদিদি বললেন, "আমার দুঃখু হবে।" বলে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। তাই দেখে সব ক'টা ফোঁচ্-ফোঁচ্ করে একটু কাঁদল। তারপর বগেশ বলল, "মোরাও থাকবনি, মা, মোরাও চলে যাব।" "কোথায় যাবি রে? পারিস্ তো আমাদের বাড়িতে আসিস্।" খুসিতে সব মাথা দোলাতে লাগল। রান্নাঘরের শিকলি তুলে অহিদিদি ফিরে দেখেন সব পালিয়েছে। ভাবলেন আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। খুব কষ্ট হল।

পরদিন সকালে বাক্স-প্যাটরা, বাসনের সিন্দুক বিছানা সব নতুন বাড়িতে রওনা করে দিয়ে, সুরেনবাবুকে আর শাশুড়িতে একটা সাইকেল-রিক্শাতে তুলে দিয়ে, অহিদিদি স্বামীকে এই প্রথম মিথ্যা কথা বললেন। "তোমরা এগোও, আমি গয়লা-বৌয়ের টাকা দিয়ে, তাকে সঙ্গে করে আসছি।"

সমস্ত উঠোন, গাছতলা, গোয়াল-ঘর দেখলেন ; পাঁচিল মেরামত হয়েছিল ; কিন্তু যাদের আসবার তারা ঠিকই পাঁচিল টপকে আসত। অহিদিদি আম বনে ঢুকে অনেকখানি ঘুরে এলেন, কোথাও কোনো কুঁড়েঘর কি বস্তি দেখতে পেলেন না। তখন তাদের আরেকবার দেখবার আশা ছেড়ে দিয়ে, একটা রিক্শা নিয়ে নতুন কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

এর দু-মাস পরে, ছোট মেয়ে-জামাই ত্রিবাঙ্কুর বদলি হল, নাতি-নাতনিকে অনেক দিনের জন্য অহিদিদির কাছে রেখে গেল। তখন একদিন গয়লা-বৌ হঠাৎ বলে বসল, "এবার নতুন বাড়িতে উঠে এসেছ, এখন বললে দোষ নেই। কি করে পাঁচ মাস ঐ হানা-বাড়িতে বাস করলে মা, ভেবে পাইনে। সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকরা ও-তল্লাটে যায় না, জিব-কাটাদের ভয়ে। তোমরা কিছু দেখনি?"

অহিদিদি কাঠ হলেন। শাশুড়ি বললেন, "কি বলছ বৌ? জিব-কাটা আবার কি? আমরা কাউকে দেখি-টেখিনি। কে ওরা?"

"ওমা! শোননি ঠাকুমা? ঐ বাড়িটা ছিল এক মস্ত সদাগরের। একবার ভোর বেলায় গয়লাদের ছেলে-মেয়েরা পৌষ-পার্বণের বাসি পিঠে খেতে এসে এমনি হট্টগোল করেছিল যে কর্তা তাদের ন'জনের জিব কেটে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়টা পালিয়েছিল। ...সে-ও আজ দু-শো বছরের কথা হবে। গয়লা-পাড়ায় আমরা আজও তাই নিয়ে দুঃখু করি। তারপর থেকে নাকি আম-বাগানে আর বোল ধরে না আর আশ্চর্যের কথা কি জান মা, এক্ষুনি দেখে এলাম গাছে গাছে মুকুল এসেছে। যাই, মা। এসব হলে আমরা দুঃখীরা দেবতাদের পুজো দিই।"

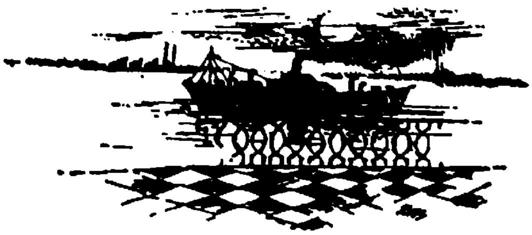

ভূতুড়ে গল্প

বাড়িটাতে পা দিয়েই আমার মেজো পিসেমশাই টের পেলেন কাজটা ভালো করেননি। বাড়িটার বাইরে থেকেই গা ছমছম্ করে। কবেকার পুরোনো বাড়ি, দরজা-জানলা ঝুলে পড়েছে, শ্যাওলা জন্মে গেছে, ফোকরে ফাটলে বড়-বড় অশ্বত্থগাছ গজিয়েছে, ফটক থেকে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা আগাছায় ভর্তি আর তার দু পাশের শিরিষ গাছগুলো ঝোপড়া হয়ে মাথার উপর আকাশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। সন্ধেও হয়ে এসেছে, চারিদিকে সাড়াশব্দ নেই, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে।

মেজো পিসেমশাই হাতের লণ্ঠনটা জেবলে ফেললেন। বার বার দোতলার ভাঙা জানলার উপর চোখ পড়তে লাগল, বার বার মনে হতে লাগল এক্ষুনি জানলার সামনে থেকে কে বুঝি সরে গেল। মেজো পিসেমশাইয়ের তো অবস্থা কাহিল। অথচ উনি ভূত বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য তাল ঠুকে ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভিতরে।

গঙ্গার উপরে বাড়ি। ঢুকেই একটা বড় খালি হল্‌ঘর, অন্ধকারে হাঁ করে রয়েছে, লণ্ঠনের আলোতে দেয়ালে পিসেমশাইয়ের প্রকাণ্ড ছায়াটা নড়ে বেড়াচ্ছে। পিসেমশাই তাড়াতাড়ি হল্‌ পেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালেন। প্রকাণ্ড একটা বারান্দা, তার রেলিং ভাঙা, তার পর একফালি শান-বাঁধানো চাতাল, তার চারিদিকে সাদা সাদা পাথরের মূর্তি সাজানো। তারপরেই ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি জল অবধি নেমে গেছে, তার অসংখ্য ইঁট জলে ধুয়ে গেছে। সিঁড়ির পাশেই একটা বুড়ো বাতাবিলেবুর গাছ, তার নীচে কবেকার পুরোনো ইঁটের গাদা, রোদে পুড়ে জলে ভিজে কালো হয়ে গেছে। গঙ্গার ওপারে জুট মিলের সাহেবদের বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে পিসেমশাই ফোঁস্‌ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

একতলায় বসে থাকলে চলবে না। উপরে যেতে হবে, রাত কাটাতে হবে। নইলে বাজি হেরে যাবেন; ক্লাবে মুখ দেখাতে তো পারবেনই না, উপরন্তু জগুর বাবা সোনালী ছাগলটাকে নিয়ে যাবেন।

হলের দুপাশে সারি সারি ঘর, তাদের দরজাগুলো আধখোলা। দু-একটা বিশাল বিশাল কারিকুরি-করা ভাঙা তক্তপোষ, দু-চারটে প্রকাণ্ড খালি সিন্দুক, এক-আধটা বৃহৎ রঙচটা আয়না ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মেজো পিসেমশাই তাড়াতাড়ি একবার সবটা দেখে নিয়ে এক দৌড়ে উপরে উঠে গেলেন।

দোতলাটাও ঠিক একতলার মতো। সেখানেও মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানি হল্‌। তার মধ্যে আসবাব কিছু নেই, খালি মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বড় ঘোর নীল রঙের গালচে পাতা, তাতে বহুদিনের ধুলো জমে পুরু হয়ে রয়েছে। আর ঘরের কোণে দেয়ালে একটা সেতার ঝুলছে, তাতে তারের কোনো চিহ্ন নেই।

মেজো পিসেমশাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেয়ালের দিকে পিঠ করে, যাতে পিছন দিক থেকে হঠাৎ কিছুতে এসে না পড়ে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না। প্রত্যেকটা ঘরের বর্ণনা দিতে হবে, তাই প্রত্যেকটা ঘর একবার দেখা দরকার! ভয় আবার কিসের? ভূত তো আর হয় না। ঘরগুলি প্রায় সব ক'টাই দরজা খোলা। একেবারে খালি, ধুলোয় ধূসর। দু-একটাতে ভাঙা ভাঙা আলমারি, প্রকাণ্ড জলচৌকি দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন আলো ঝোলাবার বড়-বড় হুক আছে, তার আশেপাশের ছাদটাতে ঝুলকালির দাগ রয়েছে। মেজো পিসেমশাই দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তা ছাড়া রাতই যখন কাটাতে হবে একটা বসবার জায়গা তো চাই।

হলের ওপাশে, গঙ্গার উপরে চওড়া বারান্দা। গঙ্গায় একটা স্টীমার যাচ্ছে, তাতে মানুষ আছে, আলো জ্বলছে। ওপারে শত শত আলো জ্বলছে। মেজো পিসেমশাই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়ালেন, ভর দিতে ভয় করে। যদি ভেঙে পড়ে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন—ঐ তো জাহাজে কত লোক দেখা যাচ্ছে, আঃ।

"এনেছিস? কই দেখি।"

চমকে মেজো পিসেমশাই ফিরে দেখেন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন সাদা জাব্বাজোব্বা-পরা একজন বুড়োমতো লোক। কি ভালো দেখতে, হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ, দাড়ি নেই, লম্বা গোঁফটা পাকিয়ে পাকিয়ে কানের উপর তুলে রেখেছেন, টানা টানা চোখ। আশ্চর্য ফরসা একখানি হাত বাড়িয়ে বললেন, "দে, দে, দেরি করিস নে। কখন এসে পড়বে।"

মেজো পিসেমশাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন লোকটার গলায় মুক্তোর মালা জড়ানো, কানে মুক্তো পরা, হাতের ভুল আঙুলে হীরের আংটি। এ্যাঁ! এ আবার কে!

লোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই কি বোবা হলি নাকি রে? আজকাল সব যা-তা চাকর রাখতে আরম্ভ করেছে দেখছি। আছে, না নেই?"

মেজো পিসেমশাইয়ের গলা-টলা শুকিয়ে একাকার, নীরবে মাথা নাড়লেন।

লোকটি হাতশভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "একটা বসবার জায়গাও কি এগিয়ে দিতে পারিস না? মাইনে খেতে লজ্জা করে না তোর? আমি আর কে, তা বটে তা বটে, আমি এখন আর কে যে আমার কথা শুনবি?"

হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললেন, "অত যে নিলি তখন মনে ছিল না হতভাগা? এর জন্য তোকে কষ্ট পেতে হবে বলে রাখলাম, কি ভীষণ কষ্ট পেতে হবে জানিস না। তিলে তিলে তোকে—ঐ রে, এল বুঝি।"

বিদ্যুতের মতো বুড়ো লোকটি হলের পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মেজো পিসেমশাইয়েরও যেন কানে এল স্পষ্ট পায়ের শব্দ। দেয়ালের মতো সাদা মুখ করে লণ্ঠনটাকে উঁচু করে ধরে, চারি দিক ভালো করে দেখে নিলেন, কেউ কোথাও নেই। লোকটা নিশ্চয় পাগল-টাগল হবে। অত গয়নাগাটিই-বা পেল কোত্থেকে? কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

লণ্ঠন হাতে বারান্দা থেকে হলে ঢুকলেন। নীচের তলাটা বরং ভালো, একটা তক্তপোষে বসে বসেই রাত কাটানো যাবে। পকেট চাপড়ে দেখলেন 'অশরীরী-খুনে' লোমহর্ষণ ১০ নং খানা দিয়ে দিতে জগুর বাবা ভোলেননি। রাত জেগে ঐটি পড়ে শেষ করে কাল সকালে আগাগোড়া গল্পখানি বলতে হবে। তবে বাজি জেতা।

পা টিপে টিপে হল্ পার হয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সদর দরজার ডান পাশের ঘরখানিতে ঢুকে, ভাঙা সিন্দুকের উপর লণ্ঠন নামিয়ে, তক্তপোষের কোণটা ধুতির খোঁট দিয়ে ঝেড়ে, ধপ্ করে পিসেমশাই বসে পড়লেন। ময়লা খোঁটটা দিয়েই গলার, কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। আঃ, বাঁচা গেল। ভাগ্যিস ভূতে বিশ্বাস করেন না! নইলে তো আজ ভয়েই আধমরা হয়ে যেতে হত।

সামনের রঙচটা আয়নাতে একখানি সাদা ছায়া পড়ল। বুড়ো লোকটি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে, অনুনয়ের স্বরে বললেন, "দিয়েই দে না বাবা। তোর আর কি কাজে লাগবে বল? যারা দেয় তারা প্রাণ হাতে করে এনে দেয়। না পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। কেন দিচ্ছিস না, বাপ? একে একে সবই তো প্রায় নিয়েছিস, আরো চাস বুঝি? তোর প্রাণে কি মায়া-দয়াও নেই? প্রথম যখন এলি, কি ভালো মানুষটিই ছিলি? আমি উপরের ঐ নীল গালচেটাতে বসে সেতার বাজাতাম, আর তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনতিস। তোকে কত-না ভালো বাসতাম, এটা-ওটা রোজই দিতাম, কত-না ভালোমানুষ সেজে থাকতিস। ভেতরে ভেতরে তুই যে এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতক কেউটে সাপ তা কি আর জানি।"

মেজো পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে এক হাত সরে দাঁড়ালেন। বুড়ো লোকটিও খানিকটা এগিয়ে এলেন, রাগে তার দু চোখ লাল হয়ে গেল, ফরসা দুটা মুঠো পাকিয়ে মেজো পিসেমশাইয়ের নাকের কাছে ঘুষি তুলে বললেন, "একদিন এই ঘুষিকে দেশসুদ্ধ লোক ভয় করত, কোম্পানির সাহেবরা এসে এর ভয়ে পা চাটত। এখন বুড়ো হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি, তাই আমার বাড়িতে আমার মাইনে-খাওয়া চাকর হয়ে তোর এত বড় আস্পর্ধা। তবে এখনো মরিনি, এখনো তোকে এক মুঠো ভস্মে—না রে না, কি বাজে কথা বলছি। দিয়ে দে বাবা, দেখ তোকে তার বদলে কি দেব।"

এই বলে বুড়ো লোকটি আঙুল থেকে হীরের আংটিখানি খুলে মেজো পিসে-

মশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মরিয়া হয়ে পিসেমশাই ইদিক-উদিক তাকালেন। কি যে দেবেন ভেবে না পেয়ে, পকেটে হাত দিতেই গোলাপী বিড়ির প্যাকেট দুটোর উপরে হাত পড়ল। তাই বের করে বুড়োর হাতে দিয়ে দিলেন।

"সত্যি দিলি? আঃ, বাঁচালি বাবা। এই নে; আমি আশীর্বাদ করছি তোর একশো বছর পরমায়ু হবে।"

এই বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, মেজো পিসেমশাইয়ের বুকপকেটে আংটি ফেলে দিয়ে হলের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির দিকে দে ছুট। পিসেমশাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। সিঁড়ির প্রথম ধাপটা অবধি তাকে লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে দেখতে পেলেন, তার পর সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর পিসেমশাইও তক্ষুনি "আরে বাপ" বলে মূর্ছা গেলেন।

পরদিন সকালে জগুর বাবা, পটলের মামা, আমার বাবা, আরো পাঁচ-সাতজনা গিয়ে ঠ্যাঁ ধরে টেনে পিসেমশাইয়ের ঘুম ভাঙালেন। উঠে দেখেন ঘরদোর রোদে ভরে গেছে। তাঁরা বললেন, "উপরে গেছিলি? তবে দে, উপরের বর্ণনা দে।"

ঠিক বলছেন কি না পরখ করবার জন্য সবাই মিলে উপরে গেলেন। পিসেমশাইও গেলেন। সব ঘরদোর শূন্য হাঁ হাঁ করছে। জগুর বাবা তো রেগে টং। ইস্, অত ভালো ছাগলছানা হাতছাড়া হয়ে গেল। ইস্, ক্লাবের রাক্ষসগুলোকে তার উপরে বাজির খাওয়া খাওয়াতে হবে।

মাটিতে 'অশরীরী-খুনে' পড়ে ছিল।

"এ্যাঁ! ঠিক হয়েছে। বড় যে ঘুমুচ্ছিলি, বইটা পড়েছিলি? বল্ তবে, আগাগোড়া গল্পটা বল।" মেজোপিসেমশাই-এর মুখে আর কথাটি নেই। মনে মনে দেখতে পেলেন জগুর বাবা সোনালী ছাগলটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সারারাত ঘুম লাগিয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন, তার উপযুক্ত সাজা তো হবেই।

লজ্জায়, দুঃখে, মাথা নিচু করতেই চোখে পড়ল বুক পকেটের ভিতর হীরের আংটি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মেজো পিসেমশাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন, "নিয়ে যা তোর ছাগল। ইস্ ভারি তো ছাগল।" বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা বাড়িমুখো রওনা দিলেন।

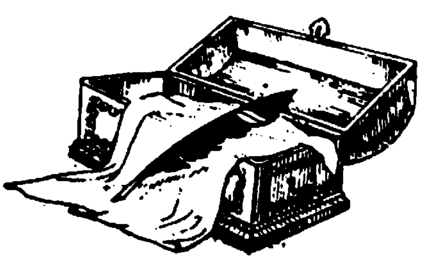

খাগায় নমঃ

ছোটবেলায় এই দোল-টোলের সময়, দেশে যেতাম, আমার ছোটঠাকুরদা আমাদের যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প বলতেন, সে-সব একবার শুনলে আর ভোলা যায় না। একদিন বললেন, "দেখ্, এই যে আমাদের গুষ্টির ধন-দৌলত দেখে গাঁ সুদ্ধ লোকের চোখ টাটায়, এ কি আর অমনি অমনি হয়েছিল ভেবেছিস, না কি চিরকাল এমনটি ছিল? বুঝলি এ সব লেখাপড়া শিখে সারা জীবন খেটেখুটেও কেউ করে দিয়ে যায়নি, বা

-ডারিতেও জেতে নি। কি শ্বশুরের কাছ থেকেও পায়নি। মাটি খ‍ুঁড়তে-খ‍ুঁড়তেও কেউ ঘড়া-ঘড়া সোনা পায়নি, চুরিও করেনি, ডাকাতিও করেনি। তবে হল কি করে? আরে, ও-সব করে কি আর সত্যি-সত্যি ভাগ্য ফেরে? এই আমাকেই দেখ্ না, তিন-তিনটি বার ম্যাট্রিক ফেল করে সেই নাগাদ দিব্যি বাড়িতে বসে আছি। কিন্তু তাই বলে কি আর আমি তাদের কারু চাইতে মন্দ, না কি তাদের চাইতে কম খাই? তোরাই বল্ না। এই দেখ্, এরকম হীরের আংটি দেখেছিস কখনো? এটার দাম কম-সে-কম একটি হাজার টাকা। কখনো ভেবেছিস এত সব হল কোত্থেকে? এই যে দু-বেলা তাল তাল মাছ মাংস দই ক্ষীর তোরা পাঁচজনা ওড়াচ্ছিস, তাই-বা আসে কোত্থেকে? জানিস, এ-সমস্তরই একমাত্র কারণ হল গিয়ে একটা এই এত বড় কালো পালক।"

শুনে আমরা তো হাঁ। ছোটঠাকুরদা আরো বললেন—

"হ্যাঁ, একটা কালো পালক ছাড়া আর কিছুই নয়। ওটিকে তোরা না-দেখে থাকতে পারিস, কিই-বা দেখেছিস দুনিয়াতে, ভূত পর্যন্ত দেখিসনি। তবে ওটি কর্পূর-টর্পুর দিয়ে লাল সালুতে মোড়া হয়ে, একটা চন্দন কাঠের বাক্স করে আমার ঠাকুমার লোহার সিন্দুকে পোরা আছে।

"তোদের মতো আকাট মুখ্যুদের কিই-বা বলব, তবে শোন ব্যাপারটা গোড়া থেকে। আমার ঠাকুরদা ভারি চালাক-চতুর কায়দা-দুরস্ত মানুষ ছিলেন। ক্যায়সা তার চুলের টেরি বাগাবার ঢঙ, ক্যায়সা কোঁচানো মল্‌মলি ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, কানের পিছনে তুলোর পুঁটলি করে আতর গোঁজা। সে-সব একবার দেখলেই লোকের তাক লেগে যেত। তার উপর আবার লোককে খুশি করতে তাঁর জোড়া খ‍ুঁজে পাওয়া দায় ছিল। বুঝতেই পারছিস এইসব কারণে এখানকার যিনি রাজা ছিলেন তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদার ভারি দহরম-মহরম ছিল। সেইজন্য রাজসভাতেও তাঁর বেজায় খাতির, আর তাই দেখে পাঁচজনার হিংসে!

"এক-এক দিন সকালে স্নান সেরে সেজে-গুজে ঠাকুরদা রান্নাঘরের পাশের ঐ গন্ধ-রাজ গাছটি—ওটির কি কম বয়স ভেবেছিস?—ঐ গাছটা থেকে দুটো ফুল পেড়ে নিয়ে রাজসভায় গিয়ে হাজির হতেন, আর সটাং গিয়ে রাজার কানে-কানে কি যে না বলতেন তার ঠিকানা নেই। ব্যস, রাজাও আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাতের কাছে যা পেতেন, শাল-দোশালা—শিরোপা, জামাজুতো, সব তাঁকে উপহার দিয়ে বসে থাকতেন!

"এমন-কি, শেষটা এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, দূর থেকে তাঁকে সভায় ঢুকতে দেখেই সভাসদ যত উজির-নাজিররা যে-যার গয়নাগাটি, জুতো, পাগড়ি লুকিয়ে ফেলতেন। এমনি সব ছোট মন ছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস যে এ'রা কেউই ঠাকুরদা বেচারিকে সুনজরে দেখতেন না। সত্যি কথা বলতে কি সব্বাই তাঁর উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন, এমন-কি, একা পেলে তাঁকে খোসামুদে বলে অপমান করতেও ছাড়তেন না। অবিশ্যি তাতে আমার ঠাকুরদার কাঁচকলাও এসে যেত না, তিনি দিব্যি আদরে-গোবরে রাজার কাছে দিন কাটাতেন।

"এখন মুশকিল হল যে মানুষের কখনো চিরদিন একভাবে যায় না। তোরাই কি আর সারাটা জীবন ঐরকম কাজকর্ম্ম না করে পরের ঘাড়ে দিব্যি চেপে কাটাতে পারবি ভেবেছিস? ঠাকুরদা বেচারি খাসা নিশ্চিন্তে রাজসভায় মৌরসি পাট্টা গেড়ে জেঁকে বসেছেন। রাজবাড়ি থেকে রোজ তাঁর জন্য কলসি-কলসি দুধ, ঘি, ভাঁড়-ভাঁড় দই ক্ষীর, ধামা-ধামা চাল-কলা, থোক থোক নতুন গরদ, তোড়া-তোড়া মোহর যায়। তাঁর আবার ভাবনা কিসের?

"এমনি সময় হঠাৎ একদিন কোত্থেকে এক ছোকরা কবি, বলা নেই কওয়া নেই,

একেবারে রাজসভায় এসে হাজির! কেউ তাকে কস্মিনকালেও চোখে তো দেখেনি, নাম পর্যন্ত শোনেনি। কিন্তু যেমনি তার রূপ, তেমনি তার খোসামুদে স্বভাব ; দুদিনের মধ্যে রাজ্যসুদ্ধু রাজসভাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলল।

"কী আর বলব তোদের! তার উপর তার খাসা গানের গলা ছিল, আর কত যে ছলচাতুরি জানত! যখন-তখন তেমন-তেমন করে দুটো ছড়া গেঁথে নিয়ে গুবগুবাগুব বাজিয়ে, বাউলদের মতো করে এমনি নেচে-কুঁদে দিত যে সভাসুদ্ধু সব্বাই একেবারে গলে জল।

"ওদিকে ঠাকুরদা পড়ে গেলেন মুশকিলে। রাজা আর তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না। রাজবাড়ি থেকে রসদের লাইনও বন্ধ। এমনিতেই রাজ্যের লোককে চটিয়ে রেখেছেন। আর বছরের পর বছর বসে-বসে এটা-ওটা খেয়ে দারুণ কুঁড়েও হয়ে গেছেন, তায় আবার দিব্যি টইটম্বুর একটি নাহাপাতিয়াও বাগিয়েছেন। অন্য জায়গায় কাজকর্মের জন্য যে একটু চেষ্টাচরিত্তির করবেন তারও জো নেই। অথচ মনে-মনে বেশ বুঝছেন যে এবার এখানকার পাট উঠল, ঐ ছোকরার সঙ্গে পেরে ওঠা, শুধু তাঁর কেন, তাঁর চোদ্দো-পুরুষের কারো কম্ম নয়!

"আস্তে আস্তে ঠাকুরদার জীবন থেকে সুখ-শান্তি বিদায় নিল।—এই, তোরা যে বড় হাসছিস? নিজের অতিবৃদ্ধ-ঠাকুরদার দুর্গতির কথা শুনলে তোদের হাসি পায়? আরো শোন্ তবে।—মানুষের অবস্থা মন্দ হলে যেমন হয়, ভোর না-হতেই—গয়লা রে, মুদি রে, তাঁতি রে, নাপিত রে, ধোপা রে, যে যেখানে ছিল সব টাকা দাও টাকা দাও করে সারি সারি হাত পেতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

"ওদিকে দিনে-দিনে অভাবে অনটনে ঠাকুমার মেজাজও এমনি খিঁচড়ে যেতে লাগল যে বাড়িতে টেঁকাও দায় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত একদিন গভীর রাতে ঠাকুরদা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন। গভীর রাতে পা টিপে-টিপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে সটাং গিয়ে এই গ্রামের বাইরে মাঠের মাঝখানে যে বিখ্যাত ভুতুড়ে বটগাছ ছিল, দিনের বেলাতেও যার ছায়া মাড়াতে লোকে ভয় পেত—ইদিক-উদিক কি তাকাচ্ছিস বল দিকিনি? সে গাছ কোনকালে মরে-ঝরে চ্যালাকাঠ হয়ে গেছে। এখন চুপ করে শোন তো।—সেই গাছতলাতে না গিয়ে, এক হাঁড়ি শুঁটকিমাছ নিবেদন করে দিয়ে ঠাকুরদা ধর্না দিয়ে পড়ে থাকলেন। একটা যা-হয় ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত উঠবেন না।

"পড়ে আছে তো পড়েই আছেন। প্যাঁচা-ট্যাঁচা ডাকছে, কিসের একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে, কি সব সড়সড় খড়খড় করে পায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কারা জানি চাপা গলায় ফিস্-ফিস্ করছে, কিন্তু ঠাকুরদা নড়েনও না চড়েন না।

"হয়তো-বা একটু তন্দ্রামতো এসে থাকবে, হঠাৎ মনে হল কে যেন বলছে 'ওঠ ব্যাটা, বাড়ি যা। যা যা বাড়ি যা, আর তোর কোনোও চিন্তা নেই। ওঠ্ বলছি। কেটে পড় দিকিনি। কি জ্বালা! ভাগ বলছি!'

"ঠাকুরদাও তখনই আর কালবিলম্ব না করে, উঠে পড়ে বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন। আর, কি আশ্চর্য ব্যাপার! একেবারে দোরগোড়ায় এসে দেখেন, পায়ের কাছে কি একটা লম্বাটে জিনিস চাঁদের আলোতে চকচক্ করছে। তুলে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখেন, কুচকুচে কালো একটি পালক। তার মাঝখানে একটা চওড়া সাদা ডোরা কাটা, মুখের দিকটা একটু ছুঁচল মতন, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা এক খাগের কলম।

"কলমটা হাতে নিতেই হাতের আঙুলগুলো কেমন চিড়বিড় করে উঠল। ঠাকুরদা আর থাকতে না পেরে ঠাকুমার আলতার শিশি আর ধোপার হিসেবের খাতা নিয়ে বসে পড়লেন। আর সেই অদ্ভুত কলমটি, বিশ্বাস করিস আর নাই করিস, অনবরত

কি যে মাথামুণ্ডু লিখে যেতে লাগল, পড়ে তো ঠাকুরদার নিজেরই চুল-দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল।"

এই অবধি শুনে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে বললাম, "কেন? চুল-দাড়ি খাড়া হবে কেন?"

"আরে, সে যে দাঁড়াল গিয়ে একটা ভূতের গল্প, যা পড়লে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়! আমার ঠাকুরদা নিজের লেখা নিজে পড়ে প্রথমটা থ মেরে গেলেন। পরে বুঝলেন ধর্না দেওয়ার ফল ধরেছে। সারাদিন ঘরে বসে গল্পটা মুখস্থ করে ফেললেন, তার পর সন্ধ্যা লাগতে সেজেগুজে রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন!

"দেখেন গিয়ে, সেই ব্যাটা হাত-পা নেড়ে দাঁত বার করে গান ধরেছে, আর লোক-গুলো সব হাঁ করে তাই শুনছে আর বাহবা দিচ্ছে।

"ঠাকুরদা সভায় ঢুকতেই সঙ্গে-সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া এসে ঝাড়লণ্ঠনটার অনেকগুলো আলো নিবিয়ে দিল। গানও তক্ষুনি থেমে গেল, সভাও থমথমে চুপচাপ হয়ে গেল। আর ঠাকুরদা রাজার সামনে এসে সিংহাসনের সিঁড়ির ধাপে বসে নিচু গলায় ভূতের গল্প শুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সভাসদরা যে-যার আসন ছেড়ে ঠাকুরদাকে ঘিরে বসল। কবি ছোকরা তো পাঁচজনকে সরিয়ে দিয়ে সবচেয়ে কাছে এসে ঘেঁষে বসল। ঠাকুরদা অর্ধেকটা বলে থেমে গেলেন। কবি ব্যাকুল হয়ে বলল, 'তার পর?' রাজা বললেন, 'তার পর?' সভাসুদ্ধ সকলে বলল, 'তার পর?'

"গল্প শেষ করে ঠাকুরদা হাত জোর করে বললেন, 'মহারাজ, এবার আমায় বিদায় দিন। এখানে খেতে পাই নে, ভিনগাঁয়ে দেখি গিয়ে চেষ্টা করে।' রাজা কিছু বলবার আগেই কবি বললে, 'না, না, সেকি! তা হলে আমাদের ভূতের গল্প কে বলবে? এই নাও আমার মনিব্যাগটা নাও', দেখতে-দেখতে সভার লোকরা ভিড় করে যে-যা পারে ঠাকুরদার হাতে গুঁজে দিতে লাগল। ঠাকুরদা সে-সব চাদরে বেঁধে বাড়ি গিয়ে সকাল-বেলায় সব ধার-টার শোধ করে দিলেন।

"তার পর আবার সেই খাগের কলমে হাত দিয়েছেন কি, আবার আঙুল চিড়বিড় করে আবার সেইরকম লেখা বেরুতে লাগল। এমনি করে ঠাকুরদা এক বছর ধরে তিনশো পঁয়ষট্টিটা ভূতের গল্প লিখে ফেলেছিলেন। আর ঘরের মধ্যে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছিলেন। তাই দিয়েই তো বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, গোরু-বাছুর, ক্ষেত-খামার সব হয়েছিল। তাই থেকেই তো তোরা সব দিব্যি মজা লুটছিস।"

আমরা বললাম, "তার পর উনি থেমে গেলেন কেন? মরে গেলেন বুঝি?"

ছোটঠাকুরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মোটেই মরেননি! তোরা বললেই ওঁকে মরে যেতে হবে নাকি? মরেন-টরেননি। তবে এক বছর বাদে একদিন পুরোনো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখেন এই মোটা একটা কালো পাতিহাঁস চান সেরে পাড়ে উঠে পালক সাফ করছে, আর ঠোঁটের খোঁচা খেয়ে এত বড়-বড় কালো পালক এদিক-ওদিকে পড়ে যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটাতে একটা করে চওড়া সাদা দাগ আর মুখটা কেমন ছুঁচল ধরনের, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা খাগের কলম!

"তাই দেখে ঠাকুরদা ঘরে গিয়ে সিন্দুক থেকে নিজের খাগের কলমটা নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখলেন হুবহু এক, একেবারে বেমালুম মিলে গেল! এমনি মিলে গেল যে কোনটা নিজের পালক তা একদম আর চেনাই গেল না! এক ফোঁটা লাল আলতাও তাতে লেগেছিল না। রোজ তাকে এত যত্ন কর পরিষ্কার করা হত।

"ব্যস্ গল্প লেখা বন্ধ হল, ঠাকুরদাও পেনসিল নিলেন। কিন্তু তদ্দিনে তাঁর অবস্থাও ফিরে গেছে, চিন্তাও ঘুচে গেছে। শেষ বয়সটা দিব্যি আরামেই কাটল। ঐ

গল্পগুলোর কতক-কতক হারিয়ে গেছে, কিন্তু ধোপার খাতায় লেখা প্রথম পঞ্চাশটি আমার কাছে আছে। আমার কথা মতো চলিস যদি, মাঝে মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।

"ছোট্‌ঠাকুরদা মারা যাবার আগে আমার উপর খুশি হয়ে ঐ খাতাটা আমাকে দিয়ে গেছেন। এখন ওটি আমার কাছে আছে। তোমরাও যদি আমার কথা মতো চলো তো মাঝে-মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।"

লক্ষ্মী

বোর্ডিং-এর মাসিমা মাখনের কৌটো, জ্যামের শিশি, সব জালের আলমারিতে বন্ধ করে বললেন, "লক্ষ্মী বড় দুষ্টু মেয়ে। কেউ এসে খাবার টেবিলে বসবার আগেই, কোথাকার এক পাতি বেড়ালকে অর্ধেক মাখন জ্যাম খাইয়ে দিয়েছে। কেন?"

লক্ষ্মী বলল, "ওর যে খিদে পেয়েছিল, ম্যাও-ম্যাও করে কাঁদছিল।"

মাসিমা রেগেমেগে বললেন, "তাহলে বেড়াল নিয়ে আজ তুমি আমার স্নানের ঘরে বন্ধ থাক। আমরা সকলে ঝরণাতলায় চড়ি-ভাতি করতে যাচ্ছি।"

শুনে লক্ষ্মী এমনি অবাক হয়ে গেল, সে আর কি বলব। তারপর যখন মণি, ফেণি, ললিতা, বুলু, এমন কি বোকা মুকুল পর্যন্ত মাসিমার সঙ্গে ঝরণাতলায় যাবার জোগাড় করতে লেগে গেল, লক্ষ্মীর মুখে কথা সরে না।

হিংসুটি মালতী একটা টফির বাক্সে শুকনো পাঁউরুটি আর এক বোতল জল স্নানের ঘরের তাকের ওপর রেখে, ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করে হাসতে হাসতে বলল, "এই রইল তোমার খাবার। আমরা লুচি, কপি ভাজা, আলুর দম আর ক্ষীরের সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছি।" তখন তার চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে দুবার মাথা ঠুকে দিয়ে, ঠেলে দরজার বাইরে বের করে না দিয়ে লক্ষ্মী করে কি?

মালতীটি এমন ছিঁচকাঁদুনে যে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে করতে অমনি চলল নালিশ করতে।

লক্ষ্মী স্নানের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, একটা জলচৌকিতে ভাবতে বসল। ভুলে জানলা বন্ধ করেনি, সেখান দিয়ে বড় মেয়ে অনুদিদি যেই না মুখ বাড়িয়ে বলতে শুরু করেছে, "ছিঃ! তোমার কি লজ্জাও নেই! কিন্তু মাসিমা বলেছেন আর যদি কখনো এমন খারাপ কাজ না কর, তাহলে তোমাকে ক্ষমা—" এই অবধি বলে আর কিছু বলা হল না, কারণ টবের হাতলে একটা বড় মাকড়সা বসেছিল, লক্ষ্মী সেটাকে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে অনুদির মুখে ছুঁড়ে মারল।

অনুদি আঁউ-আঁউ করতে করতে দৌড়ে পালাল। লক্ষ্মী জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে, তাক-ঢাকা কাগজ পাকিয়ে নল বানিয়ে, নলের মাথা ভিজিয়ে সাবানের গায়ে ঘষে, রাশি রাশি ছোট ছোট বুদ্বুদ ওড়াতে লাগল।

দেখতে দেখতে ঘরময় সাবান-জলের ফোঁটা পড়ে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেল। তাছাড়া আর বুদ্বুদ ওড়াতে ভালো লাগছিল না। লক্ষ্মী দু-হাত কনুই অবধি ডুবিয়ে জল ঘাঁটতে বসে গেল, কাপড়চোপড় ভিজে চুপ্‌চুড়।

যাবার আগে মাসিমা নিজে এসে দরজায় ঠেলাঠেলি করতে লাগলেন, "দরজা খোল, লক্ষ্মীটি, সত্যি কি আর তোমাকে ফেলে যেতে পারি আমরা। ঐ একটু শিক্ষা দিলাম। চল, আমরা এবার রওনা হব।"

লক্ষ্মী জানালাটা একটু ফাঁক করে মাসিমাকে কাঁচকলা দেখাল। মাসিমার নরম ফরসা গালটা রাগের চোটে লাল শক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "বেশ ত তবে থাক ওখানে!"

বলে বাইরে থেকে দরজা জানলার শিকলি তুলে দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। একটু পরেই বাইরে ওদের কলকল শব্দ শোনা গেল। সবাই রওনা হয়ে গেল, চৌকিদারের ছেলে সাঁইলা ওদের খাবারদাবার নিয়ে চলল। জানলা ফাঁক করে লক্ষ্মী সব দেখল।

ওরা সত্যি সত্যি চলে গেলে পর বোর্ডিং-বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। সে কি ভয়ংকর চুপচাপ যে ভাবা যায় না. কানের মধ্যে কি রকম ঝিম-ঝিম শব্দ হতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি, কড়ি বরগা থেকে কেমন মট্‌-মট্‌ আওয়াজ শোনা গেল।

চৌকিদার, মালী. এদের ঘর অনেক দূরে, ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না। জ্যোঠি বলে যে বুড়ি ওদের রান্নাবান্না করত, সে-ও এ বেলার মতো কাজ সেরে নিশ্চয় নিজের ঘরে চলে যাবে। তিনটের আগে তার টিকির ডগা দেখা যাবে না। চারটের সময় চড়ি-ভাতিওয়ালীরা ফিরবার আগে চা জল-খাবার বানাবে। লক্ষ্মীর কথা হয়তো তার মনেও থাকবে না।

রেগে গিয়ে লক্ষ্মী মাসিমার চুল কালো করার ওষুধের শিশি থেকে সব ওষুধটা নর্দমায় ঢেলে দিয়ে. শিশিটা টবের পিছনে লুকিয়ে রাখল। বুঝুক মাসিমা খারাপ ব্যবহার করার ফল!

টবের পিছনের দেওয়ালটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত। রঙটাতে কেমন ছোপ ধরে. বিকট সব মুখ হয়ে আছে। এই বাড়িটাই একটু অদ্ভুত. আগে নাকি এখানে এক চা-বাগানের সায়েব থাকত, তার স্ত্রীরা সবাই মরে যেত। তার পর থেকে রাতে কি সব আওয়াজ হত, বড় বাড়িতে চাকর-বাকররা শুতে চাইত না। এ-সব জ্যোঠির মুখে শোনা। শেষটা টিকতে না পেরে বাড়িটা বাস্তু বিভাগকে দান করে সায়েব বিলেত চলে গেল। সে-ও প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল।

সেই ইস্তক বাড়ি খালি পড়ে ছিল। পয়সা দিলেও কেউ থাকত না। জ্যোঠিকে একশো টাকা দিলেও রাত দশটার পর সে এ-বাড়িতে থাকতে রাজী নয়। দশ বছর আগে বাড়ি মেরামত করে. সাজিয়ে-গুজিয়ে. এই সরকারী স্কুল হয়েছে। একজন মোটা মন্ত্রী নিজে এসে লাল রেশমী ফিতে কেটে ইস্কুল খুলে দিয়েছিলেন। বড় লোকরা ভালো কাপড়চোপড় পরে. হাততালি দিয়েছিলেন। নতুন চৌকিদাররা মুরগি বলি দিয়ে. দেওয়ের পুজো দিয়েছিল। হুঃ। তাতে তো ভারি ফল হল! যাক গে জ্যোঠি এ নিয়ে কিছু বলতে চান না। এক্ষুনি মাসিমা আসবেন।

বেড়ালটাকেও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই ছিল. এই নেই। ঘরের দরজা-জানলা তো বন্ধ. তাহলে সে গেল কোথায়। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে লক্ষ্মী স্নানের ঘরের বাইরের জানলাটা খুলে চারদিকে দেখতে লাগল। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে জ্যোঠি বেরিয়ে এসে. দরজা বন্ধ করে এই বড় একটা তালা লাগিয়ে দিল। তারপর দোতলায় লক্ষ্মীর দিকে চোখ পড়তেই, ঠোঁট কুঁচকে বলল. "নাও এবার বোঝ

ঠেলা! রোজ রোজ আমার দুধের সর ছিঁড়ে খাওয়া, ময়লা আঙুলে ময়দা ঘাঁটা, কলের জল খুলে রাখা, এবার বেরুচ্ছে সব!"

শুনে লক্ষ্মী এমনি অবাক হয়ে গেল যে শুধু জিব ভ্যাংচানো ছাড়া কিছু করতেই পারল না। কারণ ও-সব ও মোটেই করেনি। কিন্তু যে করেছে সে বেশ করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে, লক্ষ্মী খুব খুসি হয়েছে। জ্যেঠি খোবানি গাছের তলা দিয়ে ঘুরে সামনের গেটের দিকে চলে গেল।

লক্ষ্মী বাইরে চেয়ে রইল। নীল আকাশের ওপর বরফের পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে আঁকা। রান্নাঘরের পেছনের রাস্তা বেজায় পিছল। তার ওপারে ছোট্ট একটা ঝরণা, অনেক ওপর থেকে পড়ছে। কান খাড়া করলে তার ঝর্-ঝর্ শব্দ শোনা যায়। ওর নাম নাকি "মণি-ঝোরা"। জ্যেঠি বলে মনে পাপ থাকলে, মণি-ঝোরার জল খেলেই পেট কামড়ায়।

মণি-ঝোরার দিকে যাওয়া বারণ। অনেক বছর আগে প্রকাণ্ড ধস নেমে মণি-ঝোরার ও-পারের পাহাড়ের গা খসে, বাড়ি-ঘর লোকজন নিয়ে, এক্কেবারে নিচে, সেই সোনোরি-চঙে পড়ে গেছিল। আগে ওখানে নাকি খুব ভালো একটা ফলের বাগান ছিল, মস্ত একটা বাড়ি ছিল, সেখানে দুষ্টু মেয়েদের ভালো হতে শেখানো হত। মাসিমা একদিন বলেছিলেন সেটা এখন থাকলে লক্ষ্মীকে ভরতি করে দিতেন। ভেবেও এমনি রাগ হল লক্ষ্মীর যে মাসিমার সুগন্ধি সাবানটা টবের জলে ফেলে দিয়ে, গোলাপ-এসেন্সের তেলটার অর্ধেক নিজের মাথায় আর পায়ে মেখে ফেলল।

তারপর আবার জলচৌকিতে বসে রইল। হঠাৎ কানে এল বাইরে ধুপধাপ, কল-কল শব্দ। এ আবার কি? অমনি জানালার কাছে গিয়ে দেখে কি না আজ ছুটির দিন এক পাল মেয়ে এসে স্কুল-বাড়ির বাগানে ঢুকেছে। নিশ্চয় পেছনের কাঠের গেট দিয়ে। সামনের দিকে তো চৌকিদারের ঘর। ওদের দেখেই লক্ষ্মীর মনটা খুসি হয়ে ওঠে। মেয়েগুলোর সব ক'টার দুটো করে বেণী বাঁধা, গায়ে গাঢ় নীল জামা-পরা, এই শীতের দেশেও খালি পা। কিন্তু কি দুষ্টু, কি দুষ্টু! এসেই মাসিমার শাকের গাছ মাড়িয়ে, গাঁদাফুল গাছ উপড়ে, তর্‌তর্‌ করে গাছে চড়ে কাঁচা খোবানি ছিঁড়ে, সে যে কি অসভ্যতা আরম্ভ করে দিল দেখে লক্ষ্মীর চুল খাড়া!

শেষটা আর থাকতে না পেরে ওপর থেকে ডেকে বলল, "অ্যাই অসভ্য মেয়েরা! আমাদের বোর্ডিং-এ এসে কি লাগিয়েছিস্? পালা বলছি!"

তাই শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে তারা হেসেই কুটোপাটি! "কেন, মারবি, নাকি? তাহলে অত বোলচাল না ঝেড়ে নেমে এসে মার না।" এই বলে ভেংচি কেটে, বক দেখিয়ে, এক পায়ে নেচে, দু'কানে দুই বুড়ো আঙুল পুরে আঙুল নেড়ে, যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধাল।

স্নানের ঘরের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যে ক'টা উঠে আসছিল, লক্ষ্মী তাদের গায়ে এক মগ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। তারা যে কি খারাপ কথা বলতে লাগল সে ভাবা যায় না! তারপর টপটপ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে, বৃষ্টির জল যাবার পাইপ ধরে ঝুলতে লাগল।

লক্ষ্মী বলল, "আমাকে যদি ছেড়ে দাও, তাহলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

মেয়েগুলো থমকে থেমে গেল। "ঘরে বন্ধ? ছুটির দিনে তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে! কি খারাপ! কি খারাপ! দাঁড়াও এক্ষুনি খুলে দিচ্ছি।" এই বলে পাইপ থেকে দোল খেয়ে দুটো রোগা মেয়ে স্নানের ঘরের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল। লক্ষ্মী একেবারে হাঁ! পকেট থেকে পুরনো একটা চাবি বের করে, কাঠের সিঁড়ির মাথায় স্নানের ঘরের

বন্ধ দরজায় মাসিমা যে তালা লাগিয়ে গেছিলেন, সেটাকে কুট্‌ করে খুলে ফেলল।

লক্ষ্মী অবাক হয়ে বলল, "ও কি রকম চাবি ভাই, বিলিতী তালাও খোলে?"

ওরা খিল খিল করে হেসে বলল, "সব তালা খোলে এই চাবি দিয়ে। তোমাদের রান্না-ঘরের তালাও!"

লক্ষ্মী যেন আকাশ থেকে পড়ল, "তোমরাই তাহলে জ্যেঠির সব ছেঁড়ো, ময়দা ছড়াও?"

ওরা বেজায় হাসতে লাগল, "তাছাড়া উনুনে জল ঢেলে রাখি, মুরগি ছেড়ে দিই, দুধে তেঁতুল ফেলি, আরো কত কি করি।"

লক্ষ্মী একটু গম্ভীর হয়ে গেল, "কোথায় থাক তোমরা?"

ওরা বলল, "কেন, আমাদের ইস্কুলে! মণি-ঝোরার ওপারে।"

লক্ষ্মী বলল, "দেখেছ, মাসিমা কি খারাপ! বলে নাকি ওদিকে যেও না, ওদিকে কিচ্ছু নেই।"

মেয়েগুলো এ-ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, "কিছু নেই তো, তুমি দেখবে চল।"

তাই নিয়ে গেল ওরা পেছনের পিছল রাস্তা দিয়ে, মণি-ঝোরার ঝরণার ঠিক মাথার ওপর দিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে সবাই আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে নিল। তারপর খাড়া খানিকটা পাহাড় বেয়ে উঠল। সেখানে ঝোপে-ঝাড়ে থোপা-থোপা লাল কালো বেরি হয়েছিল। কি মিষ্টি, কি মিষ্টি! একটাতেও পোকা নেই। তাই শুনে মেয়েগুলো কি খুসি! "ঠিক তাই! একটা খারাপ জিনিস পাবে না আমাদের ইস্কুলে।"

বাস্তবিকই তাই। চারদিকে ফুল-ফলের বাগান ফুটফুট করছে। গাছে গাছে পাকা কমলা, কলা, আপেল, ঝোপেঝাপে লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে গোলাপ ফুল। মস্ত লম্বা একটা একহারা বাড়ি। তার সব দরজা-জানলা খোলা।

ঘরের মধ্যে তাকের ওপর সারি সারি ছবির বই, গল্পের বই, বোয়ম-বোঝাই লজঞ্জুস, টফি, ভাজা মশলা, কুলের আচার, চীনেবাদামের তক্তি, আমসত্ত্ব। যার যত খুশি নাও আর খাও।

চারদিকে কত কুকুর, কত বেড়াল, কত ছাগলছানা, কত মুরগির বাচ্চা। কেউ বন্ধ নেই, সবাই ছাড়া। তাদের মধ্যে সেই পাতি বেড়ালটাও ছিল।

লক্ষ্মী একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমরা মণি-ঝোরার জল খেলাম, পেট-ব্যথা করবে না?" ওরা বলল, "দূর, বোকা! ব্যথা তো থাকে পেটে, জলে থাকবে কেন?" তাইতো, এ-কথা তো লক্ষ্মীর আগে মনে হয়নি।

লক্ষ্মী তখন বলল, "তোমরা বড় ভালো, তোমাদের নাম কি, ভাই?" ওরা বলল, "আমরা তোমার বন্ধু।"

বলে তরতর করে এক গাছে উঠে, ডাল ধরে ঝুলে আরেক গাছ দিয়ে নামল। ওরা নাকি খিদে পেলেই খায় আর ঘুম পেলেই ঘুমোয়।

লক্ষ্মী বলল, "তাহলে পড় কখন?" ওরা হেসেই কুটোপাটি, "কি যে বল! দুষ্টু মেয়েরা আবার পড়ে নাকি? যে বইতে ছবি নেই, সে-বই আমরা পড়ি না। আর যে বইতে ছবি আছে, সে-বই তো পড়ার বই নয়। তবে আর পড়াশুনোর কথা কেন বল!" এই বলে দৌড়, দৌড়, দৌড়! যাদের সাহস বেশি তারা মণি-ঝোরার জলের ধারা বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে যেতে লাগল, আবার জলের ধারের রডোডেনড্রন গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ফিরে এল।

শেষটা কখন যে বিকেল হয়ে এল লক্ষ্মীর খেয়াল নেই। যেই না গুম্ফার লামা ঘণ্টা পিটল, অমনি লক্ষ্মী লাফিয়ে উঠল, এই রে! চারটে বাজে যে! মাসিমারা এক্ষুনি

ফিরবেন!

ওরা সবাই হাসতে হাসতে ওকে হাত ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে বোর্ডিং-এর মাসিমার স্নানের ঘরের কাঠের সিঁড়ির ওপরে পৌঁছে দিয়ে বলল, "তুমি একটু বস! আমরা সব সাফ করে দিই।" এই বলে তারা স্নানের ঘরে ঢুকে গেল।

লক্ষ্মী বলল, "ওরা ধরে ফেলত।" মাসিমা হেসে বললেন, "কারা ধরত রে? স্বপ্ন সিঁড়িতে ওর পাশে বসে পড়ে, ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "ও মা! কোথায় যাব! একলা একলা সারাদিন কাটল, এখন সিঁড়ির মাথায় বেড়ালকোলে ঘুমিয়ে রইলি। যদি গড়িয়ে পড়ে যেতিস্?"

লক্ষ্মী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাসিমার ডাকে ওর ঘুম ভাঙল। মাসিমা কাঠের দেখছিলি বুঝি? চল, মাংসের সিংগাড়া কিনে এনেছি। সারাদিন কিছু খায়নি, আহা রে বাই! স্নানের ঘরে তালা দিতে ভুলে গেছিলাম নিশ্চয়ই, পালিয়ে যাসনি যে বড়?"

বেড়ালটা বলল, 'মিউ'। অর্থাৎ, পালিয়ে গেছিল বৈকি!

স্নানের ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার ঝকঝক করছিল। যেটি যেমন ছিল ঠিক তেমনটি আছে। তাকের ওপর চুল-কালো-করার-ওষুধের শিশিটাও। মাসিমা জল গরম করে ওর হাত মুখ ধোয়ালেন। বললেন, "কি জানি, চোখটা কেমন চকচক করছে, জ্বরটর আসবে না তো। তুই বরং শুয়ে থাক, আমি তোর লুচি, কপিভাজা, আলুর দম, ক্ষীরের সন্দেশ রেখে গেছিলাম যে। শিকলি তো লাগাইনি, ডুলিতে দেখলি না কেন?"

আরো পরে জ্যোঠি খাবার নিয়ে এসে, ওর থুতনির নিচে আঙুল রেখে, চোখের দিকে চেয়ে বলল, "জ্বর না আরো কিছু! তুমি মণি-ঝোরার জল খেয়েছ, এবার থেকে তুমি যা নেই তাই দেখবে।"

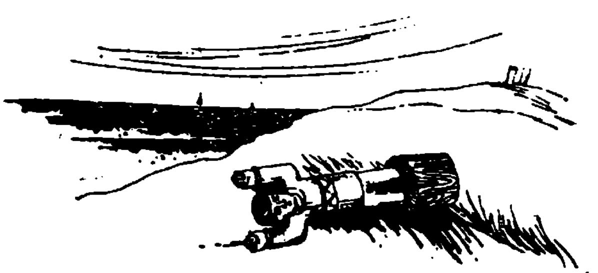

কাঠপুতলি

ছোটবেলায় মাঝে মাঝে পুরী যেতাম। সমুদ্রের ধারে থাকতাম, দেখতাম ভোরে যে-সব নৌকো সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরুত, বেলা বারোটার পর তারা ফিরত। ফিরেই নৌকো টেনে বালির উপর তুলে, জাল নামিয়ে উপুড় করে ফেলত। অমনি ঢিপি হয়ে পড়ত চেনা-অচেনা কত রকম মাছ। কতকগুলো ঠিক মাছ-ও নয়, সমুদ্রের গুগলী, আর মাছ, শামুক এই সব। মাটিতে পড়ে সেগুলো চিকচিক কিলবিল করত আর আমরা অমনি দেখতে ছুটতাম। বড়রা চ্যাঁচামেচি করতেন, "এই সমুদ্রে চান করে এস। রান্না হয়ে গেছে, এক্ষুনি খাবার দেব, আবার ঐ দেখ সব রোদ্দুরে মাছ দেখতে ছুটল।" তা কে কার কথা শোনে।

অদ্ভুত সব মাছ; শুঁড়-ওয়ালা গোল মাছ, দাঁড়-ওয়ালা করাত-মাছ, তেলচুকচুকে সার্ডিন মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এই সব মাছ বাজারে বিক্রি হত। এ ছাড়াও ধরা পড়ত ছোট

ছোট হাঙরের বাচ্চা, তাদের নিচের মাড়িতে দুসারি করে দাঁত। ছোট ছোট অক্টোপাস্, আটটা ঠ্যাং মেলে কিলবিল করত। এ-সব ওরা আলাদা করে রাখত।

সমুদ্রের পাড় যেখানে খুব উঁচু সেখানে জেলেদের ঘর। তালের পাতা দিয়ে বোনা গোল গোল ঘর। ঘরের বাইরে ছোট একটা পাথরের কিংবা ইঁটের ঢিবি ; তার ওপর রাতে ওরা আলো দিত। এক থুরথুরে বুড়ো জেলে এসে রোজ দাঁড়াত। তাকে সবাই উনো বলে ডাকত।

তাকে আমরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতাম। "রাতে তেল পুড়িয়ে আলো জ্বাল কেন তোমরা ?"

উনো অবাক হয়ে বলত, "না জ্বাললে দেওরা পথ চিনে আমাদের বাড়িতে কি করে আসবে ? ভূতরা পালাবে কেন ? আর দূর থেকে আমাদের ফেরি-করা ছেলেরা নিশানা পাবে কোথায় ?"

হাঙর অক্টোপাস্ দেখিয়ে বলতাম, "ওগুলো কে খায় ? কেনে ?"

"আমরা খাই। ও কি খারাপ জিনিস নাকি ? নাক সিঁটকাচ্ছ কেন ? খারাপ হলে আর থোমা গুরুর চ্যালারা খেত না।"

আমরা তো অবাক ! থোমা গুরুর চ্যালারা আবার কে ? বুড়ো তার কোঁচড় থেকে ছোট্ট একটা পুতুল বের করে দেখাল। একটা দশ বারো বছরের ছেলের মতো, কাঁধ অবধি চুল, গায়ে জামাপরা, মুখটা হাসি-হাসি। চোখ দুটো বন্ধ, হাত দুটো মাথার ওপর তোলা। প্রথমে মনে হল পাথরের তৈরি। বুড়ো বলল, "ভালো করে দেখ।" তখন দেখলাম কাঠের তৈরি, কাঠের আঁশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পাথরের মত শক্ত।

উনো বলল, "ওনার নাম খিষ্ট।"

আমরা বললাম, "খিষ্ট আবাব কি ? কেষ্ট বল।"

উনো রেগে বলল, "আমাদের দেবতারা আলাদা। ও কেষ্ট নয়।"

আমরা বললাম, "তাহলে নিশ্চয় যীশুখৃষ্ট।"

উনো পুতুলটাকে আবার ট্যাঁকে গুঁজে বলল, "আমি আমার হাঙর মাছ নিয়ে চললাম। তোমাদের কিচ্ছু বলব না।"

আমরা ওকে ধরে পড়লাম। "না, না, উনো, বলতেই হবে। ওকে কোথায় পেলে ? বললে তোমাকে শার্ট দেব।"

"এখন তোমাদের ভাত খাবার সময় হয়েছে না ? ঐ দেখ মা-জি তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে। ঠিক হয়েছে। বাঙালীদের এ-সব কথা বলতে হয় না।—শার্ট কবে দেবে ?"

"আজকেই দেব।"

"সন্ধ্যেবেলায় তোমাদের বাড়িতে যাব।"

সন্ধ্যেবেলায় শার্ট হাতে নিয়ে উনো বলল, "আমার বাবা এখানকার লোক ছিল না। মাদ্রাজের কাছে জেলেদের গাঁ আছে, সেখানে থাকত। তবে সেখানকার লোকও ছিল না ওরা। ওর বাবার বাবা সাগরের ওপার থেকে এসেছিল। বাবার মা ছিল না, সৎমা, পেট ভরে খেতে দিত না। বলত, 'জেলেরা জাল উপুড় করলে দুটো একটা ছোট মাছ ছিটকে পড়ে, তাই নিয়ে আসবি। তাহলে খেতে পাবি।' রোজ তাই আনত বাবা। জেলেরা রাগ করত। দূর থেকে বাবাকে দেখলেই তেড়ে আসত। বাবা দূরে দূরে মাছ খুঁজতে যেত।"

একদিন দেখে এক অচেনা ছেলে, ছোট জাল নিয়ে নৌকা থেকে একলা নামল। বালির ওপর জাল উল্টোতেই মাছগুলো পড়ল। সে কি মাছ ! এমন আশ্চর্য মাছ বাবা জন্মে

দেখেনি। কি তাদের রঙ, কি তাদের চেহারা! দেখে মনে হল সমুদ্রের তলাকার বাগান খালি করে ফুল তুলে এনেছে। তার মধ্যে একটিও চেনা মাছ ছিল না। একটা কালোপানা আস্ত ঝিনুক বাবার পায়ের কাছে পড়তেই বাবা সেটি পা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল। জেলে দেখতে পেল না। ঐ ঝিনুকে মুক্তো থাকে। জেলে বোধ হয় ডুবুরি।

সে ওরই মধ্যে থেকে ছোট একটা নীল রঙের অক্টোপাস্ আলাদা করে রাখতেই বাবা বলল, "ওটি আমাকে দাও। ও-তো কেউ খায় না।"

বুড়ো বলল, "না, না, আমার মাছে চোখ দিও না। ও-সব থোমা-গুরুর চ্যালারা নেবে। তারা অত মানেটানে না। গাঁসুদ্ধ সব ছেলেপুলেকে খাওয়ায়, ওদের অত মানলে চলে?"

বাবা বলল, "কে তোমার থোমা-গুরু, তার নাম তো কখনো শুনিনি?" পাকা ভুরুর তলা থেকে চকচকে চোখে তাকিয়ে বুড়ো বলল, 'তাহলে চল আমার সঙ্গে।' কোঁচড়ে করে ঝিনুকটা নিয়ে বাবা তার সঙ্গে গেল।

বাবা দেখল, সমুদ্রের বালির ওপর ছোট জেলেদের গ্রাম। গোলপাতার ঘর, মাটির দেয়াল দিয়ে বালি ঠেকিয়ে কুমড়ো করেছে, তরমুজ করেছে। ঝেঁটিয়ে-পেটিয়ে সাফ করে রেখেছে। বেলগাছের তলায় কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশটা কালো কালো ছেলে-মেয়ে, হাত জোড় করে, আকাশে চোখ তুলে, সরু গলায় গান গাইছে। বাবা বলল, "ওরা কি করছে?"

বুড়ো বলল, "দেবতার নামগান করছে। খিষ্টর পুজো করছে।" বাবা তো অবাক! 'ঠাকুর নেই, পাথর নেই, পুজো করছে কার?'

এমন সময় ঘর থেকে থোমা-গুরু বেরিয়ে এল। ছেঁড়া কাপড়-পরা, খালি পা, লাল মুখ। বাবা হাঁ করে দেখল, গান শেষ হলে ঝুড়ি থেকে রুটি নিয়ে সবাই ভাগ করে খেল। বাবাকে দিতে গেল, বাবা নেয় না। ছুঁড়ে ফেলে, বাবা ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

অনেক দূরে গিয়ে একটা টিলার নিচে পড়ল আবার থোমার সামনে। থোমা জেলেদের ভাষায় বলল, "নিলে না কেন? খিষ্টর দেওয়া রুটির মতো কি আছে?"

বাবা বলল, "আমরা গরীব লোক, শুঁটকি খাই, ওসব আমাদের নিতে নেই।"

থোমা হাসল। তাই শুনে বাবার মনটাও খুসি হয়ে গেল। থোমা বলল, "খিষ্ট-ও তো গরীব ছিল। তার বাবা ছুতোর মিস্ত্রী। সে গরীবদের কাছে ডাকত। তুই আয় আমার কাছে।" পায়ে পায়ে বাবা এগিয়ে গিয়ে ঝিনুকটা থোমার পায়ের কাছে রেখে বলল, "এটা তোমাদেরই। জেলের কাছ থেকে না বলে নিয়েছিলাম।"

"কেন নিয়েছিলি?"

"ওতে মুক্তো থাকে। একটা মুক্তো বেচলে আমাদের ছয় মাসের খাবার হয়। এখানে সবাই ঐ রকম ঝিনুক খোঁজে।"

'তবে ফিরিয়ে দিচ্ছিস কেন?'

'গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের খাবার কিনে দেবে বলে।'

থোমার হাতে ভিক্ষার ঝুলি।

ঝিনুকটা ঝুলিতে ভরে, ঝুলির মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা কাঠপুতলি বের করে থোমা বলল, "এই নাও খিষ্টর পুতুলি। মুক্তোর চেয়েও ঢের বেশি এর দাম। এ ঘরে থাকলে আর কোনো ভয় থাকে না।"

বাবা নিল না সেটাকে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভয়ে ছুটে পালাল।

মিশন স্কুলে মাষ্টারের বাড়িতে বাবা কুয়োর জল তুলত। পরদিন তাঁকে বলল, 'থোমা কে?'

মাষ্টার তো অবাক। "থোমা, তার নাম কোথায় শুনলি ? তার মতো মহাপুরুষ আর কোথায় পাব রে ? ইংরেজরা আসবার আগে সে এসেছিল, গরীবরা ছিল তাঁর প্রাণ। তার নামে মন্দির আছে। ঐ টিলার ওপর শত্রুরা তাকে মেরে ফেলেছিল। ভালো লোকদের তো আর কেউ বাঁচতে দেয় না। সে বড় ভালো লোক ছিল রে !"

বাবা সেই টিলার নিচে খুঁজে দেখল, যদি কিছু পায়। বালি সরিয়ে কাঠপুতলিটাকে আবার পেল। বদলে গেছে। কাঠ ছিল, পাথর হয়েছে। সেই চেহারা। ছোট একটা ছেলে কাঁধ অবধি চুল, জোব্বা গায়, হাত দুটি মাথার ওপর তোলা। খিষ্ট। কিন্তু থোমার সেই গাঁটাকে আর খুঁজে পেল না। সমুদ্রের ধারে সেই ছেলেকেও দেখল না।

আর বাড়ি গেল না বাবা। থোমা বলেছিল, 'খিষ্ট থাকলে কোন ভয় থাকে না।' খিষ্টকে কোমরে গুঁজে সমুদ্রের ধারে হেঁটে হেঁটে দশ বছর পরে বাবা এইখানে এসে পেঁছেছিল। ততদিনে ডুবুরির কাজ তার শেখা হয়ে গেছিল, আর তার কোনো কষ্ট রইল না। ১০০ বছর বেঁচেছিল আমার বাবা। আমাদের ঠাকুর দেবতারা ঘরে থাকে, খিষ্ট থাকে দোরের মাথায় ! বাড়ি থেকে বেরুলে ওকে সঙ্গে আনি। আর আমার কোনো ভয় থাকে না। গল্প শেষ করে উনোকে উঠে পড়তে দেখে, আমরা ওকে পয়সা দিতে গেলাম। ও রেগে পয়সা ঝেড়ে ফেলে দিল।

আমরা বললাম, "দেখি আরেকবার তোমার খিষ্টকে।" দাদা কাঠপুতলিটাকে ভালো করে দেখে বলল, "এ নিশ্চয় যীশুখৃষ্ট, খৃশ্চানদের দেবতা। দিদি বলল, "কিংবা শ্রীকৃষ্ণ, হিন্দুদের দেবতা। বৃন্দাবনে মাঘ মাসে বেজায় শীত পড়ে, তাই জোব্বা পরেছে।"

উনো আমাদের হাত থেকে কাঠ-পুতলিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "ওকে আমি চিনি না ? ও খৃশ্চানদের যীশুও নয়, হিন্দুদের কেষ্টও নয়। ও হল গিয়ে পৃথিবীর সব গরীব দুঃখীদের খিষ্ট। তোমরা ওকে কি করে জানবে !"

এই বলে উনো হন্ হন্ করে চলে গেল।

সত্যি নয়

দলের মধ্যে মেলা লোক ছিল—মেজো মামা, ভজাদা, জগদীশবাবু, গুপীর সেজদা, গুপী আর শিকারীরা দুজন। সারাদিন বনে জঙ্গলে পাখি-টাখি আর মেলা খরগোশ তাড়িয়ে বেড়িয়ে সন্ধের আগে সকলে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জমিদারবাবুর ঘোড়ার গাড়ি এসে বাজপড়া বটগাছের তলায় অপেক্ষা করতে থাকবে, ওঁরা জন্তুজানোয়ার মেরে ক্লান্ত হয়ে গাড়ি চেপে জমিদার-বাড়ি যাবেন। সেখানে স্নান-টান করে রাতে খুব ভোজ হবে। কিন্তু কি মুশকিল, আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও যখন গাড়ি এল না, শিকারীরা দুজন খোঁজ করবার জন্য এগিয়ে গেল। এরা সব গাছতলায় পা মেলে যে যার প'ড় রইল।

আরো মিনিট কুড়ি গেল, দিব্যি চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে, তখন জগদীশবাবু

লাফিয়ে উঠে পড়লেন।—"ওঠ তোরা, এ জঙ্গলে নিশ্চয়ই বাঘ আছে।" খিদেয় সকলেরই পেট জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর দারুণ পায়ে ব্যথা, কিন্তু ও কথা শুনেই সবাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বেশ তারার আলো হয়েছে। তার মধ্যে মনে হল যেন ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে যেন আলো বেশি। সেদিকে খানিকটা যেতেই সবাই অবাক হয়ে দেখল সামনেই বিশাল একটা পোড়ো বাড়ি।

মেজো মামা তো মহা খুশি। বাঃ, খাসা হল, এবার শুকনো কাঠকুটো জেবলে দুপুরের খাবার জন্য যে হাঁড়িটা আনা হয়েছিল তাতে করে খরগোশের মাংস রাঁধা যাবে। নিদেন একটু বিশ্রাম তো করা যাবে। সবাই খুশি হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

গেটটা কবে থেকে ভেঙে ঝুলে রয়েছে, একটু একটু বাতাস দিচ্ছে, তাতে ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করছে। বিশ্রী লাগে। পথে সব আগাছা জন্মে গেছে, বাগানটা তো একেবারে সুন্দরবন। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড বারান্দা। বারান্দার উপর উঠে জগদীশবাবু শ্বেতপাথরের মেজের উপর বেশ করে পা ঘষে কাদামাটি পরিষ্কার করে ফেললেন। গুপীর সেজদা একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বলল, "জায়গাটাকে সেরকম ভালো মনে হচ্ছে না"— "সেজদার যেমন কথা, ঘোর জঙ্গলের পোড়ো বাড়ি আবার এর থেকে কত ভালো হতে পারে।" গুপী আবার বলল, "বাড়িটার বিষয় আমাদের চাকর হরি একটা অদ্ভুত গল্প বলছিল। এদিকে কেউ আসে না।"

একেবারে ভাঙা বাড়ি কিন্তু নয়। দরজাগুলো সব বন্ধ রয়েছে, কেউ বাস করাও একেবারে অসম্ভব নয়। তখন সকলে মিলে মহা হাঁকডাক লাগিয়ে দিলেন। কোনো সাড়া শব্দ নেই। সকলের যে ঠিক ভয় করছিল তা নয়, কিন্তু কিরকম যেন অস্বস্তি লাগছিল, তাই সব এক জায়গায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেজো মামা বললেন,—"যা, যা, যে-সব বীরপুরুষ, নে চল্, দরজা ঠেলে খোল্, রাঁধাবাড়ার আয়োজন করা যাক।"

ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল, খালি খালি সব বিশাল বিশাল ঘর, ধুলোতে ঝুলেতে ভরা। সেকালের পুরোনো চক্-মেলানো বাড়ি, মাঝখানে বিরাট এক উঠোন, তার মধ্যে আবার একটা লেবুগাছ, একটা পেয়ারাগাছ। সবটাই অবিশ্যি আবছায়া আবছায়া। উঠোনের পাশেই রান্নাঘর, সেখানে উনুন তো পাওয়া গেলই, এক বোঁচকা শুকনো খর্-খরে কাঠও পাওয়া গেল। মেজো মামা দেখতে দেখতে জায়গাটা খানিকটা ঝাড়পোঁছ করে নিয়ে রাঁধাবাড়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখনো একটু একটু আলো ছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর বেশ অন্ধকার। তবে ওঁদের সকলের সঙ্গেই পকেট-লণ্ঠন ছিল। এখন একটু জল চাই।

আর সকলে কেউ-বা উঠোনের ধারে জুতো খুলে পা মেলে দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসে পড়েছে, আবার কাউকে—যেমন গুপীকে, গুপীর সেজদাকে খরগোশ কাটবার জন্য লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারাও বলছে জল না হলে পারবে না।

অগত্যা মেজো মামা টিফিন ক্যারিয়ারের বড় ডিবেটা আর একগাছি সরু দড়ি নিয়ে জলের চেষ্টায় গেলেন।

রান্নাঘরের ওপাশে সবজি-বাগান ছিল, তার কোনায় একটা কুয়ো দেখা গেল। মেজো-মামা খানিকটা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। আঃ, বাঁচা গেল, এখানে তা হলে লোকজন আছে। যা একটা থম্থমে ভাব, আর গুপীটা যা বাজে বকে, আরেকটু হলে ভয়ই ধরে যেত! এই তো এখানে মানুষ রয়েছে। একটা ছোক্রা চাকর ধরনের লোক কুয়োর আশেপাশে কি যেন আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মেজো মামার হাতে আলো দেখে সে ভারি খুশি হয়ে উঠল—"যাক্ আলোটি এনে বড়ই উব্গার করলেন বাবু, আমাদের বাবুর মাদুলীটা কোথাও পাচ্ছি না। বাবু আর

আমাকে আস্ত রাখবেন না।”

মেজো মামার মনটা খুব ভালো—তিনিও মাদুলী খুঁজতে লেগে গেলেন, “হ্যাঁরে কি রকম মাদুলী রে? এখানে আবার তোর বাবুও বাস করেন নাকি? আমরা তো মনে করেছিলাম বুঝি পোড়ো বাড়ি।” চাকরটা বলল, “আরে ছো, ছো! পয়সার অভাবেই পোড়ো বাড়ি। ঐ মাদুলীটা আমার বাবুকে একজন সন্ন্যাসী দিয়েছিল। ঔষধ হাতে বাঁধা থাকলে যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেটাই জিতে যেত। এমনি করে দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠলেন, টাকার গাদার উপরে বসে থাকলেন।—দেখি পা-টা সরান, এখানটায় একটু খুঁজি। হ্যাঁ, তার পর একদিন আমাকে বললেন, বড্ড জং ধরে গেছে রে, এটাকে মেজে আন্। মাজলামও। তার পর যে বিড়ি ধরাবার সময় কোথায় রাখলাম আর খুঁজে পাচ্ছি না। সেই নাগাড়ে খুঁজেই বেড়াচ্ছি, এদিকে বাবুর সর্বনাশ হয়ে গেল। যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেটাই হয় মুচ্ছো যায়, নয় বসে পড়ে, নয় খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে। এমনি করে বাড়ি গেছে, বাগান গেছে, টাকাপয়সা গয়নাগাটি, হাতিঘোড়া সব গেছে। এখন দুজনে দিনরাত সেই মাদুলীই খুঁজে বেড়াই।” উপর থেকে ভাঙা হেঁড়ে গলায় শোনা গেল—“পেলি রে?” “না স্যার।” “বলি খুঁজছিস তো নাকি খালি গল্পই কচ্ছিস?” বলতে বলতে একজন ফরসা মোটা আধবুড়ো লোক দোতলার বারান্দার ধারে এসে দাঁড়ালেন—“দেখ্ দেখ্, ভালো করে দেখ্, যাবে কোথায়?” ঠিক সেই সময়ে মেজো মামা একটু ঠেস দিয়ে পা-টা আরাম করবার জন্য হাত বাড়িয়ে যেই-না পাশের বারান্দার থামটাকে ধরেছেন অমনি তার ছোট্ট কার্নিশ থেকে টুপ্ করে পুরোনো লাল সুতোয় বাঁধা একটা মাদুলী মাটিতে পড়ে গেল। সুতোটা আলগা হয়ে গেল, মাদুলীটা গড়িয়ে চাকরটার পায়ের কাছে থামল। চাকরটার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়—“দেন কত্তা দুটো পায়ের ধুলো দেন—বাঁচালেন আমাদের—।” উপর থেকে তার বাবুও দুড়্দাড়্ করে পুরোনো শ্বেতপাথর-বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন।—“পেইছিস! আর আমাদের ঠেকায় কে? বড় উপকার করলেন ব্রাদার, আসুন একটু কোলাকুলি করি—” বলে দুই হাত বাড়িয়ে মেজো মামাকে জড়িয়ে ধরেন আর কি, এমন সময়, “ও মেজো মামা, ও নেপেনবাবু, কোথায় গেলেন, আর জল দরকার নেই, শিকারীরা ঘোড়াগাড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।” বলে দলে দলে সব এসে উপস্থিত। মেজো মামা চমকে দেখেন চাকরটা, তার বাবু আর মাদুলী কিছুই কোথাও নেই। খালি পায়ের কাছে লাল সুতোটা পড়ে রয়েছে।

আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে বললেন, “চ, খিদেও পেয়েছে ভীষণ!”

পথে যেতে শিকারীরা বলল, “সাহস তো আপনাদের কম নয়, ওটা ভূতের বাড়ি তা জানতেন না? বহুকাল আগে এক জমিদার ছিলেন, রেস খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছিলেন—তাঁর বাড়ি। কেউ ওখানে যায় না।”

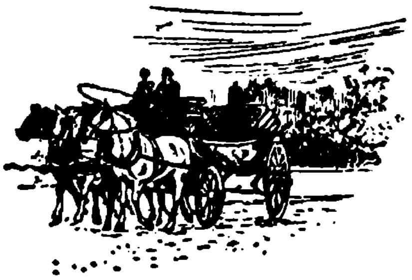

যুগান্তর

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের হাফইয়ার্লির ফল বেরুবার ঠিক পরেই। পরীক্ষার আগে দু-তিন দিন ধরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এত পড়লুম, অথচ ফল বেরুলে দেখলাম ইংরেজিতে ২২, বাঙলায় ২৯, আর অঙ্কের কথা নাই বললাম। তাই দেখে শুধু বাড়ির লোকেদের কেন, আমার নিজের সুদ্ধু চক্ষুস্থির। শেষপর্যন্ত বাড়িতে একরকম টেকা দায় হল।

আমার বন্ধু গুপীরও সেই একই অবস্থা। ওর বাবা আরেক কাঠি বাড়া। ক্লাবের নাম কাটিয়ে-টাটিয়ে, মাউথ-অর্গ্যান কেড়ে নিয়ে একাকার করলেন! সন্ধ্যেবেলায় গুপী এসে বলল, "জানিস, মানোয়ারি জেটি থেকে একটা মালবোঝাই জাহাজ আন্দামান যাচ্ছে আজ!" আমার হাত থেকে পেনসিলটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ধুক করে জ্বলে উঠল। বললাম, "কে বলেছে?" গুপী বলল, "মামাদের আপিস থেকে মাল বোঝাই-এর পারমিট করিয়েছে। আজ রাত দুটোয় জোয়ারের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে পড়বে।"

বললাম, "ডায়মন্ডহারবারের কাছেই ওপার দেখা যায় না। আরেকটু এগুলে না জানি কেমন!" গুপী বলল, "যাবি? না কি জীবনটা রোজ বিকেলে অঙ্ক কষে কাটাবি?" পেনসিলটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, "পয়সাকড়ি নেই, তারা নেবে কেন?" গুপী বলল, "পয়সা কেন দেব? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক সময়ে চড়ে বসে থাকব, মেলা জেলে ডিঙি রয়েছে, তার কোনো অসুবিধা হবে না। তার পর লাইফবোটের ক্যাম্বিশের ঢাকনির তলায় লুকিয়ে থাকতে হয়। তার পর জাহাজ একবার সমুদ্রে গিয়ে পড়লেই হল, ওরও ফেরবার নিয়ম নেই, আমাদেরও নামাবার উপায় থাকবে না! যাবি তো চল্। আজ রাত বারোটায় এসপ্ল্যানেডে তোর জন্য অপেক্ষা করব।"

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম আন্দামানের ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া পাখি উড়ে যাচ্ছে, আর মাথার উপর ঘোর নীল আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, দূরে সুন্দরী গাছের বন থেকে সারি সারি কালো হাতি বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। বললাম, "বেশ তাই হবে!"

তার পর যে কত বুদ্ধি করে রাত বারোটায় সেখানে গিয়ে গুপীর সঙ্গে জুটলাম সে আর কি বলব! সঙ্গে একটা শার্ট, প্যান্ট, তোয়ালে আর টর্চ ছাড়া আর কিছু নেই। রাতে খাবার সময় ঐ পুরোনো কথা নিয়ে আবার একচোট হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আর গুপীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সে কোনো দিনই বাড়িতে থাকতে চায় না।

গঙ্গার দিকেই যাচ্ছিলাম। অনেকটা এগিয়েছি, লাটসাহেবের বাড়ির গেটটা পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়েছি, এমন সময় দেখি ক্যালকাটা গ্রাউন্ডের পাশে, ইডেন গার্ডেনের সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ি আসছে। আমরা তো অবাক। জন্মে কখনো চার ঘোড়ার গাড়ি দেখিনি। কলকাতা শহরে আবার চার ঘোড়ার গাড়ি যে আছে তাই

জানতাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলাম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম চারটে কালো কুচ্‌কুচে দৈত্যের মতো বিরাট ঘোড়া। তাদের সাজগুলো তারার আলোয় জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, ঘাড়গুলো ধনুকের মতো বাঁকা, মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, নাক দিয়ে ফড়র্‌ ফড়র্‌ আওয়াজ করছে, ঝন্‌ঝন্‌ করে চেন বকলস্‌ বেজে উঠছে, অত দূর থেকেও সে আওয়াজ আমার কানে আসছে। ঘোলোটা ক্ষুর থেকে মাঝে মাঝে স্পার্ক দিচ্ছে। সে না দেখলে ভাবা যায় না।

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতে ঘুরে এসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে। ঐখানে সারাদিন মিস্ত্রীরা কাজ করেছে, পথে দু-একটা ইঁট-পাটকেল পড়ে থাকবে হয়তো। তাতেই হোঁচট খেয়ে সামনে দিককার একটা ঘোড়ার পা থেকে নালটা খুলে গিয়ে শাঁই শাঁই করে অন্ধকারের মধ্যে একটা ভাঙা চক্র এঁকে, কতকগুলি ঝোপঝাপের মধ্যে গিয়ে পড়ল। খানিকটা ক্ষুরের খটাখট্‌, চেনের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করে, আরো হাত-বারো এগিয়ে এসে, বিশাল গাড়িটা থেমে গেল।

ততক্ষণে আমরা দুজনে একেবারে কাছে এসে পড়েছি। দেখি গাড়ির পিছন থেকে চারজন সবুজ পোশাক-পরা, কোমরে সোনালী বেল্ট-আঁটা সইস্‌ নেমে পড়ে, ছুটে গিয়ে চারটে ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে ধরেছে। সামনের দিকের ডান-হাতের ঘোড়াটার চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে! আকাশের দিকে মাথা তুলে সে একবার ভীষণ জোরে চিঁ-হি-হি-হি-হি করে ডেকে উঠল। সেই শব্দটা চারদিকে গম্‌গম্‌ করতে লাগল। গাড়ির মধ্যে থেকে একজন লম্বাচওড়া লোক নেমে পড়ল।

বোধ হয় ওরা কোনো থিয়েটার পার্টির লোক, কোনো বিদেশী জাহাজে অভিনয় করে ফিরছিল। কারণ লোকটার দেখলাম রাজার মতো পোশাক-পরা, কিংখাবের মখমলের জোব্বা পাজামা, গলায় মুক্তোর মালা, কানে হীরে। আর সে কি ফরসা সুন্দর দেখতে। মাথায় মনে হল সাত ফুট লম্বা। রাজা সাজবারই মতো চেহারা বটে! ততক্ষণে সবাই মিলে অন্ধকারের মধ্যেই নালটাকে খুঁজছে। আমাদের দিকে কারো লক্ষ্য নেই। আমি টপ্‌ করে থলি থেকে টর্চটা বের করে টিপতেই দেখি ঐ তো ঝোপের গোড়ায় নালটা পড়ে আছে। রুপোর মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। গুপী ছুটে গিয়ে সেটি হাতে করে তুলে নিল, তখনো একেবারে গরম হয়ে আছে।

নাল হাতে ওদের কাছে গেলাম। এতক্ষণে আমাদের দিকে ওদের চোখ পড়ল। "কোথায় পেলি বাপ্‌?" "এখানে ঝোপের গোড়ায়", গুপী ঝোপটা দেখিয়ে দিল। "বাঃ, বেড়ে আলোখানি তো বাপ। ওরাই দিয়েছে বোধ হয়। তা হলে আরেকটু দয়া করে, ঐদিকে কোথায় কামারের দোকান আছে বলে দে দিকিনি, ওটি না লাগালে তো আর যাওয়া সাবে না।"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুপীর দিকে তাকালাম। কামার কোথায় পাব? গুপী বললে, "চলুন, আগে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান আছে, তাদের আমি চিনি, তারা করে দিতে পারব মনে হচ্ছে।"

"তা হলে ওঠ্‌, বাপ্‌, ওঠ্‌! আর সময় নেই।"

দুজনে গাড়ির মধ্যে ভদ্রলোকটির পাশে উঠে বসলাম। মখমলের সব গদি! থিয়েটারের লোকেরা আছে বেশ! আর ভুর্‌ভুর্‌ করছে আতরের তামাকের গন্ধ। ভদ্রলোকের সংগে মেলা দলিলপত্রও রয়েছে দেখলাম!

গুপী বাতলিয়ে দিল, বাঁয়ে ঘুরে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে পথ, আস্তে আস্তে চললাম! ঘোড়ার পায়ে ব্যথা লাগে। ছোট্ট গলির মধ্যে দোকান। অত বড় চার ঘোড়ার গাড়ি তার মধ্যে ঢুকবে না। ঢুকলেও আর ঘুরবার উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক স্বেবলই

তাড়া দিতে লাগলেন, দেরি করলে নাকি নন্দকুমার নামের একটা মানুষের প্রাণ যাবে। তখন গুপী নাল হাতে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বলল, "এইখানেই দাঁড়ান, আমি গিয়ে যন্ত্রপাতি সুদ্ধু শম্ভুকে ডেকে আনি। তুই আয় আমার সঙ্গে।" অগত্যা দুজনেই নামলাম। শম্ভুকে ঠেঙিয়ে তুলতে একটু দেরি হল। তারপর প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। "চার ঘোড়ার গাড়ি আবার কি ? এ তল্লাটে কোথাও চার-ঘোড়ার গাড়ি হয় না। একটা চার-ঠ্যাংওয়ালা ঘোড়াই দেখতে পাওয়া যায় না, তা আবার চারটে ঘোড়া এক-গাড়িতে।" শেষটা ঘোড়ার নালটা দেখে একেবারে থ ! "এই এত বড় নাল হয় কখনো ঘোড়ার ? হাতি নয় তো ? হাতির পায়ে আমি নাল লাগাতে পারব না গুপী দাদা, এই বলে দিলাম।"

আমরা বুঝিয়ে বললাম, "চলো না গিয়ে নিজের চোখেই দেখবে। এত প্রকাণ্ড ঘোড়াই দেখলে কোথায় যে এত বড় নাল দেখবে ? চলো, তোমার লোহা-টোহা নিয়ে চলো ওঁদের খুব তাড়াতাড়ি আছে, দেরী করলে কার যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। মেলা কাগজপত্র নিয়ে চলেছেন। চলো। নাও, ধরো, নালটাও তোমার যন্ত্রের বাক্সে রাখ। ভারী আছে।"

শম্ভু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। "বড় ঘোড়া হয় না তা বলছি না। ফতেপুরসিক্রি গিয়ে আকবরের ঘোড়ার যে বিরাট নাল দেখে এসেছি, তার পরে আর কি বলি ?"

কথা বলতে-বলতে গলির মুখে এসে পড়েছি। কিন্তু কোথায় চার-ঘোড়ার গাড়ি ? চারি দিক চুপচাপ থম্‌থম্‌ করছে, পথে ভালো আলো নেই, একটা মানুষ নেই, কুকুর নেই, বেড়াল নেই, কিছুই নেই। ডাইনে-বাঁয়ে দু দিকে যত দূর চোখ যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

রাস্তার আলোর কাছে গিয়ে কি মনে করে শম্ভু যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলে নালটা বের করতে গিয়ে দেখে বাক্সের মধ্যে নালও নেই। তখন শম্ভু ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে চেয়ে বলল, "ও গাড়ি আরো অনেকে দেখেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। ঐ রাজা বাহাদুর মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু সময়কাল পেঁছিতে পারে নি। তোমরা তাই দেখেছ! বলে আমাদের একরকম টানতে টানতে ওর বাড়ি নিয়ে গেল। পরদিন সকালে যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম। গুপী আর জাহাজের কথা তুলল না।

ফ্যান্টাস্টিক

আমার ছোটমামা প্রায় আমার সমবয়সী। বেজায় বাস্তববাদী, কল্পনা-টল্পনার বালাই নেই, অলৌকিকে বিশ্বাস নেই। ভীষণ খেতেটেতে ভালোবাসে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের সঙ্গে গলাগলি ভাব। এমনকি সম্পূর্ণ অচেনা লোকেরাও যে কেন ওকে এত পছন্দ করে, কেউ ভেবে পায় না। মোটা, বেঁটে, মাথায় দু-পাশে টাক, মধ্যিখানের চুল আধ-পাকা, অসমান দাঁতগুলো পান খেয়ে খেয়ে লালচে, ছোট ছোট চোখ সব সময় আনন্দে মিট মিট করছে। কিসের এত আনন্দ তাও বোঝা যায় না ছাই। বৌ বেজায় খিটখিটে, একটা ছেলে

দিল্লীতে চাকরি করে, পুজোর সময় একটা করে চিঠি লেখে। একটা মেয়ে, বেজায় ফ্যাশানেবল, ছোট খামার বাড়িতে খাবার টেবিলে লাল লিনো পাতা দেখে নাক সিঁটকায় আর বলে "পুজোর সময় যেন আবার আমার জন্যে তুমি কাপড় পছন্দ করতে যেও না বাবা, শেষটা কাকে দান করব ভেবে পাব না।" তার ওপর মামার কুকুর পোষার শখ, সে মামী কিছুতেই দেবে না। কুকুরের লোম খেলে নাকি ক্যান্সার হয় আর কুকুরে চাটলে কিডনিতে পোকা হয়। ছোট মামা তাই অন্য লোকের বাড়ির কুকুরের গায়ে হাত বোলায় আর নেড়িকুত্তারা যখন ওর পা চাটে, আহ্লাদে ওর দু-চোখ বুজে যায়।

একটা নাতি একটা নাতনি। কিন্তু দিল্লী থেকে বৌমা কখনো চিঠি লিখে যেতে বলে না। ওদের নাকি দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে। নাতিনাতনীর জন্য একবার ছেলের হাতে কটকের কাঠের খেলনা পাঠিয়েছিল ছোটমামা, মামী যদিও বারণ করেছিল। পরের বার আপিসের কাজে আবার যখন ছেলে এল, খেলনা ফিরিয়ে আনল। বৌমা বলেছে ওসব রঙে নাকি বিষ থাকে, কক্ষনও কিনবে না। এইবার গরমের সময়ে দক্ষিণা-বাবুদের সঙ্গে দারজিলিং গেল ছোটমামা, খেলনাগুলো সঙ্গে নিয়ে। সেখানে একবার দেখে গেছিল সুতোর কাটিম নিয়ে রাস্তার নেপালী ছেলেরা খেলা করছে। তারা নালার জল খায়, রঙিন খেলনায় তাদের নিশ্চয় কোনো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া খেলনাগুলোকে আমি আচ্ছা করে ঘষে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিলাম, এতটুকুও রঙ ওঠেনি। বৌটা যেন কি!

দক্ষিণাবাবু ছোটমামার আপিসে কাজ করতেন ; এখন কেবলি নানা ছিঁকে রোগে ভোগেন। ছোটমামার পেয়ারের বন্ধু ; এক সময় প্রত্যেক শনি-রবিবার তাস খেলতেন ; এখন হয়ে ওঠে না। পেনসন নেবার পর ছোট্ট বাড়িতে উঠে গেছেন, সেখানে তাসখেলার জায়গা নেই। আর ছোটমামার বাড়িতে তো হতেই পারে না, কারণ দক্ষিণাবাবুর স্ত্রী পুঁটিবৌদি এই আজকের দিনেও পাতা কেটে চুল আঁচড়ান, হাতা-ওয়ালা আঁটো বডি গায়ে দেন, এক বর্ণ ইংরিজি জানেন না বলে মামী তাঁর উপর হাড়ে চটা! দক্ষিণাবাবুকেও দেখলেই রেগে যায়।

যদিও ছোটমামাকে আর দক্ষিণাবাবুকে আপিসের কাজে মাসে মাসে দারজিলিং যেতে হয়, পুঁটিবৌদির শিলিগুড়ি ছেড়ে নড়বার উপায় ছিল না। বুড়ো রুগ্ণ শ্বশুর, দজ্জাল শাশুড়ি, এক পাল বেয়াড়া দেওর ননদ ইত্যাদি, তার ওপর খিটখিটে এক গৃহ-দেবতা। অন্ততঃ শাশুড়ি বলতেন যে পান থেকে চুন খসলে তিনি নাকি অনর্থ করবেন। মোট কথা পঁচিশ বছর শিলিগুড়িতে কাটিয়েও তাঁর দারজিলিং দেখা হল না। খালি পরিষ্কার দিন থাকলে, বিকেলে পুজোর ফুল আনার নাম করে বড় রাস্তার ওপর পালদের বাড়ি গিয়ে, মাঝে মাঝে অনেক দূরে ছায়া-ছায়া মস্ত মস্ত হাতির মতো কি যেন দেখতে পেতেন আর ভাবতেন, "আহা, ঐ হল দারজিলিং, ওখান থেকে হিমালয় দেখা যায়।" অমনি দু হাত তুলে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার করতেন। হিমালয় হলেন দেবতা। তেমন করে কিছু চাইতে পারলে তাঁর দয়া হয়। মনে মনে বলতেন, "ঠাকুর, তোমার যদি অসুবিধা না হয় তো একবার দারজিলিং দেখিও।"

এখন বুড়ো হয়েছেন, শ্বশুর-শাশুড়ি স্বর্গে গেছেন, বেয়াড়া দেওর-ননদগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, শিলিগুড়ির বাড়ি কবে বিক্রি হয়ে গেছে। এমন সময় পুঁটি-বৌদির পিসতুতো ভাই দারজিলিং থেকে চিঠি লিখলেন, "কার্ট রোডের নিচে আমার 'সুরিয়া' হোটেল খুবই ভালো চলছে। দুঃখের বিষয় গিন্নিকে নিয়ে দু মাসের জন্য আমাকে দক্ষিণ-ভারতে তীর্থ করতে যেতে হচ্ছে। দক্ষিণাবাবুর তো রেলের রেস্তোরাঁর অভ্যাস আছে, এ দিকের হালচাল-ও জানা আছে। তোরা যদি দয়া করে ঐ দুটো মাস হোটেলটার

ভার নিস্‌ তাহলে বেঁচে যাই। খরচপত্র পাঁচশো টাকা পাঠালাম।”

দক্ষিণাবাবু ডাক্তারের কাছে গেছিলেন, কেমন একটা ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল রোজ। পুঁটিবৌদি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই উত্তর দিয়ে দিলেন যে অতি অবশ্যই তাঁরা ঐ তারিখে দারজিলিং-এ পৌঁছবেন। তাঁর অনেক দিনের শখ ঠাকুর পূর্ণ করলেন ইত্যাদি। তারপর পাশের বাড়ির বটকেষ্ট ঠাকুরপোকে দিয়ে ঠিকানা লিখিয়ে দক্ষিণাবাবু ফিরবার আগেই একেবারে পোষ্টাপিসে পাঠিয়ে ডাকে দিলেন যাতে অন্যথা না হয়। বটকেষ্ট ঠাকুরপো হল আমার ছোটমামা।

দক্ষিণাবাবু এসেই ক্যাম্বিসের ডেক-চেয়ারে বসে গোঁজ হয়ে রইলেন। জুতো পর্যন্ত ছাড়লেন না। পুঁটিবৌদি চটি এনে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললেন, “কি হল?”

দক্ষিণাবাবু কাষ্ঠ হেসে বললেন, “দারজিলিং, কার্সিয়াং যেতে বলছে।”

পুঁটিবৌদি বললেন, “সুরিয়া মানে কি?”

দক্ষিণাবাবু বিরক্ত হলেন, “সুরিয়া মানে সূর্য। তাই দিয়ে কি হবে?”

“ঐ তো ঠিকানা। সুরিয়া, ওয়াডেল্‌ রোড, দারজিলিং।” দক্ষিণাবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর অনেক ধৈর্য অবলম্বন করে বৌদির কাছ থেকে চিঠি আদায় করে, সেটা পড়ে বললেন, “নিঃসন্দেহে ভগবানের দয়া। কিন্তু এই শরীর নিয়ে হোটেলের ঝক্কি বইতে পারব কেন?”

“বটকেষ্ট ঠাকুরপো বইবে। তোমার মতো তার বাক্সেও গরম জামা আছে। কুমুদিনী-দিদি মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কাশ্মীর গেছেন। বটকেষ্ট ঠাকুরপো যাবেন বলেছেন।”

ব্যস্‌, দুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল। কলকাতার বাড়িতে আমার আরেক মামাতো ভাই আর বুড়ো বামুনঠাকুর রইল। ছোট মামা ওদের সঙ্গে রওনা হল। পুঁটিবৌদি পাঁজি দেখে দিন ঠিক করলেন। মুড়ি পরটা সন্দেশ সঙ্গে নিলেন, রওনাও হলেন, সেখানে নিরাপদে পৌঁছলেন-ও, কিন্তু তার পরই এক গেরো। ‘সুরিয়া’ হোটেলে খবর পাওয়া গেল মালিক আর তাঁর স্ত্রী গতকাল তীর্থে গেছেন। কে এক পাঞ্জাবী ছোকরা ছপরি পরে মালিকের কোয়ার্টার দখল করে আছে, তাকে নাকি মালিক দুমাস থাকতে বলে গেছেন। হোটেল দেখাশুনো অবিশ্যি দক্ষিণাবাবু করবেন।

বলা বাহুল্য ছোকরার সঙ্গে ঝগড়া করা বুদ্ধির কাজ হত না। দক্ষিণাবাবু এতই কাতর হলেন যে সুরিয়া হোটেলের আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফার্স্ট এড দিতে হল। হোটেলেই হয়তো চেষ্টা করে থাকার ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু পুঁটিবৌদি কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি রান্নাঘরের ছাদে মোরগ বসে থাকতে দেখেছিলেন।

এতক্ষণ পরে ছোটমামার হঠাৎ ডাঃ ভাগতের বাড়ির কথা মনে পড়ল। সেকালে বাইরে থেকে দেখা চমৎকার বাড়ি, চারদিক বাঁধানো চাতাল, পাহাড়ের গায়ে চেরি-গাছ, ব্ল্যাক-বেরি গাছ। কিন্তু বাড়িতে কেউ থাকত না। ডাঃ ভাগত কোন কালে স্বর্গে গেছেন। আহা! গরীব-দুঃখীদের, জন্তু-জানোয়ারদের মিনি-মাগনা চিকিৎসা করতেন। তাঁর বাড়ি থেকে সাহায্য চেয়ে কেউ খালি হাতে ফিরত না। কত অনাথ ছেলে, অনাথ কুকুর ও-বাড়িতে থাকত। অথচ লোকের এমনি কুসংস্কার যে বলবে, ও-বাড়িতে কিছু আছে, কেউ ওদিক মাড়াবে না। ছোটমামা একবার একটা আইরিশ সেটারের বাচ্চা দিয়েছিলেন ডাঃ ভাগতকে, গিন্নি তো আর পুষতে দিত না। বেশ খাড়াই রাস্তার ওপর বাড়ি, সেই রাস্তা দিয়ে কেউ সহজে যাবে না! এ-সব কথা ছোটমামা অনেক কাল আগেই শুনেছিলেন। দক্ষিণাবাবুও হয়তো শুনেছিলেন, তবে হয়তো মনে নেই। কুকুরটা অনেক দিন ছিল ও-বাড়িতে, সে-ও আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে। ডাঃ ভাগত নেই, আর কুকুর ১৪।১৫ বছর বাঁচলে তো ঢের।

আপিস ঘরের কৌচে দক্ষিণাবাবুকে শুতে বলে, পুঁটিবৌদিকে বসিয়ে ছোটমামা ঐ খাড়া রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে চড়তে লাগলো। অভ্যাস চলে গেছিল, বেজায় হাঁপ ধরছিল, একটু দূর যায় আর একবার করে পাথরের দেয়ালে বসে হাঁপায়। এমন সময় একটা চমৎকার আইরিশ-সেটার পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে ওর সঙ্গ নিল। ছোটমামা গলে গেল, তার মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে দেখল গলায় কলার বাঁধা। তাতে পেতলের হরফে লেখা রেড্! বাঃ, বেশ নাম। ছোটমামা অনেক সময় ভেবেছিল মামী কুকুর রাখতে দিলে এই রকম কুকুর রাখবে, তার নাম দেবে রেড্। আর সত্যি সত্যি রেড্ এসে হাজির! "রেড্, রেড্," বলে ডাকতেই কুকুরটা ছোটমামার হাত-মুখ চেটে একাকার করে দিল। মামী দেখলে ফিট্ হত নিশ্চয়।

দম ফিরে এলে ছোটমামা উঠে আবার পথ ধরল। রেড্ সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ছোটমামা যায় আর চেনা পথের সঙ্গে নতুন করে চেনা হয়। ঐ সেই চেরি-গাছ, পথ থেকে হাত বাড়িয়ে ওর ফল পাড়া যায়। ঐ বাঁকের কাছে হঠাৎ দুটো সিঁড়ির ধাপ, অন্যমনস্ক হলে হোঁচট খাবার ভয়। তার পরেই ডাঃ ভাগতের লাল লোহার ফটক। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রেড্ ল্যাজ নাড়তে লাগল। ছোটমামা মুচকি হাসলে। বলে জন্তু-জানোয়ারের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, যার সাহায্যে মানুষ কিছু বুঝবার আগেই তারা অলৌকিক ব্যাপার টের পায়। রেড্ কিন্তু ছোটমামার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। লাল জিবটা একটু খুলে রইল, মনে হল মিটিমিটি হাসছে।

চমৎকার যত্নে রাখা বাড়ি। এই নাকি হানাবাড়ির চেহারা! সামনের সবুজ দরজা বন্ধ। পেতলের হাতল, চিঠি ফেলবার চাকতি, ঝক ঝক করছে। দুপাশে জেরেনিয়ম ফুলের সারি, সযত্নে সাজানো ফুলের টব। রেড্ বাড়ির পাশ ঘুরে পিছন দিকে চলল। ছোট-মামাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে মাথা ঘুরিয়ে ল্যাজ নেড়ে আশ্বাস দিতে লাগল।

রান্নাবাড়িটা একটু আলাদা। বড় বাড়ির পিছনের কাচের দরজা থেকে টালির ছাদ দেওয়া লম্বা একটা পথ দিয়ে যেতে হয়। সেখান থেকে সাদা কাপড়পরা ফিটফাট্ এক বুড়ো বেয়ারা বেরিয়ে এসে, সেলাম করল। তার কাছে সমস্যার কথা তুলতেই সে হেসে বলল, "কোনো অসুবিধা নেই, বাবুসাহেব, মাজির রান্নার জন্য সাহেবের বামুন-ঠাকুর আছে!" ঝপ করে মনে পড়ল সবাই বলত ডাঃ ভাগত নিরামিষ খান, সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন। এর সায়েব বোধ হয় তাঁর ভাইপো-টাইপো হবে। তিনি তো ব্যাচেলার ছিলেন।

বামুন-ঠাকুরও বেরিয়ে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব ব্যবস্থা হল। বাড় বাড়ি খুলে কাজ নেই। রান্নাঘরের পাশে ছোট একটি অতিথিশালা, ডাক্তারের দুই একজন রুগী থাকত। দুটি ঘর, দুটি স্নানের ঘর, সারাদিন রোদে ভরে থাকে, যেদিকে তাকানো যায় হিমালয় পাহাড়। বাইরে প্যান্জি ফুল।

সেই বাড়িতে ছোটমামা দক্ষিণাবাবুদের তুলল এবং পরম আরামে ওরা সাত সপ্তাহ কাটাল।

দক্ষিণাবাবু আর বৌদি সারাদিন রোদ পোয়াতেন, বাগানে বেড়াতেন, হিমালয় দেখতেন। ছোটমামা সুরিয়া হোটেলের কাজ দেখত। ঐ পাঞ্জাবী ছোকরা ওখানকার ম্যানেজার, তার নিজের কোয়ার্টার ছিল। মালিকের বাড়িতে বোধ হয় কোনো বন্ধু-বান্ধবকে তুলেছিল। ছোটমামা কোথায় উঠল, সে বিষয়ে কেউ কৌতূহল দেখাল না। ভালোই হল। ও-বিষয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছাও ছোটমামার ছিল না। দুপুরে সে হোটেলে খেত ; এক সময় হাটবাজার করে রাখত। রাতে বাড়ি যাবার সময় সওদা নিয়ে যেত। রেড্ ঐ সল্ট হিল্ রোডের তলায় ওর জন্য রোজ অপেক্ষা করত। বাড়ি পৌঁছে ছোটমামা দেখত আগের দিন কেনা মাছ তরকারি বামুনঠাকুর রেঁধে রেখেছে,

আর সে কি রান্না!

হু-হু করে সাত সপ্তাহ কেটে গেল, হোটেলে পুঁটিবৌদির নামে চিঠি এল, ওর পিসতুতো দাদা বৌদি এক সপ্তাহ আগেই ফিরে আসছেন। সে খবর পাবামাত্র পাঞ্জাবী ছোকরা মালিকের বাড়ি খালি করে দিয়ে আমতা-আমতা করে এদের এসে বাড়ি দখল করতে বলল। ততদিনে দক্ষিণাবাবুর শরীরে তাগদ হয়েছে। শেষের দু সপ্তাহ তিনিই কাজের ভার নিয়েছিলেন। এতে তাঁর খুব সুবিধা হল।

ছোটমামা তাঁদের গুছিয়ে বসিয়ে নিজের সুটকেসটি ষ্টেশনে জমা করে দিয়ে, শেষ একবারের মতো সল্ট হিল্ রোড বেয়ে ওপরে উঠে ডাঃ ভাগতের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল। কোথায় ডাঃ ভাগতের বাড়ি? বড় বাড়ির ভিতরে কিছু চিহ্ন ছিল বটে, তার ওপর গোছা গোছা হলদে প্রিমরোজ ফুটে ছিল। রান্নাবাড়ির আর ছোট বাড়ির জায়গাটা কবেকার কোন ধ্বসের সঙ্গে নিচে নেমে গেছিল। সেখানে শুধু একটা সাদা গোলাপলতা বাতাসে দুলছিল।

ছোটমামার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সে তাড়াতাড়ি ফিরে বড় বড় পা ফেলে নামতে শুরু করল। অমনি চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল। তারই মধ্যে ছোটমামা টের পেল হাতের নিচে রেশমের মতো নরম একটা মাথা। মনটা অমনি শান্ত হয়ে গেল। জীবনের ব্যর্থতাগুলোকে মনে হল কিছু না। সল্ট হিল্ রোডের নিচে পৌঁছে, রেড ওর হাত চেটে দিয়ে চলে গেল।

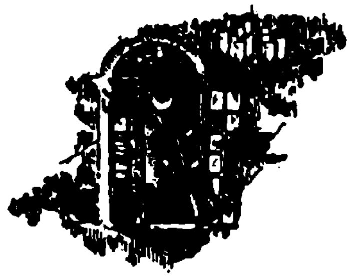

পাশের বাড়ি

ইচ্ছে না হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া অবিশ্বাস করতে পার, স্বচ্ছন্দে বলতে পার আমি একটা মিথ্যাবাদী ঠগ্ জোচ্চোর। তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না, যা যা ঘটেছিল সে আমি একশো বার বলব। আসলে আমি নিজেও ভূতে বিশ্বাস করি না।

বুঝলে, মার মেজো মাসিরা হলেন গিয়ে বড়লোক; বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি, তার চার দিকে গাছপালা, সবুজ ঘাসের লন, পাতাবাহারের সারি। মস্ত-মস্ত শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, তার সাজসজ্জা দেখে তাক লেগে যায়। তা ছাড়া মেজো মাসিদের ক্যায়সা চাল, হেঁটে কখনো বাড়ির বার হন না, জলটা গড়িয়ে খান না। কিন্তু কি ভালো সব টেনিস খেলেন, পিয়ানো বাজান। আর কি ভালো খাওয়া-দাওয়া ওঁদের বাড়িতে। আসলে সেই লোভেই আজ গিয়েছিলাম, নইলে ওঁদের বাড়িতে এই খাকি হাফপ্যান্ট পড়ে আমি! রামঃ!

যাই হোক. ওঁদের পাশের বাড়িটার দারুণ দুর্নাম। কেউ সেখানে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাস করে নি. বাগান-টাগান আগাছায় ঢাকা, দেয়ালে অশ্বত্থগাছ, আস্তাবলে বাদুড়ের আস্তানা। দিনের বেলাতেই সব ঘুপ্সি অন্ধকার, স্যাঁৎসেতে গন্ধ, আর তার উপর সন্ধেবেলায় নাকি দোতলার ভাঙা জানলার ধারে একজন টাকওয়ালা ভীষণ মোটা ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখা যায়। তার চেহারা নাকি অবিকল এখনকার মালিকদের ঠাকুরদাদার মতো দেখতে। অথচ সে বুড়ো তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মরে-ঝরে সাবাড়! আর মালিকরা থাকে দিল্লীতে।

নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ভয়ের চোটে কেউ আর ও-বাড়িমুখো হয় না। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। আমি ভূতে-টুতে বিশ্বাস করি না। রাতে একা অন্ধকারে ছাদে বেড়িয়ে আসি। সত্যি কথা বলতে কি ঐ এক বেড়াল ছাড়া আমি কিছুতে ভয় পাই না। শুধু বেড়াল দেখলেই কিরকম গা-শির্-শির্ করে।

যাই হোক, বিকেলে সবাই মিলে ওঁদের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিলে বসে মাংসের সিঙাড়া, মুরগির স্যান্ডউইচ্, ক্ষীরের পান্তুয়া, গোলাপি কেক আরো কত কি যে সাঁটালাম তার হিসেব নেই। কিন্তু তার পরেই হল মুশকিল। কোথায় এবার গুটি-গুটি বাড়ি যাব, তা নয়। গান, বাজনা, নাচ, কবিতা বলা শুরু হল। হাঁপিয়ে উঠি আর কি! শেষটায় কি না আমাকে নিয়ে টানাটানি। আমিও কিছুতেই রাজী হব না! মার মেসোমশাই আবার ঠাট্টা করে বললেন, "ওঃ গান-বাজনা হল গিয়ে মেয়েদের কাজ, আর উনি ভারি লায়েক হয়েছেন। আচ্ছা দেখি তো তুই কেমন পুরুষ বাচ্চা; যা তো দেখি একলা একলা ঐ ভূতের বাড়িতে, তবেই বুঝব কত সাহস!" আর সবাই তাই শুনে হ্যা হ্যা করে হেসেই কুটোপাটি!

শুনলে কথা! রাগে আমার গা জ্বলে গেল, উঠে বললাম, "কি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? ভূত-ফুত আমি বিশ্বাস করি না। এই দেখ গেলাম।" বলেই বাগান পার হয়ে টেনে দৌড় মারলাম। এক মিনিটে পাঁচিল টপ্‌কে ওবাড়ি!

হাঁটু ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই মনে হল ভূত না মানলেও, কাজটা ভালো হয় নি। কিরকম যেন থম্‌থমে চুপচাপ। দুষ্টু লোকদের পক্ষেও ঐখানে লুকিয়ে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।

যাই হোক টিটকিরি আমার কোনো কালেই সহ্য হয় না, কাজেই না এসে উপায়ও ছিল না। গুটি গুটি এগুলাম। তখনো একেবারে অন্ধকার হয় নি, একটু একটু আলো রয়েছে। দেখলাম দরজা জানলা ভেঙে ঝুলে রয়েছে, শ্বেতপাথরের সাদা-কালো মেঝে ফুঁড়ে বটগাছ গজিয়েছে, চার দিকে সাংঘাতিক মাকড়সার জাল। তার উপর আবার কিরকম একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, ভাঙা দরজা জানলা খট্‌খট্ করছে, মাকড়সার জাল দুলছে, দোতলা থেকে কি অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে মানুষ হাঁটার মতো, বাক্সপ্যাঁটরা টানাটানি করার মতো। অথচ মস্ত কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে নীচে পড়ে আছে, এদিক দিয়ে উপরে উঠবার জো নেই। চাকরদের ঘোরানো সিঁড়িও ভাঙা।

মিথ্যা বলব না, বুকটা একটু ঢিপ্‌ঢিপ্ করছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বাইরে এলাম। এমন সময় দেখি চাকরদের সিঁড়িটার পাশেই একটা গাছ-ছাঁটা কাঁচি হাতে একজন উড়ে মালি। উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তা হলে বাড়িটা একদম খালি নয়, জানলায় হয়তো ওকেই দেখা যায়, আঁক্‌ড়ে মাক্‌ড়ে হয়তো দোতলায় ওঠে।

মালি কাছে এসে হেসে বলল, "কি খোকাবাবু ভয় পেলে নাকি? আমার নাম অধিকারী, হেথায় কাজ করি।" আমি বললাম, "দূর, ভয় পাব কেন? কিসের ভয় পাব?" সে বলল, "না, ভয়ের চোটে কেউ আজকাল এই পাশে আসেই না, তাই বললাম।" আমি হেসে বললাম—"যাঃ, আমি ভূত-টুত বিশ্বাস করি না।" অধিকারী লোকটা ভারি ভালো, আমাকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। দুঃখ করতে লাগল কর্তারা আসে না, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ঝাড়লণ্ঠনগুলো ভেঙে পড়ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের আসবাবে সব পোকা ধরেছে, রোদে জলে মস্ত-মস্ত ছবিগুলোর রঙ চটে যাচ্ছে। বাস্তবিক কিছুই আর বাকি নেই দেখলাম। একা একজন মালি আর কত করতে পারে!

বাগানেও সব হিমালয় থেকে আনা ধুতরো ফুলগুলোতে আর ফুল হয় না, কুর্চিগাছ মরে গেছে, আমগাছে ঘুণ ধরেছে, বলতে বলতে অধিকারী কেঁদে ফেলে আর কি— "কেউ দেখতেও আসে না।"

শেষে উঠোনের কোণে ওর নিজের ঘরে নিয়ে গেল। পরিষ্কার তক্তকে দাওয়ায় বসিয়ে ডাব খাওয়াল, ভাবছিলাম লোকেরা যে কি ভীতুই হয়! কি দেখে যে ভূত দ্যাখে ভেবে হাসিও পাচ্ছিল। তারার আলোয় চার দিক ফুট্‌ফুট্ করছিল। আমার পাশে বসে অধিকারী বলল, "কেউ এ বাড়ি আসে না কেন বল দিকিনি? সেকালে কত জাঁকজমক ছিল। গাড়িতে গাড়িতে ভিড় হয়ে থাকত, গাড়োয়ানরা, সইস্‌রা এখানে বসে ডাব খেত, তামাক খেত, চার দিক গম্‌গম্ করত।" আমি তাকে বললাম, "ওরা বলে কি না এ বাড়িতে ভূত আছে তাই ভয়ের চোটে আসে না।" শুনে অধিকারী বেজায় চটে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভূত? এবাড়িতে আবার ভূত কোথায়? নিজের বাড়ির জানলায় বড়কর্তা নিজে দাঁড়ালেও লোকে ভূতের ভয় পাবে? বললেই হল ভূত! আমি তোমাকে বলছি খোকাবাবু, একশো বছর ধরে এবাড়ির কাজ করছি, একদিনের জন্যও দেশে যাই নি, কিন্তু কই একবারও তো চোখে ভূত দেখলাম না?" বলে একবার চার দিকে চেয়ে বলল, "যাই, আমার আবার চাঁদ উঠবার পর আর থাকবার জো নেই।" বলেই, সে তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, লোকটা আমার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। দেশলাই কাঠিতে ফুঁ দিলে আগুনটা যেমন মিলিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম করে। চার দিকে বাতাস বইতে লাগল, দরজা-জানলা দুলতে লাগল, পুব দিকে চাঁদ উঠতে লাগল, আর আমি উর্ধ্বশ্বাসে ভাঙা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই দেখ এখনো হাঁপাচ্ছি।

দামুকাকার বিপত্তি

অনেক দিন আগেকার কথা; আমাদের গাঁয়ের দামুকাকা সন্ধে করে হাট থেকে বাড়ি ফিরছে। সেদিন বিক্রি ভালোই হয়েছে, দড়ির ঝোলাটা চাঁচাপোঁছা, ট্যাঁকটিও দিব্যি ভারী। কিন্তু তাই বলে যে দামুকাকার মুখে হাসি ফুটেছিল সে কথা যেন কেউ মনে না করে। ওর মতো খিট্‌খিটে রুক্ষ বদমেজাজি লোক সারা গাঁটা খুঁজে উজাড় করে ফেললেও আরেকটা পাওয়া যেত না। দুনিয়া-সুদ্ধ সকলের খুঁত ধরে বেড়ানোর ফলে এখন এমনি দাঁড়িয়েছিল যে এক-আধটা বন্ধুবান্ধব থাকা দূরের কথা, বাড়ির লোকদের মধ্যেও বেশির ভাগের সঙ্গেই কথা বন্ধ, এমন-কি, ও ঘরে ঢুকলে ওদের বিরাটাকার ছাই রঙের হুলো বিড়ালটা পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ উঠে ঘর থেকে চলে যেত। দামুকাকা সবই দেখতে পেত কিন্তু বেড়ালটাকে মুখে কিছু বলত না। অন্যদের শুধু এইটুকু বলত, "তোদের ভালোর জন্যই তোদের বলি, তা তোদের যদি এতই মন্দ লাগে, যা খুশি কর গে যা, পরে যখন কষ্ট পাবি তখন আমাকে কিছু বলিস না।"

যাই হোক সূর্য অনেকক্ষণ হল ডুবে গেছে, চারি দিক থেকে দিব্যি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আকাশে চাঁদ নেই, শুধু তারার আলোতে সব ঝাপসা-ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। দামুকাকা হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে, এক ক্রোশ পথ, যত শিগ্‌গির পার হয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। ভূতপ্রেতে দামুকাকার বিশ্বাস নেই, কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে লোক-গুলো দিন দিন এমনি পাজি বদমায়েস হয়ে উঠেছে যে পয়সাকড়ি নিয়ে পথে বেরুনোই দায়। বরং বড় কুমড়োটা বিক্রি করবার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা না করলেই ছিল ভালো।

প্রায় অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে, মাথাটা কিরকম যেন একটু ঝিম্‌ঝিম্ করছে, আসবার আগে হাট থেকে একটা পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাতেই কাঁচা সুপুরি ছিল হয়তো। তবে বুদ্ধিশুদ্ধি যে সবই দিব্যি চাঙ্গা ছিল, এ কথা দামুকাকা বার বার বলত।

পথের পাশেই বিরাট বাঁশঝাড়, তারার আলোয় পথের উপর তার ছায়া পড়ে অনেক-খানি জায়গা জুড়ে ঘোর অন্ধকার করে রয়েছে। ঐখানটার কাছাকাছি আসতেই দামু-কাকার কেমন গা শির্‌শির্ করে উঠল। তবুও হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটি বাগিয়ে ধরে সে বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল।

ঠিক বাঁশঝাড়ের সামনা-সামনি আসতেই মনে হল সুড়ুৎ করে কালো একটা কি যেন পথের এধার থেকে ওধারে গিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দামু-কাকার কানে এল একটা খ্যাঁস্ খ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ শব্দ, তা সে বাদুড়ের না আর কিছুর আওয়াজ ঠিক বোঝা গেল না।

ততক্ষণে দামুকাকার বেশ বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ শুরু হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের সকলের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে সঙ্গী-সাথী নিয়ে দল বেঁধে পথ চলাই যেন ভালো বলে মনে হচ্ছিল।

বাঁশঝাড়ের অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে এমন সময় বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে কে যেন একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে লাঠিগাছটি হাত থেকে কেড়ে নিল। দামুকাকা দারুণ চম্‌কে উঠে ফিরে দাঁড়াতেই তিন চারটে কালো কালো ডিগ্‌ডিগে রোগা লোক ওকে ঘিরে ফেলে, কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দামুকাকা যে-সে ছেলে নয়। ওর বাবা ছিল সেকালের নামকরা হাজারি পালোয়ান, লাঠিখেলায় সে হাজার শত্রুকে ঘায়েল করেছিল। মেরে ফেলে নি অবিশ্যি, কারণ দামু-কাকারা ছিল দারুণ বৈষ্ণব, কিন্তু এইসা ঠেঙিয়েছিল যে তারা পালাবার পথ পায় নি। তাদের মধ্যে যে কটা পেছিয়ে পড়েছিল লম্বা-লম্বা করে একটার পর একটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছিল। কাজেই দামুকাকাও নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে সে এমনি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল যে বাঁশগাছগুলো মড়্-মড়্ করে, ঠিক ভেঙে না পড়লেও, তাদের গা থেকে গোছা-গোছা পাতা খসে পড়তে লাগল, ফালা ফালা ছাল ছাড়িয়ে আসতে লাগল।

অগত্যা লোকগুলোর মধ্যে একজন একটা কালো গিরগিরে হাত দিয়ে দামুকাকার মুখ চেপে ধরল। মুখ চেপে ধরতেই দামুকাকার নাকে এল কেমন একটা অনেকদিন বন্ধ ঘরের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গন্ধ। ও তক্ষুনি হাত-পা এলিয়ে, দুচোখ কপালে তুলে মুচ্ছো যাবার জোগাড়।

কিন্তু তারা মুচ্ছো যেতে দিলে তো! অমনি খন্‌খনে গলায় পাঁচসাত জন মিলে কানের কাছে "ও মোড়লের পোঁ, এঁখন ভিঁর্মি গেঁলে চঁলবে নাঁ! আমাদের সভায় আঁগে বিঁচার কঁরে দাও, তাঁর পরে যাঁ ইঁচ্ছে কঁর গে যাঁও। নইঁলে এঁরারা যেঁ খ্যাঁচাখেঁচি কঁরে প্রাঁণ অঁতিষ্ঠ কঁরে তুঁললেন।"

তাই শুনে দামুকাকা মুচ্ছো ছেড়ে, উঠে বসে চারি দিকে তাকিয়ে একেবারে থ! বাঁশঝাড়ের মাঝখানটা একদম ফাঁকা, সেখানে একটা ধুনি জ্বলছে, আর তারই চার ধারে একদল কুচ্‌কুচে কালো মেয়ে আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করছে, আর তাদের ঘিরে কাতারে কাতারে কালো কালো ছেলে ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করছে আর খুব কানমলা আর চিমটি খাচ্ছে। এক বেচারা মাথায় একটা হাঁসের পালক গুঁজে একটা ঢিপির উপর বসে ছিল। দামুকাকাকে টেনে সে পাশে বসাল। দামুকাকার ততক্ষণে অনেকখানি সাহস ফিরে এসেছে, জিজ্ঞাসা করল, "তা মশাই, তা হলে আমায় কি করতে হবে?"

"কিঁছু না, শুঁধু এঁই মেঁয়েগুঁলোর মঁধ্যে কেঁ যেঁ কাঁর চেঁয়ে ভাঁলো দেঁখতে সেঁটুকু বঁলে দিন, আঁমরা তো হিঁমশিম খেঁয়ে গেঁলাম। সঁব চেঁয়ে ভাঁলোর গঁলায় এঁই সোঁনার মাঁলা পঁরিয়ে দিন, আঁর কিছু কঁরতে হবে না।"

দুনিয়ার কোনো মেয়েকে দামুকাকা ভয় পায় না। সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলল, "এই সুন্দরীরা, তোরা এখন চ্যাঁচামেঁচি রাখ দিকিনি। এইখানে লাইন বেঁধে দাঁড়া, আমি ভালো করে দেখি কে সব চেয়ে ভালো দেখতে।"

অমনি মেয়েগুলো ঝগড়াঝাঁটি ভুলে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়ে যে যার চুল ঠিক করতে লেগে গেল, হাত-পা সোজা করতে লাগল।

তাদের রূপ দেখে দামুকাকার তো চক্ষু চড়কগাছ! প্রত্যেকটা সমান হতকুচ্ছিত, কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, গোল-গোল চোখ, আর গির্‌গিরে রোগা। সবাই হাসি-হাসি মুখ করে দামুকাকার দিকে চেয়ে আছে। দামুকাকা একবার তাদের ধারালো দাঁত আর লম্বা-লম্বা নখের দিকে তাকিয়ে দেখল। আর অমনি সব ছেলেগুলো করল কি, গতিক বুঝে তফাতে সরে দাঁড়াল, ভাবখানা, একজনকে মালা দিলেই তো হয়েছে!

কিন্তু দামুকাকা যে-সে ছেলেই নয় সে তো বলেছি, এগিয়ে এসে মেয়েগুলোর দিকে ভালো করে নজর করে আরেকবার দেখে নিয়ে বলল—

"সমবেত ভদ্রমহোদয়াগণ, আমি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করছি যে আপনারা সকলেই সব চেয়ে সুন্দরী, একজনও অন্যাদের চেয়ে একটুও কম সুন্দরী নন ; অতএব সকলেই এই সোনার মালা পাবার যোগ্যা!" বলেই পট্‌ করে মালার সুতো ছিঁড়ে ফেলে, প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা করে সোনার পুঁতি দিয়ে, বাকিগুলো নিজের ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে ফেলল। মেয়েরা সবাই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে, আর ছেলেরা সমস্ত গোলমাল এমন নির্বিঘ্নে কেটে যাওয়াতে এমনি খুশি হল যে কেউ আর কিছু লক্ষই করল না।

তখন দামুকাকাও গুটি গুটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে সদর রাস্তা ধরে "রাম! রাম!" বলতে বলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাঁয়ের দিকে ছুটল।

বাড়িতে ততক্ষণে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, তার মধ্যে দামুকাকা এসে হাজির হওয়াতে সবাই মহা খুশি। গাঁয়ের লোকও মেলা এসে জড় হয়েছিল ; দামুকাকা তাদের হাত ধরে বসিয়ে, মুদির কাছ থেকে চিঁড়ে বাতাসা নিয়ে এসে পেট ভরে খাইয়ে দিল। সবাই অবাকও হল যেরকম, খুশিও হল তেমনি।

এর পরে আর দামুকাকা কখনোও রাগ-মাগ করত না। হাট থেকে সবাই দল বেঁধে ফিরত।

এই গল্প শেষ করে দামুকাকা বলল, "ঐ কালো লোকগুলোর কথা আর কাউকে বলি নি বুঝলি। কি জানি গাঁয়ের লোকেরা যা ভীতু, হয়তো ভূত মনে করে ভয়-টয় পাবে, ও-পথে আর যাওয়া আসাই করবে না, তা হলে আবার হাট-ফেরত আরো আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে। তা ছাড়া সত্যি তো আর ভূত-ফুত হয় না।"

আমরা বলতাম, "ও দামুকাকা, ওরা ভূত নয় তো কি?" দামুকাকা বিরক্ত হয়ে বলত,

"তা আর আমি কি জানি! তবে তোদের ইস্কুলে ওদের চাইতেও অনেক খারাপ দেখতে মেয়ে পড়ে, এ আমার নিজের চোখে দেখা।"

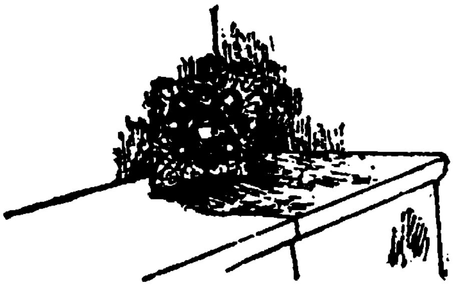

চোর

আপনারা হয়তো চোরকে ঘৃণা করেন? তা করুন, তবু এ-সব কথা প্রকাশ না করে পারছি না। চোর বলতে যদি ভাবেন আমাদের একটা আস্তানা আছে, সেখান থেকে রোজ রাতে গায়ে তেল মেখে, সিঁদকাঠি বগলে আমি চুরি করতে বেরোই, তাহলে ভুল ভেবেছেন। ও-রকম করলেই হয়েছিল! সঙ্গে সঙ্গে হাজত। আমাকে দেখে কেউ চিনতে পারত না। ভিড়ের সঙ্গে মিশে থাকবার মতো দেখতে আমি, কেউ আমার একটা বর্ণনা পর্যন্ত দিতে পারত না। আমি ট্রামে, বাসে, যাদুঘরের সামনে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতাম। নিজের ঘরবাড়ি চাকরিবাকরি না থাকলেও, আমার কোনো অভাব ছিল না। আমার মানি-ব্যাগ থাকত লোকের পকেটে পকেটে। সে-সব দিন বদলে গেছে। সুখ কারো পায়ের সঙ্গে বেড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে না। তাই আমাকে প্রায় তিন মাস ধরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পকেটটা মনে হচ্ছিল একশো মণ ভারি। অথচ সে জিনিসটা খুব ছোট, চেষ্টা করলে ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। কানেই পরেছিল সেই মোটা গিন্নি হীরের ইয়ারিং। ঐ তো চেহারা, তার আবার শখ দেখুন। স্ক্রুপ ঢিলে হয়ে গেছিল। যাদুঘরের সিঁড়ির মধ্যিখানে হাতে নিয়ে দেখছিল। দেখলেন তো বুদ্ধির বহর? ও জিনিসের মালিক হবার ওর যোগ্যতা কই?

সিঁড়ির ওপরের বাঁক থেকে ছিনিয়ে নিলাম। নিয়েই দৌড়। যাদুঘরটা চোরদের সুবিধার জন্যই তৈরি। পাঁচ মিনিটে দোতলা তিনতলা করে প্রায় নিখোঁজ হয়ে গেছি, এমন সময় দালান দিয়ে কয়েকটা লোক দৌড়ে এল আর আমি কেমন করে হাত ফস্কে যে নিচে গিয়ে পড়লাম নিজেই বুঝতে পারলাম না। পড়েই উঠে পালিয়েছিলাম, ধরতে পারেনি। পায়ে চোট লাগেনি, হাতে লেগেছিল। কাঁধের ধারে। আর সে কি যন্ত্রণা, এমন ব্যথা যেন আমার কোনো শত্রুরো না হয়। আছে অনেক শত্রু আমার। ঐ গিন্নীর স্বামী বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, কানের ফুলের জোড়াটি উদ্ধার করে দিলে দু' হাজার টাকা বকশিশ। নাকি আলাদা করে একেকটা হীরের যত দাম, দুটোকে একসঙ্গে করলে তার দুগুণ না হয় পাঁচগুণ। আমাদের জগতে বিশ টাকা দিয়ে খুনে ভাড়া করা যায়, দু হাজার টাকা লিখতে ক'টা শূন্য দিতে হয় তাই জানে না বেশির ভাগ লোক। পারলে আমার বন্ধুরাই আমাকে ধরিয়ে দিত। সেই ইস্তক পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, চোরের বর্ণনা দেওয়া গেল না, ময়লা শার্ট, সরু ঠ্যাং, কালো পেন্টেলুন পরা, খালি পা, আর তিনতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ছাড়া শরীরের অন্য জায়গায় জখম। পায়ে কিছু হয়নি, নইলে দুষ্কৃতকারী পালাতে পারত না।

এর পর আমার কোথাও গিয়ে যে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করা কত অসম্ভব, সে তো বুঝতেই পারছেন।

সেটাকে ময়লা কাগজে জড়িয়ে, শালপাতায় মুড়ে, পকেটে রেখেছিলাম। ফেলতে পারিনি। যার জন্য আমার এত কষ্ট, তাকে কখনো ফেলা যায়। ভালো মানুষ সেজে অচেনা পাড়ার দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়েছি। এখন পকেটও প্রায় খালি হয়ে এসেছে অথচ কলিমুদ্দির কাছে আমার কিছু কাপড়চোপড়, টাকাকড়ি রাখা আছে। চাইতে গেলে সে-ই আগে আমাকে ধরিয়ে দেবে। দু'হাজার টাকা কি চাট্টি-খানিক কথা। ঐ হীরের লোকটা নিজেকে ভারি ধার্মিক ভাবে—নাকি কোথায় মন্দির করে দিয়েছে—অথচ টাকা দিয়ে ভালো মানুষকে বিশ্বাস করবে, চোরকে খুনে বানাতে একটুও দ্বিধা করে না।

রাতে যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। রাস্তায় বড় পাইপের ভেতর কিংবা তৈরি-হচ্ছে বাড়ির সিঁড়ির নিচে, যেখানে চেনা লোকজন থাকে না এমন সব জায়গায়। এই মুহূর্তে একটা খালি বাড়ি পেলে, চুপ করে সেখানে সাতদিন পড়ে থাকতাম। এ ব্যথা আর সইতে পারছিলাম না। খাব না দাব না, নড়ব না চড়ব না, শুধু চুপ করে পড়ে থাকব। এমন কোনো জায়গায় যেখানে কেউ আমার খোঁজ করবে না।

খালি বাড়ি বলে কিছু নেই আজকাল। খিদিরপুরের ডকের কাছে মুন্সীদের হানা-বাড়ি ছাড়া। তার ত্রিসীমানায় কেউ যায় না। যারা যারা আগে আগে গেছিল, তারা নাকি কেউ ফেরেনি। সামনেটা গুদোমঘর, পেছনে ভাঙা বসতবাড়ি। নাকি সিরাজদ্দৌলার সময়কার বাড়ি, তাঁরি মুন্সীর। যেমন মুনিব তেমনি নফর। গুদোমটা অনেক কাল পরে তৈরি। সেকালে কাঠ, তুলোর বস্তা, পাট, জাহাজে তোলার আগে এখানে জমা করা হত। খুনে লেঠেলদের আস্তানা। খুব বিশ্রী একটা ব্যাপারের পর পুলিস এসে দরজায় এই বড় তালা লাগিয়ে সীল করে দিয়ে গেছে। সে-ও আজ পঁচিশ ত্রিশ বছর তো বটে। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল। সামনে নিরাপদ তালা মারা, পাশের করগেটের দেয়ালে একটা খিড়কি দোর। তাই দিয়ে ঢুকে শহরের যত ঘরছাড়া বাউন্ডুলে, গুন্ডা, বদমায়েসরা নিশ্চিন্ত আরামে রাত কাটাত। তারপর তারাও ও-জায়গা ছাড়তে বাধ্য হল। রাতে নাকি কি-সব দেখত। বছর কুড়ি গুদোম খালি। সাপখোপরা থাকে। পেছনেই মস্ত বাড়ি না প্রাসাদ। তাকে মরণ-দশায় ধরেছে। বাইরের পলেস্তারা খসে গেছে, ইঁট বেরিয়ে এসেছে, জানালা দরজা ঝুলে পড়েছে, বট-অশ্বত্থ গজিয়েছে। চারদিকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। হাঁটু অবধি আগাছা ; এ জমিতে কতকাল কেউ হাঁটেনি।

আমার শরীর জবাব দিয়েছিল। কাঁধটা ফুলে ঢোল। পকেটে শালপাতায় মোড়া সেই জিনিসটে আর ডকের দোকান থেকে লুকিয়ে আনা ছোট একটা পাঁউরুটি। দিনের আলো প্রায় নেই বললেই হয়। আশ্চর্যের বিষয় মুন্সীবাড়ির ভাঙা সিং-দরজার বাইরে একটা সরকারী কল। তার মুখ থেকে সরু ধারায় জল পড়ছে তো জলই পড়ে যাচ্ছে। নিচে চকচকে সবুজ শ্যাওলা জমে গেছে। সেই জলে হাত মুখ পা ধুলাম। কতকাল গায়ে জল পড়েনি সে আর কি বলব। আঁজলা ভরে জল খেলুম। জলের মতো আছে কি ? ভগবানের দান। আমার মতো হতভাগাকেও কেমন প্রাণ ভরে জল খেতে দিলেন দেখে অবাক হলাম। তাও যদি অনুতাপ-হওয়া পাপী হতাম। গির্জার বারান্দায় একবার শুয়েছিলাম। অনেক রাতে পাদ্রী এসে ডেকে তুলে আমাকে হাত-পা ধোবার জল, একটা মাটির হাঁড়ি-ভরতি সুরুয়া আর বড় এক টুকরো রুটি দিয়েছিল। তখন শীতকাল, গায়ে দেবার জন্য একটা ছেঁড়া কম্বলও দিয়েছিল। বলেছিল পাপীরা অনুতাপ করলে যীশু তাঁদের বুকে টেনে নেন। ভোরে কম্বলটা নিয়ে পালিয়েছিলাম। আমার মতো নোংরা ছেলেকে যীশু যে বুকে টেনে নেবেন না, তাতে কারো সন্দেহই নেই। সেই কম্বলটা এখনো আমার জিনিসপত্রের

সঙ্গে কলিমুদ্দির ঘরে পড়ে আছে। চিরকাল তাই থাকবে। হীরে চুরি যেমন তেমন অপরাধ নয়। দশ বছরেও মাপ হয় না।

মানুষের জীবনে এমন সব সময় আসে যখন মনের ভয় ভাবনা সব দূর হয়ে গিয়ে, শরীরের দরকারটাই সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে। ভাবছিলাম ঐ হানাবাড়িটাতে গিয়ে শুয়ে থাকলেই তো ল্যাঠা চোকে। মুখ তুলে দেখি মুন্সীবাড়ি নিতান্ত খালি নয়। একজন সাদা-কাপড়-পরা বুড়ো বামুন, হাতে একটা ছোট্ট তেলের কুপি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাসি পেল। আজকাল কখনো বাড়ি খালি পড়ে থাকে? লোকটা সটাং আমার কাছে এসে বললেন, "কলটা বন্ধ করে দাও। জলপড়ার শব্দে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়।" তাই দিলাম। বুড়ো খুসি হয়ে বললেন, "কি চাও? এখানে কেউ আসে না। এটাকে বলে হানাবাড়ি। ভয় পায়। আমি মায়ে-খেদানো ঠগ জোচ্চোর বদমায়েস চোর।"

বললাম, "গুরুঠাকুর, কিছু চাই না। শুধু সাত দিন কোথাও গিয়ে চুপ করে পড়ে থাকতে চাই। কাঁধে বড় ব্যথা। পা আর চলে না।" বুড়ো এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।" উঃফ্! বাঁচা গেল! লোকও যেমন, বলে কিনা ভূতের বাড়ি, তবু ভাগ্যিস্ তাই বলে, নইলে আর দেখতে হত না। ঘরে ঘরে কাঠের জ্বালে হাঁড়ি বসত। আমাকে পালাতে হত।

তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে দালানে উঠতে হয়। কিছুতেই পা আর উঠল না। হাঁটু দুটো কি-রকম জুড়ে গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই। বুড়ো ভদ্রলোকই নিশ্চয় আমাকে ধরে ঘরে তুলেছিলেন, দোতলার ঘর; বুড়োর হাড় শক্ত বলতে হবে। যখন জ্ঞান হল অমন যে ক্লান্তি, তাও দূর হয়ে গেছে। বলেছিলাম সাত দিন চুপ করে পড়ে থাকব। নিজের দরকারে একবার উঠে, সেই যে আবার শুলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর জাগিনি। বুড়ো বামুনকেও আর দেখিনি। তিনিই বা আমাকে বিশ্বাস করবেন কেন? কাষ্ঠ হাসলাম। বিশ্বাস করবার মতো চেহারা বটে আমার! কেন জানি, একটুও খিদে পায়নি। তবু অভ্যাসের জোরে পকেটটা দেখলাম। কই পাঁউরুটিটা তো নেই। যাক গে পাঁউরুটি। পাশ ফিরে আবার ঘুমোলাম। খিদে নেই, তেষ্টা নেই, শরীরের আর কোন দরকার নেই। শুধু ঘুম। হয়তো সত্যিই রাতদিন ঘুমিয়েছিলাম! তারপর একদিন সকাল বেলায় জেগে উঠে দেখি, শরীরটা একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে। বাইরে থেকে একটা মহা হট্টগোল কানে এল। ঘরের জানালার পাল্লা নেই। চেয়ে দেখি আগাছায় ভরা উঠোনে ট্রাক, কপি-কল, অদ্ভুত চেহারার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতি। আর মেলা লোকজন।

পাশে এসে বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। বললেন, "এবার তোমাকে আমাকে এখান থেকে সরতে হয়। বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে। বেওয়ারিশ সম্পত্তি, সরকার দখল নিচ্ছেন। ঐ কড়িকাঠটার ওপর আমার মা-কালী লুকোনো আছেন, দেখ তো পাড়তে পার কি না!" হাসি পেল; আমি দেওয়াল বেয়ে দোতলায় উঠতে পারি। কুলুঙ্গীতে এক পা, জানালায় মাথায় এক পা হাত বাড়িয়ে কড়িকাঠের ওপর থেকে আমার কড়ে আঙুলটার মতো ছোট্ট মা-কালীর মূর্তিটে পেড়ে আলগোছে তাঁকে দিলাম। কে জানে সোনার কি না। সেই রকমই ঠাওর হল। তারপর তাঁর পায়ের কাছে গড় ক'র বললাম, "আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। যা বলবেন তাই করব।" বুড়ো বললেন, "যা এবার। গলিতে ভূতের বাড়ি ভাঙা দেখতে ভিড় জমেছে, তাদের সঙ্গে মিশে যা গে। অন্য সব ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। এবার রওনা দে। কোনো ভয় নেই।"

হঠাৎ কাঁধে ব্যথার কথা মনে পড়তেই টের পেলাম সেটা একেবারে সেরে গেছে। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, সেটাও নেই। উঃফ্ বাঁচা গেল। কিন্তু বুড়ো লোকটি কোথায় গেলেন? জানালা দিয়ে চে'য় দেখলাম, ভিড়ের মধ্যিখান দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে গঙ্গার

দিকে চলেছেন। আমিও তখন নেমে এলাম। ভিড়ের লোকেরা গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে কত রকম যে মন্তব্য করছিল তার ঠিক নেই। ভূত বাছাধন এবার টের পাবেন। দুশো বছরের মৌরসী পাট্টা এবার উঠল। হেনা-তেনা কত কি। একজন আবার বললেন, "এদের চাইতে তার-ই অধিকার বেশি। তার বাপের সম্পত্তি! বামুন মানুষ, কালীভক্ত।" সবাই শূন্যে নমস্কার করতে লাগল। হাসি পেল। তখনো বুড়ো লোকটিকে দূরে দেখা যাচ্ছিল। লোকগুলোর মাথা খারাপ। গঙ্গার ধারে পেঁছে নৌকোটৌকো চেপে থাকবেন, সেখানে গিয়ে আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম সঙ্গে যাব।

তার বদলে সটাং কলিমুদ্দির কাছে গেলাম। যা হয় একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। আর পালিয়ে বেড়াব না, মন ঠিক করে ফেলেছিলাম। আমাকে দেখেই কলিমুদ্দি ছুটে এসে পায়ে পড়ল। "আমাকে মাপ কর্। দু' হাজার টাকা বখশিস্ দেবে বলেছিল। লোভ হয় কিনা তুই-ই বল্? এদিকে তুই ফিরছিস্ না দেখে, আমি কি ভাবতে কি ভেবে বসলাম রে! তোর নামধাম সব গিয়ে থানায় লিখিয়ে এলাম। ক' দিন ধরে সরু চিরুনি দিয়ে শহরটাকে আঁচড়ে ফেলেছিল এরা। এখন কাগজে দিয়েছে ইয়ারিং মোটে হারায়নি, মোটা গিন্নির হাত-ব্যাগের মধ্যেই পড়েছিল, এদ্দিনে পাওয়া গেছে। থানার লোক এসে আমাকে যা নয় তাই বলে গেছে। তোকে হেনস্তা করার জন্য মালিক তোর জন্য পাঁচশো টাকা জমা দিয়েছে। সেটি গিয়ে নিয়ে আয়। আমিও যাচ্ছি। তোকে সনাক্ত করতে হবে তো। তা ছিলি কোথায়?"

আমি বললাম, "একটু বাইরে গেছলাম। থানার লোকে আমাকে চেনে, সনাক্ত করতে হবে না।"

তবু সনাক্ত করতে বেশ হামলা হয়েছিল। শেষটা যখন টাকাটা সত্যি পাওয়া গেল, কলিমুদ্দিকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিলাম—"আমার কাপড়-চোপড় আর টাকাকড়ি যা তোর কাছে আছে, সে সব তোকে দিয়ে আমি দেশে গেলাম।"

তাই চলে যাচ্ছি দেশে এই রেলে চেপে। সেখানে আমার মা আছে, কিছু জমিজমাও আছে। চলে যাবে এক রকম করে।

বাপের ভিটে

আমার গয়নাদিদি, আসলে অন্য নাম, চটে যাবেন বলে ঐ নাম দিয়েছি। ভালো নাম না?—একবার বুড়ো বয়সে ছেলে-বৌয়ের ওপর রেগেমেগে, কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর যেতে, আধা-পথ দূরে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, তাঁর বাপ-পিতেমোর আদি বাড়িতে চলে গেছিলেন। সে এক অদ্ভুত জায়গা। জগন্নাথঘাট থেকে নৌকোয় উঠে, সাত ঘণ্টা বাদে মকরঘাটায় নামতে হয়। যেমন নাম, তেমনি জায়গা। সেকালে নাকি বড় বড় শুঁড়তোলা মকর ড্যাঙায় উঠে শীতকালে রোদ পোয়াত। তাদের মুখের লালা শুকিয়ে নদীর পাড়ে ঝিনুকের মতো রঙের মুক্তোর মতো গোল সব মণি তৈরি হত। সেই মকর-মণি যারা

কুড়োত, তাদের আর ফিরে চাইতে হত না। বলেছি না অদ্ভুত জায়গা!

মকরঘাটায় একটা ছোট টিনের ট্রাঙ্ক, একটা ছোট শতরঞ্জির বিছানা আর একটা আরো ছোট বেতের ঝুড়িসুদ্ধ গয়নাদিদিকে নামিয়ে দিয়ে দুকুল মাঝি বলল, "তা বুড়ো-মায়ের থাকা হবেটা কোথায়? নিতে তো কেউ এসেনি।" গয়নাদিদি রেগে বললেন, "এসবে আবার কেটা রে? বাপ-পিতেমোর বাড়ি আসছি, তার জন্য কি মিছিল করতে হবে? জিনিস বইবার লোক দে। নন্দীবাড়ি পেঁছে দেবে, কাছেই কোথাও হবে। ঘাট থেকে হাঁক দিয়ে বুড়ো-ঠাকুরদা বরকন্দাজ আনাতেন।"

শুনে মাঝি কাঠ! "সে-বাড়ি তো ভালো না, মা। ওখানে জনমানুষ থাকে না।" গয়নাদিদি চটে গেলেন, "কথার ছিরি দেখ! আমার বাপ-পিতেমোর ভিটে। তাঁরা এক দিনের জন্যেও নিজেদের ভিটে ছেড়ে আর কোথাও রাত কাটাননি। আজ বলে কিনা কেউ থাকে না।" মাঝি বলল, "ঠিক তাই। সেই জন্যেই মানা করতিছি।" তারপর গয়নাদিদিকে নিজেই বাক্স তোলার জোগাড় করতে দেখে, গলুইয়ের ওপর যে লোকটা এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, "এই মাধো! মাঠানের জিনিস নন্দীবাড়ি পেঁছে দে আয়। এক টাকা পাবি।" গয়নাদিদি ভেবেছিলেন পঞ্চাশ পয়সা দেবেন, তা গতিক দেখে চুপ করে রইলেন।

মাধো জিনিস নিয়ে বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটা দিল। গয়নাদিদি পাঁচ-সাত মিনিটে বাপ-পিতেমোর ভিটেয় পেঁছে গেলেন। মাধো পাঁচিলে-বসানো তালাবন্ধ দরজার সামনে মোট নামিয়ে বলল, "টাকাটে দেখি। আমি ভেতরে পা দিচ্ছিনে। জিনিস কে ঘরে তুলবে?"

গয়নাদিদি বললেন, "দেখি ডাকাডাকি করে, কেউ যদি থাকে।"

মাধো জিব কেটে বললে, "ও-কাজ করবেন না। ডাকলে ঠিক এসে হাজির হবে। নিন্ দরজা খুলুন, আমিই তুলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কাজের লোক এ মুলুকে পাবেন নি মা। বাঁশবাগানের পাশে বামুনের দোকানে কেরাসিন, কয়লা, রান্না খাবার পর্যন্ত পাবেন। এ বাড়িতে জন-মানুষ থাকবেনি।"

গয়নাদিদি চারদিকে চেয়ে বললেন, "না, থাকবে না! চালাকি পেয়েছ? থাকবে না তো তুলসীতলা ঝাঁটপাট দিয়েছে কে শুনি?"

মাধো শিউরে উঠে বলল, "সেই কথাই তো বলছিলাম। টাকাটে দেন।" গয়নাদিদি টাকা দিয়ে বললেন, "বাঁশবাগানের ও-ধারে গয়লাবাড়ি দেখলুম। সেরটাক দুধ পাঠিয়ে দিস, নগদ দাম দেব।" মাধো বলল, "তাহলে দরজা খোলা রাখবেন।" ঘরের তক্তাপোষ, জলচৌকি, পিঁড়ি সব কাঁঠাল কাঠের তৈরি। পরিষ্কার-টরিষ্কার।

বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে খুলতে গয়লা দুধ নিয়ে এসে বাইরে থেকে ডেকে বলল, "দুধ লেন, আমি ভেতরে যাবনি। সুয্যি হেলেছেন।" যত সব কুসংস্কার! গয়নাদিদি দুধের হাঁড়ি নিয়ে বেরোতেই, গয়লা বলল, "মোক্ষদা পিসির বাড়িতে ঘর পেতেন। সেইটেই ভালো হত।"

দিদি রেগে গেলেন, "বাপ-পিতেমোর বাড়ির চেয়ে সেইটেই কি ভালো হত? তাঁরা তেতে-পুড়ে এইখানে প্রাণ জুড়োতেন। সিপাই-হাঙ্গামার সময় বুড়ো-ঠাকুমা ছেলেপুলে নিয়ে এইখানে উঠে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। কেন, হয়টা কি? চোর-ডাকাত আসে?"

"এজ্ঞে রেতে ছাদে ধুপধাপ পড়ে।"

"পড়ুক। আর কি?"

"গোয়ালে কারা রাত কাটায়। তুলসীতলায় আলো দেয়।"

"ভালো করে। আমার বাড়িতে আজ আমি আলো দেব।"

গয়লা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "তবে আর কিছু বলব নি।"

ভেতরের উঠোন কিন্তু আবর্জনায় ভরা। গয়নাদিদি গোয়াল ঘরের দিকে মুখ করে হাঁক দিলেন, "কে আছিস্ ওখানে, উঠোন ঝেঁটিয়ে-পেঁটিয়ে রাখতে পারিস্ না।" ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। কে একটা গোয়াল থেকে বেরিয়ে এস ঝাঁট দিতে শুরু করে দিল।

উঠোনের কোণে ছোট কুয়ো। গয়নাদিদি ঝুড়ি থেকে খুদে বালতি আর দড়ি বের করে, তারার আলোয় সাবান মেখে চান করে ঘরে এসে, আহ্নিক করলেন। গোয়ালঘর চুপচাপ। আর কি তারা আসে, যদি কাজ করতে হয়! লুচি, সন্দেশ, মর্তমান কলা খেয়ে ঘুম। রাতে একবার ছাদে ধুপধাপ শব্দ হল বটে। তা হোক।

ভোরে উঠে গয়নাদিদি দিনের আলোয় দেখলেন গোয়ালঘরের দোরে তালা দেওয়া। কুয়োর পাশের চৌবাচ্চাতে কাণায় কাণায় জল। ছাদে গিয়ে দেখলেন তাল পড়েছে, নারকেল পড়েছে, তা ধুপধাপ হবে না? নিচে এসে দেখলেন ভেতরের দালানে এক কাঁদি কলা। চোর-ই হোক, ছ্যাঁচড়-ই হোক, যারা গোয়ালে রাত কাটায় তারা লোক ভালো। দয়ামায়া আছে শরীরে।

গয়লা যেমন বলেছিল সদর দরজা খুলেই রাখলেন। সে দুধের সঙ্গে চাল, ডাল, আনাজপত্র দিয়ে পয়সা নিয়ে গেল। এক পয়সা বাকি রাখল না। বলল, "কিছু বলা যায় না মা, ভালো কথা তো শুনলেন না। রেতে কেউ আসেনি?"

গয়নাদিদি বললেন, "না।"

সন্ধ্যেবেলায় দালানের পাশে ইঁট পেতে উনুন করে, তালের বড়া, তালের ক্ষীর তৈরি করে আহ্নিক সেরে উঠেই থামের পেছন থেকে একটা কালো রোগা ছেলেকে হিড়হিড় করে টেনে বের করলেন। হতভাগার গায়ে একটা ত্যানা নেই। "কি নাম তোর?" কিলবিল করতে করতে সে বলল, "এজ্ঞে, পেঁচো।"

"এত ধেড়ে ছেলে উদোম ঘুরছিস্, লজ্জা করে না?"

"এজ্ঞে, না।" গয়নাদিদি তাকে গায়ের চাদর খুলে দিয়ে বললেন, "কলপাতায় তালের বড়া, তালের ক্ষীর দিচ্ছি, নিয়ে যা। ঘরে আর কে আছে?"

"এজ্ঞে, মা আছে।" বেশি করেই দিলেন, ছেলেটা এক দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সাত দিন ছিলেন গয়নাদিদি, কোনো কষ্ট হয়নি। দিনের বেলায় শুনশান, রাতে তারা কাজ সেরে দিত। চোরের পরিবার সন্দেহ নেই। তবে দেখা পাননি আর। সাতদিন পরে ছেলে-বৌ এসে পায়ে ধরে মাপ চেয়ে, কেঁদেকেটে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। শেষ বারের মতো ভেতরের দালানে দাঁড়াতেই তাদের দেখতে পেলেন, দিনের আলোতেই। চাদর-জড়ানো পেঁচো আর তার রোগা কালো নাক-কাটা মা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তারা, তারপরেই আর দেখতে পেলেন না। ছেলে বাঁধা-ছাঁদা সেরে বলল, "বেশ তো ছিলে মনে হচ্ছে, মা। অথচ এদিককার লোকদের এমনি কুসংস্কার, নৌকোর দুকুল মাঝি বললে কিনা বুড়ো কর্তাদাদার সময়ে গয়লাপাড়া থেকে কে তার দুষ্টু বৌয়ের নাক কেটে, ছেলে-সুদ্ধ তাড়িয়ে দিয়েছিল। ছেলেটাও নাকি মহা পাজি ছিল। তা বুড়ো কর্তাদাদু তাদের সারাজীবন তাঁর গোয়াল-ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমনি তাঁর বুকের পাটা যে কেউ তাদের চুলের ডগাটি ছুঁতে পারেনি। তারাই নাকি এখনো বাড়ি আগলায়, কাউকে আধ ঘণ্টার বেশি টিকতে দেয় না। তুমি কিছু দেখেছিলে? গবর্ণমেণ্ট নাকি নিতে চেয়েছিল, তা সব ভয়ে পালিয়ে এসেছিল।"

গয়নাদিদি বললেন, "নিজের বাড়িতে দেখবার কি আছে? এই আমি বলে দিলাম তোকে মদন, এখন থেকে আম-কাঁঠালের সময় প্রত্যেক বছর ছয় মাস আমি এখানে কাটাব। কি জায়গা বল্ দিকিনি! নদীর ধারে এই বড় বড় মুক্তো গজায়, বলেনি দুকুল মাঝি?

ভূত আসে না আরো কিছু। ভূত এলে আমি দেখতে পেতাম না!"

মদনের বৌ বলল, "একলা কি করে থাকবেন, মা? শুনেছি কাজ করবার লোক পাওয়া যায় না।"

দুকুল মাঝি দড়ি খুলে দিয়ে বলল, "অন্য জায়গায় থাকলে পাওয়া যেত। নন্দী-বাড়িতে কেউ পা দেবে না।"

গয়নাদিদি ফোঁস করে উঠলেন, "যত রাজ্যের বাজে কথা। লোক ওখানে যথেষ্ট আছে। কি ঝাটতি-পটিতি কাজ তাদের! কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! এক কণা ধুলো তো পড়ে থাকেই না, রেতে টর্চের আলোতে স্পষ্ট দেখেছি দু'দুটো লোক কাজ করে যায়, তা মাটিতে এতটুকু ছায়া পড়ে না! হাঁ করে আছিস্ যে বড়, কি হল তোদের?"

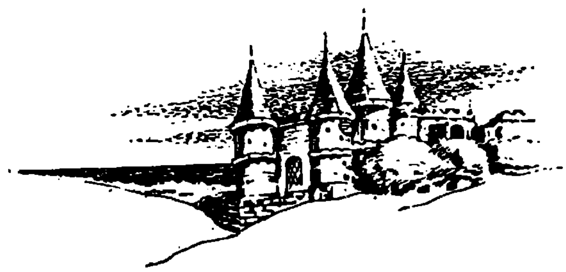

স্পাই

আপনারা সকলেই যে আমার কথা বিশ্বাস করবেন এতটা আমি আশা করি না। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভগবানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না, ভূতের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তবে সত্যি কথা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অপেক্ষায় বসে থাকে না, এই ভরসাতে এই কাহিনী প্রকাশ করলাম।

নানা কারণে নামধাম গোপন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তাতে মূল কাহিনীর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। ব্যাপারটা ঘটেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এবং ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে। সে-সব জায়গা আপনারাও দেখেননি, আমিও দেখিনি, তবে আমার ছোট মামার মুখে যেমন শুনেছিলাম, সেইরকম বিবৃত করে যাচ্ছি।

ছোট মামা বলেছিলেন—

মিলিটারীতে চাকরি করে-করে যে চুল পাকিয়ে ফেলেছি সে কথা তো তারা সকলেই জানিস। দুনিয়াতে এমন জায়গাই নেই যেখানে নানারকম সামরিক কাজে কোনো-না-কোনো সময়ে আমি যাইনি। গত মহাযুদ্ধের শেষে যাদের কাজ ছিল ফ্রান্সের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে, যত সব বিশ্বাসঘাতক বকধার্মিকরা দেশপ্রেমিকের ভেক নিয়ে নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দিয়ে নিজের দেশের সর্বনাশের মধ্যে থেকে বেশ দু-পয়সা করে খাচ্ছিল, তাদের ধরিয়ে দেওয়া ; পাকেচক্রে পড়ে আমিও তাদের দলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।

এই সময়ে যে কতরকম অভাবনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল সে তোরা কল্পনাও করতে পারবি না।

ভয় কাকে বলে জানিস? এমন ভয় যে মুহূর্তের মধ্যে হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্সপে হয়ে যায়? তবে শোন।

একবার একটা ভূতের বাড়ির সন্ধান পেয়ে হেডকোয়ার্টারের ভারি সন্দেহ হল। সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায়, বহুদিনের পুরোনো কালো পাথরের এক বিরাট বাড়ি। কতকাল যে কেউ ওখানে বাস করেনি তার ঠিক নেই। বড়ই দুর্নাম বাড়িটার। দিনের

বেলাতেও সেখানে কেউ বড় একটা যাতায়াত করে না। জানিসই তো, পৃথিবীর সর্বত্রই পাড়াগাঁয়ের লোকদের মনে এই ধরনের কুসংস্কার থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু গেঁয়ো গুজবে থেমে গেল না। সামরিক বিভাগের দুজন অফিসার জলঝরে সন্ধ্যেবেলায় ঐখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাড়িটার সম্বন্ধে কানাঘুষো তারাও শুনেছিলেন এবং আমারই মতো তাঁরাও ঘোর নাস্তিক ও ভূত বা পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্য দিনের আলো থাকতে থাকতে গোটা বাড়িটা তাঁরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও দেখেছিলেন। বলা বাহুল্য ধুলোয় ঢাকা ঘরগুলির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে কিম্বা বাইরে বালি ও বেঁটে-বেঁটে আগাছায় ভর্তি বাগানের দিকে চেয়ে-চেয়ে কোথাও অস্বাভাবিক কিছু তাঁদের চোখে পড়ল না।

চারিদিক অন্ধকার করে রাত নেমে এল, বাড়িটার হাবভাব কেমন যেন বদলে গেল। ধরাছোঁয়ার মধ্যে তেমন কিছু নয়। কিন্তু সমুদ্রের ও বাতাসের উদ্দাম গর্জনকে ছাপিয়ে বাড়ির ভিতরকার ছোটোখাটো নানান শব্দ যেন বেশি করে তাঁদের কানে আসতে লাগল।

প্রথমটা তাঁরা অতটা গা করেনি, কিন্তু ক্রমশ তাঁদের অস্বস্তির ভাবটা এমনি বেড়ে গেল যে, একটা শক্তিশালী টর্চের আলোতে গোটা বাড়িটা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখলেন এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে বাড়িতে নিশ্চয়ই আর কেউ আছে। হাতে হাতে যে প্রমাণ পেলেন তাও নয়। কিন্তু কিরকম জানিস, এই মনে হল স্নানের ঘরে কলের জল পড়ছে ; দোরগোড়ায় পেঁছলেই কে যেন চট করে কল বন্ধ করে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অথচ দরজা ঠেলে বাইরে প্যাসেজে বেরিয়ে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই, সব ভোঁ ভোঁ।

আবার শোবার ঘরের মধ্যে স্পষ্ট দেশলাই জ্বালবার খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে দেখেন কিচ্ছু নেই, মেঝের উপর দুই ইঞ্চি পুরু হয়ে বহু দিনের জমানো ধুলো পড়ে রয়েছে।

অবশেষে দুই বীরপুরুষ অন্ধকারের মধ্যে জলঝড় মাথায় করে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালে দিনের আলোতে ব্যাপারটাকে খানিকটা হাস্যকর মনে হলেও ঐরকম পরিস্থিতিতে যখন চারদিকে সপাই খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে তখন, এ বিষয়ে আরেকটু অনুসন্ধান করাই উচিত বলে সকলের মনে হল।

এই ব্যাপারেই তদন্ত করবার জন্য আমরা জনা পাঁচেক সামরিক বিভাগের ঘুঘু অফিসার, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, চোর ধরার নানারকম ফাঁদ আর ফাঁসজাল, বড়-বড় টর্চ ও শেড-লাগানো লণ্ঠন আর বলা বাহুল্য ঝুড়ি ভরে আহার্য ও পানীয় নিয়ে, সন্ধ্যা নামবার পর রওয়ানা হলাম।

বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে জিপ গাড়িটা রেখে, পায়ে হেঁটে, নিঃশব্দে ও যথা-সম্ভব গোপন ভাবে ভূতের বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

ভয়-টয় পাবার ছেলেই ছিলাম না আমরা। পেঁছেই ঢাকা আলো নিয়ে সারা বাড়িটাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। তার পর একতলায় সিঁড়ির পাশের বড় ঘরটার এক ধারের খানিকটা ধুলো ঝেড়ে নিয়ে, মেঝের উপরেই পা মেলে দিয়ে বসে পড়লাম। বিরাট ঘর, উঁচু ছাদ দেখাই যায় না, কার্নিশে কারিকুরি করা, মস্ত গুহার মতো চিমনি, তাতেও কত কারুকার্য, আর তার মধ্যেই চারটে মানুষ অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। বদমাইসদের আস্তানা গাড়বার এমন উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাওয়া দায়।

পাছে ভয় পেয়ে চোর পালায়, তাই নড়ছি চড়ছি পা টিপে-টিপে ; নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে রেখেছি, একটা সিগারেট পর্যন্ত ধরাচ্ছি না, আলোতে বা গন্ধে পাছে জানান দেয়। এমনি ভাবে বসে আছি তো বসেই আছি।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, এমন সময় খট্ করে কে যেন দোতলার একটা দরজা খুলল, সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ হাত থেকে দরজা ফস্‌কে গেলে বাতাসে যেমন দড়াম্ করে বন্ধ হয় সেইরকম একটা আওয়াজ হল। আমরা সতর্ক হয়ে উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে কে যেন নেমে আসছে। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপ ক্যাঁচ্ কোঁচ করে উঠল, তার পর স্পষ্ট দেশলাই জ্বালবার শব্দ। অন্ধকার ভেদ করে আমাদের পাঁচ জোড়া চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, আবছায়াতে যেন দেখতে পেলাম সে হাত আড়াল করে চুরুট ধরাচ্ছে। পাঁচজনে হঠাৎ টর্চ জেলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সিঁড়ির গোড়ায় ফ্যাকাশে মুখে গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক। হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তার পরনে চেক-কাটা ছাই রঙের ঝোলাঝালা একটি ড্রেসিং গাউন। মাথায় একটা কালোমতো তেলচিটে ভেল্‌-ভেটের গোল টুপি, পায়ে তালি দেওয়া পুরোনো শিলপার, মুখে একটা সরু লম্বা জঘন্য ময়লা পাইপ, এক হাতে তামা দিয়ে বাঁধানো একটা দেশলাইয়ের বাক্স, অন্য হাতে কাঠি।

নিরীহ গোবেচারি ভদ্রলোক, হাত দুখানি ভয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপছে, চোখে হঠাৎ অত আলো পড়াতে যেন ধাঁধা লেগে গেছে, সর্বাঙ্গে ভয়ের ছাপ।

আমরা পাঁচজনে কাণ্ড দেখে অট্টহাস্য করে উঠলাম। ঘাড় ধরে তাকে টেনে ঘরের মধ্যে এনে, উজ্জ্বল সব আলা জেলে তাকে প্রশ্ন করতে লেগে গেলাম। এতক্ষণ পর স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

লোকটি কিন্তু বোকা সেজে রইল। আম্‌তা-আম্‌তা করে নাম বললে, ফিলিপ বারো। বার বার বললে, এই বাড়িতেই বাস করে। তার চেয়ে বেশি কিছু বের করা গেল না, কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে, পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না।

তখন আমরা বুদ্ধি করে খাবারের ঝুড়ি খুললাম। অত খাবার দেখে তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। যুদ্ধের মধ্যে ও পরে ও-সব দেশের লোকেদের সে যে কি কষ্ট, সে আর তোদের কি বলব। হয়তো দু-তিন বছরের মধ্য এত খাবার একসঙ্গে দেখেইনি। তার সারা মুখে দারুণ একটা খিদে-খিদে ভাব।

তবুও লোকটা যে একটা স্পাই এ বিষয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এইরকম ভীতু চেহারার মানুষরাই ভালো স্পাইগিরি করতে পারে। তাদের আসা-যাওয়া কারো নজরে পড়ে না, কেউ তাদের সন্দেহ করে না। কিন্তু এইরকম একটা ক্ষুধার্ত ক্যাংলা স্পাই জন্মে কেউ দেখিনি।

যাক, ভূতের বাড়ির রহস্যটা এতক্ষণে খানিকটা খোলসা হল বলে সকলে মহা খুশি হয়ে তাকে পেড়াপীড়ি করে খাওয়াতে লাগলাম। আর সেও অকাতরে থাক-থাক স্যান্ড-উইচ বিস্কুট আর ফ্লাস্ক থেকে চা গিলতে লাগল। অবিশ্যি আমরা নিজেরাও যে উপোস করে রইলাম তা নয়। বাইরে সমুদ্রের উপর দিয়ে হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, মস্ত-মস্ত ঢেউ এসে পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ছে আর ঘরের ভিতর লণ্ঠনের কোমল আলোতে খাবারদাবার নিয়ে সকলে গোল হয়ে বসে দিব্যি একটা মজলিসি আবহাওয়া গড়ে তুলেছে।

লোকটার কাছ থেকে কিন্তু সত্যিই বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না। তার পিছনে কে আছে, কি ধরনের তাদের কাজের পদ্ধতি সে বিষয়ে হ্যাঁ না কিছুই বলে না। শেষ-পর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুই বললেন, 'ব্যাটা হয় নিরেট বোকা, নয় দারুণ চালাক। ওকে হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া ছাড়া তো উপায় দেখছি না।'

আমার নিজের লোকটার উপর কেমন একটা মায়া পড়ে যাচ্ছিল। এরকম একটা অসহায় নিরবলম্ব ভাব কখনো আমার চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বেচারা, ভয়েই আধমরা। যদি সত্যিই স্পাইও হয়, তবুও সে যে নিজের তাগিদে হয়নি, অপর কেউ ভয় দেখিয়ে জোর-জবরদস্তি করে দলে বাগিয়ে নিয়েছে, এইরকম আমার মনে হতে লাগল। আর সেইজন্যই ওকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া দরকার, সেটাও বুঝতে পারলাম।

শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুই বললেন 'তুমি তো নিজের কোনো পরিচয় দিতে পারছ না। নাম বলছ অথচ কি করে তোমার দিন চলে বুঝি না ; আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় বলতে পারছ না।' লোকটা দুহাতে মুখ ঢেকে বললে, 'নেই, তারা কেউ নেই।' তার সর্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। ক্যাপ্টেন লুই-এর দয়া-মায়া ছিল, তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে না, তুমি যে স্পাই নও তাই-বা কে বলবে?'

সে হঠাৎ মাথা তুলে অনেকখানি স্পষ্ট করে বলল—'স্পাই? কার স্পাই? কে আছে যার জন্য স্পাই হব?'

'আচ্ছা, এখন হেডকোয়ার্টারে চলো তো। যদি স্পাই নাই হও তবে তো ভালোই। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।

কিন্তু সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ অন্ধভাবে সিঁড়ির দিকে দৌড় মারল। ক্যাপ্টেন লুইও সঙ্গে-সঙ্গে 'আরে, ধর, ধর' করে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সে একবার চারিদিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে, 'না, না, এটা আমার বাড়ি। এখান থেকে আমি কোথাও যাব না,' এই বলে, কি আর বলব তোদের, সেই আমাদের পাঁচজনের ঔৎসুক্য-ভরা চোখের সামনে, সেই লণ্ঠনগুলির উজ্জ্বল আলোতে, মুহূর্তের মধ্যে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন লুই-এর মনে হল বুঝি বাতাসকে আলিঙ্গন করছেন।

বুঝতেই পারছিস আমরা আর এক দণ্ডও অপেক্ষা না করে, জিনিসপত্র সব সেখানে ফেলে রেখে, টলতে-টলতে কোনোরকমে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মিলিটারি ব্যাপার ঐখানে শেষ হয়ে যেতে পারে না। পরদিন লোকজন গিয়ে জিনিস-পত্র উদ্ধার করে আনল। বহু অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ও বাড়ি খালি পড়ে আছে। মালিকরা ঐ সময়ে নির্বংশ হয়ে গিয়েছিলেন।

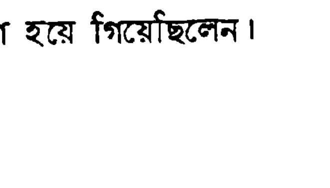

নটরাজ

আমাদের রাঁধবার লোকটির খাসা রান্নার হাত থাকলেও একটা মুশকিল ছিল যে রান্নাঘরে সে কিছুতেই একা থাকবে না। বলুন তো আজকালকার দিনে এ-সব নবাবী করলে কেমন করে চলে? অথচ দিশি রান্না ছাড়াও সে আশ্চর্য সব বিলিতি রান্না জানত ; পুদিনা দিয়ে একরকম অম্বল করত, বাতাসার সঙ্গে তার কোনো তফাত ছিল না। দুধ দিয়ে আর এক চামচ মাখন দিয়ে এমন চিংড়ি মাছ করত সে না খেলে বিশ্বাস হয় না। বন্ধুবান্ধবরা ওর তারিফও করত যেমন, হিংসাও করত তেমনি। এখন ঐ একটি অসুবিধার জন্য সব না পণ্ড হয়ে যায়।

আমি বললাম, "নটরাজ, তা বললে চলবে কেন, আজকাল একটা লোক পুষতেই ট্যাঁক গড়ের মাঠ! তোমার জন্য আবার একটি সঙ্গী এনে দিতে হবে, এ বাপু তোমার আব্দার। চারটি অনিষ্যির রান্নার জন্য দু-দুটো লোক এ কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ মাথা নিচু করে বলল, "ঠিক তা নয়, মা। অন্য লোকটার রান্না না জানলেও চলবে। ঐ সামান্য কাজ, সে আমি একাই করে নিতে পারি। সেজন্য নয়।"

অবাক হয়ে বললাম, "তবে?"

নটরাজ মাথা চুলকে বললে, "আসল ব্যাপার কি জানেন মা, রান্নাঘরে একা আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

"তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একা আবার কি? সন্ধেবেলা টিকারামের সেরকম কাজ থাকে না, সে তো স্বচ্ছন্দে ওখানে বসতে পারে। ভূতের ভয় আছে বুঝি? পাড়াগাঁর লোকদের ঐ এক মুশকিল। আসলে যে-সব ভয়ের জিনিস, এই যেমন চোর-ছ্যাঁচড়, তার ভয় নেই, দিব্যি পিছনের দরজা খুলে রেখে বিড়ি কিনতে যাবে, অথচ ভূত আছে কি নেই, তারই ভয়ে আধমরা। এটা কি ঠিক উচিত হল বাছা? গাঁ থেকে চলে এসেছিসও তো বহুদিন। আর দিনের বেলায় ভূতের উপদ্রব কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ কখনো মুখোমুখি উত্তর দেয় না। নরম গলায় বললে, "গাঁয়ে থাকতে কিছুকেই ভয় করতাম না মা। গাঁ ছেড়ে এসেই তো যত বিপদ।"

আমি চালের বাক্সের উপর বসে পড়ে বললাম, "ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বল না, দেখি কি করতে পারি।"

যেন একটু খুশি হয়ে নটরাজ বললে, "মানুষ সাথী না হলেও চলবে, মা।" শুনে আমি দারুণ চমকে ওঠাতে আরো বলল, "মানে একটা কুকুর হলেও হবে, মা! একটা বড় দেখে কুকুর হলেই সব চেয়ে ভালো হয়।" আমি অবাক হয়ে বসেই রইলাম, নটরাজ বলল, "বুঝলেন মা, বাড়ি আমাদের অজয় নদীর ধারে, ইলেম বাজারের পাশে। বোলপুর সিউড়ির বাস ওর ধার ঘেঁষে যায়। আমাদের মা মহাময়ী এমনি জাগ্রত দেবতা, মা, যে গোটা গাঁটাকে বুকে আগলে রেখেছেন, কারো চুলের ডগা ছোঁয় ভূত-পিরেতের সাধ্য কি! ভূতের ভয় কোনোদিনই ছিল না।

"কিন্তু বাড়িতে খাওয়া জুটত না তাই নকুড়মামার সঙ্গে কলকাতায় এলাম। ঐ যে মিশিন রো, ঐখানে এক বাঙালী সাহেবের বাড়িতে নকুড়মামা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। শুনতে বেশ ভালোই চাকরি মা। সাহেবের পরিবার নেই, দিনভর বাইরে বাইরে থাকে, দুপুরে আপিসে খায়, চাপরাশি পাঠিয়ে দেয়, আমি রেঁধে-বেড়ে টিপিনকারিতে গুছিয়ে দিই, সাদা ঝাড়নে পিলেট কাঁটা চামচ বেঁধে দিই; ওদিকে সৌখীনও ছিল মন্দ না। আর সারাটা দিনমান বাড়ি আগলাই, ঝাড়-পোঁচ করি, খাইদাই। আবার বিকেলে রাতের জন্য রাঁধাবাড়া করি, সাহেবের চানের জল গরম করে রাখি। রাত নটা-দশটার সময় সাহেব আসে, প্রায়ই দুটো-একটা বন্ধুবান্ধবও সঙ্গে আনে, তারাও খায়-দায়।

"সারাদিন বেশ যেত মা, ঐ রাতেই যত মুশকিল। সাহেব লোক খুব মন্দ ছিল না, মা. দয়ামায়াও ছিল, আমায় এটা ওটা দিত, দেশের চিঠিপত্তর এল কি না জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু বোধ হয় নেশা-ফেশা করত ওরা সবাই, নিশ্চয় করত, নইলে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত ফরমায়েস করত যে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেত।

রাতে কিরকম গুম্ হয়ে থাকত। আমার দিকে চাইত যখন চোখ দুটোকে দেখে মনে হত, যেন ছেলেদের খেলার দুটো গোল গাল মার্বেল। কিরকম একদৃষ্টে চেয়ে থাকত, কথা বলত না, আমার বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে থাকত। ভাবতাম চলে যাই, আবার দেশের বাড়ির অভাব অনটনের কথা মনে করে থেকে যেতাম। অন্য সময় সত্যি লোক ভালোই

ছিল। রাতে বদলে যেত।

"আমরা মিশন রো'র ঐ আদ্যিকালের পুরোনো বাড়িটার তিন তলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। রান্নাঘরের পাশে চাকরদের সিঁড়ি, তারই ওধারে পাশের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের দরজা। তাইতেই আমার সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। ঐখানে এমন ভালো এক মেম থাকত মা, আধ বুড়ি, সবুজ চোখ, লাল চুল, দিব্যি বাংলা বলে, আর মা, দয়ার অবতার।" বলে নটরাজ বোধ হয় তারই উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার করল।

"বিপদে পড়লেই আমাকে বাঁচাত। দোরগোড়ায় একবার দাঁড়ালেই হল। কি করে যেন টের পেয়ে যেত, অমনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসত।

"আজ আবার কি চায়? সাদা সির্কা? তা অত ঘাতড়াচ্ছিস কেন? এই নে।' বলে হয়তো একটা গোটা বোতলই দিল আমার হাতে। কাজ শেষ হলে কিছু বাকি থাকলে ফিরিয়ে দিতাম।

"কিম্বা হয়তো, 'কি হল আবার? গুলোস্? আয় আমার সঙ্গে।' ওদের রান্নাঘরটি মা সাক্ষাৎ স্বগ্গ! কি ছিল না সেখানে? যা দরকার দেরাজ খুলে, ডুলি খুলে বের করে দিত। সব ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করত। বাসনের পিঠে মুখ দেখা যেত। ঐখানেই মা ওনার কাছেই আমার রান্না শেখা, সকালে কি দিনের বেলায় কত যত্ন করেই যে শেখাত, মা। নইলে আর পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু ছেলে আমি, এত সব জানব কোত্থেকে!"

"তাই বল নটরাজ, আমি বলি এত ট্রেনিং কোথায় পেলি? তাপ্পর, ও চাকরি ছাড়লি কেন?"

"ছেড়েছি কি আর সাধে, মা। একটি বচ্ছর এক নাগাড়ে কাজ করেছিলাম, একবারও দেশে যাই নি। কলকাতায় ঐ এক নকুড়মামাকে চিনি, তা সেও আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে এমনি ডুব মারল যে বচ্ছরান্তে তার আর পাত্তা পেলাম না। কেউ আমার সঙ্গী-সাথী ছিল না, মা। বয়সটাও বেশি ছিল না, এমনি দারুণ মন খারাপ হয়ে যেত, মা, সময়ে সময়ে, মাঝে মাঝে দুপুরে হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে কান্নাকাটি করতাম!

"একদিন মেম টের পেয়ে আমাকে একটি সুন্দর ছবির বই দিয়ে গেল—বিলেত দেশের কত ছবি। পেরথম পাতায় মেমের নাম ছিল, সে তো আমি পড়তে পারি নে, বলেছিল ওটা কেটে আমার মামা লিখে নিতে। করেছিলামও তাই। কিন্তু ও চাকরি আমার আর বেশিদিন টিকল না।

"একদিন রাত্রে সাহেবকে খাইয়ে-দাইয়ে রান্নাঘরে এসে বইটা ঘাঁটছি, আর থেকে থেকে মেমের দরজার দিকে তাকাচ্ছি, ভোরের চায়ের দুধ ছিঁড়ে গেছে, তাই ও আমায় এক কাপ দেবে বলেছিল। এমনি সময় বোধ হয় আমাকে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে, সাহেব এসে হাজির।

"আমার তো হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছেন! রাগে সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, রাতে ঐরকম সামান্য কারণেই রেগে চতুর্ভুজ হয়ে উঠত। কি একটা বলতে যাবে, এমনি সময় বইটার উপর চোখ পড়ল!

"অমনি কি বলব মা, ওর মুখটা দেয়ালের মত সাদা হয়ে গেল, দেহটা কাঁপতে লাগল। পাগলের মতো ছুটে এসে আমার গলা টিপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, 'বল হতভাগা, ও বই কোথায় পেলি?' অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বলাতে, কিরকম অদ্ভুত করে হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি! ওখানে মেম থাকে না আরো কিছু! ওটা আগাগোড়া গুদোমখানা, আমাদেরই অফিসের গুদোমখানা, কেউ থাকে না। বল্ কে তোকে এ-সব শিখিয়েছে? নইলে মেরেই ফেলব। জানিস দরকার হলে মানুষ মারতেও আমার বাধে না।'

"ভয়ে কেঁদে তার পায়ে পড়েছিলাম, মা। বার বার বলতে লাগলাম ঐ রান্নাঘরে

খোঁজ করতে, মেম নিশ্চয় স্বীকার করবে ও বই ও-ই দিয়েছে। তাই শুনে রাগে অন্ধ হয়ে সাহেব ছুটে গিয়ে দরজায় দমাদম্ কীল মারতে লাগল। কীলের চোটে দরজার ভিতরকার ছিটকিনি খসে গেল, দরজা খুলে গেল।

"অবাক হয়ে দেখলাম, কোথায় ঝক্‌ঝকে রান্নাঘর! এ ঘরের ছাদ থেকে মেজে অবধি পোকা খাওয়া কাগজপত্রে ঠাসা।

"সাহেব আমাকে ঘাড় ধরে এ ঘর থেকে ও ঘর নিয়ে ঘুরিয়ে আনল। কোথাও মানুষের বাসের কোনো চিহ্নই নেই মা, শুধু খাতাপত্র, কাগজের তাড়া।

"তার পর আবার ফিরিয়ে এনে, ওদের রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে, আমাকে তেমনি করে ধরে আমাদের রান্নাঘরে এসে ঢুকল। এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। কিন্তু মা, তার ঐ মার্বেল পাথরের মতো চোখের কথা মনে করে এখনো গা শিউরে ওঠে। ঐরকম অদ্ভুত করে আমার দিকে চেয়ে, বইটাকে আমার মুখের কাছে তুলে ধরে, চাপা গলায় বলল, 'শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি, কে তোকে আমার পেছনে লাগিয়েছে? এ বই কোথায় পেলি? মেমের কথা কে বলেছে?' সত্যি বলব মা, তখুনি আমি ভয়ের চোটেই মরে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়, ক্যাঁচ্ করে অন্য রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল; সবুজ চোখ, লাল চুল, আধাবয়সী মেমটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে, সাহেবের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে আস্তে আস্তে আবার ঐ রান্নাঘরে ঢুকে গেল, দরজাটা আবার ক্যাঁচ করে বন্ধ হয়ে গেল। আর সাহেবও গোঁ গোঁ শব্দ করে অজ্ঞানই হয়ে পড়ে গেল, না মরেই গেল সে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম না; হুড়্‌মুড়্ করে ঐ পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বিনা টিকিটে একেবারে দেশে চলে গেলাম।"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তার পর সাহেবের খবর নিলি না?' নটরাজ বললে, "ও বাবা! আমি আর সেখানে যাই! পাঁচ বচ্ছর দেশে বসে রইলাম। রোজই ভয় হত ঐ বুঝি পুলিশ এল সাহেব কি করে ম'ল জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু সে মরে নি নিশ্চয়।

"তার পর দেশে খাওয়া জোটে না মা, তাই আবার এলাম কাজ করতে! এইখানেই মন বসে গেছে মা, যদি একট বড় দেখে কুকুর রাখেন তো থেকেই যাই।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কুকুরে কি ওনাদের ঠেকাতে পারে রে।" নটরাজ জিব কেটে বললে, "ছি ছি! ও কথা ভাবলেও পাপ। ওনার জন্য কুকুর নয়, বলি কি সাহেবটা যদি আমার খোঁজ পায় তাই।"

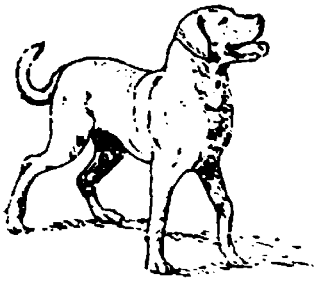

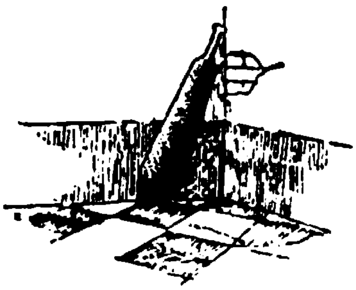

দজ্জাল বৌ

লাটুবাবু বলে একজন ভারি ভালোমানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর বৌটি এমনি দজ্জাল যে, কোনো একটা বাড়িতে তাঁরা তিন মাসের বেশি টিকতে পারতেন না। তারি মধ্যে হয় পাশের বাড়ির লোকদের সঙ্গে, নয় বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে, নয়তো বাড়ির নানা খুঁত নিয়ে লাটুবাবুর ওপর রাগারাগি করে, শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়তে হত। এদিকে ভদ্রলোকের পক্ষে মাসে দুশো টাকার বেশি বাড়িভাড়া দেওয়া মুশকিল। শেষকালে এমন দাঁড়াল যে ঐ ভাড়ার মধ্যে কলকাতা শহরে, কিংবা শহরতলীতে আর একটিও বাড়ি বাকি না থাকার মতো হল। এই সময় গিন্নি আবার অশান্তি করে বাড়ি ছাড়বার জন্য তাঁকে জ্বালিয়ে খেতে লাগলেন।

এর মধ্যে একদিন বাড়ি ফেরার পথে এক দালালের সঙ্গে দেখা। সে বলল নাকি বেহালার ওদিকে একটা চমৎকার বাড়ি আছে, ভারি সুবিধার দরে পাওয়া যেতে পারে। কি ব্যাপার? না ও-বাড়িতে কেউ যদি একটানা সাত দিন থাকে, বাড়িওয়ালা তাকে বিনি পয়সায় ছয়মাস থাকতে তো দেবেনই, তার পরেও খুব কম ভাড়াতেই থাকতে দেবেন।

লাটুবাবু বললেন, "চলুন মালিকের বাড়ি গিয়ে কথাটা পাকা করে আসি। আপনাকে কিছু দিতে হবে নাকি?" দালাল জিব কেটে বলল, "না না। আমাকে যা দেবার মালিকই দেবেন। তা বাড়িটা একবার দেখবেন না?" লাটুবাবু ঘাড় নাড়লেন, "কিছু দরকার নেই। সব বাড়িতেই আমার এক হাল হয়।"

মালিকের বাড়ি গিয়ে লেখাপড়া করে দিয়ে, চাবি পকেটে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলে পর, দালাল কেমন একটু উসখুস্ করতে লাগল।

"আবার কি হল?"

দালাল বলল, "দেখুন তাড়াহুড়োয় আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি বলে বিবেক দংশন করছে।"

লাটুবাবু বললেন, "কি কথা?"

"ইয়ে—মানে রোজ রাতে যে এ বাড়িতে আসে, সে একটা গলায়-দড়ে, মানুষ নয়।"

লাটুবাবু ঢোক গিলে বললেন, "তাতে কি হয়েছে? আমার তো নাইট-ডিউটি। গিন্নি সামলাবেন।"

পরদিন সকালে টেম্পো করে জিনিসপত্র নিয়ে দালালের সঙ্গে ওঁরা বেহালা গেলেন। দালাল পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল। গিন্নি বাড়ি দেখে মহা খুসি। বলেন কি না, "ওগো, এমন সুন্দর বাড়িতে আমি জীবনে থাকিনি। আর বাড়ি বদল নয়। এখানেই জীবন কাটিয়ে দেব।"

তারপর দুজনে মিলে হাতে হাতে ঘরদোর গুছিয়ে ফেললেন। রাতে কর্তার নাইট ডিউটি: গিন্নি তাড়াতাড়ি তাঁকে রেঁধে খাইয়ে, বই-বাক্সে রাতের টিফিন ভরে রওনা করিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে লাটুবাবু ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলেন। কে জানে বাড়ি ফিরে কি

সর্বনাশ দেখবেন। কড়া নাড়তেই হাসিমুখে গিন্নি দরজা খুলে দিলেন।

"এসো, এসো, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে খেতে বস। আমি ডবল ডিমের মামলেট ভাজছি।"

খেতে খেতে লাটুবাবু ইদিক-উদিক তাকাচ্ছেন। কই, না-তো, অস্বাভাবিক কিছু তো চোখে পড়ছে না, সবই তো যেমন হওয়া উচিত তেমনি। গিন্নির বাবা ছিলেন বিখ্যাত কুস্তিগীর, তাঁর নিজের আখড়া ছিল, সেখানে ছেলেরা মুগুর ভাঁজত। তাঁর একটা বড় আদরের কাঁঠাল কাঠের মুগুর-ও ছিল। গিন্নি সেটিকে একটা বেশ দর্শনীয় স্থানে সাজিয়ে রেখেছেন।

এমন সময় গিন্নিরও সেদিকে চোখ পড়াতে, তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা। বলতেই ভুলে গেছিলাম, কাল রাতে এক ব্যাটা চোর এসেছিল, বুঝলে? রান্নাঘরে বাসনের বাক্স থেকে বাসন বের করে তাকে সাজাচ্ছি, দেখি এক ব্যাটা গুটি গুটি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। পকেট থেকে খানিকটা দড়ি ঝুলছে। সব দরজা-জানলা বন্ধ, কোথা দিয়ে যে সেঁদুল বুঝলাম না। তা সে তো উপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু আমিও বিষ্টু গোঁসাই-এর মেয়ে, আমিও কিছু কম যাই না। বাসনের বাক্স থেকে মুগুরটা নিয়ে চুপি চুপি পেছন থেকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি তার ঘাড়ে! কি সব মেখেটেখে এসেছিল, কেমন হাত থেকে পেছলে পেছলে যাচ্ছিল। আমিও ছাড়বার বাঁদী নই। মুগুর দিয়ে আগা-পাশ-তলা এমনি পেটনাই দিলাম যে বোধ হয় ব্যাটাচ্ছেলের নাকটাই ভেঙে গেছল। শেষে নাকী সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল, "যাঁচ্ছি যাঁচ্ছি যাঁচ্ছি, ওঁ বাঁবা গোঁ! ছাঁড়ান দিঁন! ছাঁড়ান দিঁন! এঁই আঁমি কঁথা দিঁচ্ছি আঁর কঁখনো এঁ-বাঁড়িতে আঁসব না!" তাম্পর সুড়ুৎ করে কেমন করে যে সট্‌কান দিল তাও ভেবে পেলাম না। অনেক খুঁজেও আর দেখতে পেলাম না। দরজা-জানলা তো যেমন বন্ধ তেমনি বন্ধ—"

এদ্দুর শুনে আঁক্—আঁক্ শব্দ করে লাটুবাবু হাত পা এলিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুখে অনেক জলের ঝাপটা দিতে তবে সুস্থ হলেন।

ব্যাপারটার শেষটা কিন্তু ভালো। ওঁরা ঐ বাড়িতে প্রথমে ৭ দিন, তারপর ৬ মাস বিনি ভাড়ায় থাকবার পর, খুব কম ভাড়ায় আরো ৬ মাস থেকে, এখন সস্তা দরে বাড়ি-খানা কিনে সেখানে দিব্যি বসবাস করছেন। এক দিকে ধানক্ষেত, অন্য দিকে বিস্কুট কারখানার নিরেট দেওয়াল। পাড়াপড়শীর বালাই নেই।

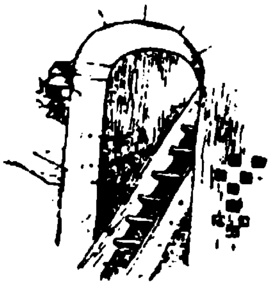

কলম সরদার

আমার ছোট ঠাকুরদা একদিন বললেন, ভূতফূত কিছু না। কেন যে পাঁচির মা রাতে ছাদে গিয়ে কালো কুকুরকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ভয় পেল এ আমি ভেবে পেলাম না। ভূত আবার কি?

বুঝলি, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে কলকাতা শহর ভোঁ-ভোঁ। রাতে পাড়ার মধ্যেও থমথম করে। বাড়িতে থাকলে বাইরে যেতে ভয় করে, বাইরে থাকলে অন্ধকারে খালি বাড়িতে ঢুকতে ভয় করে। ভয়টা শুধু জাপানী বোমার ভয় নয়। চুরি-ডাকাতি, নিখোঁজ হওয়া, সব রকম। ভয় ছিল লোকের। খানিকটা সত্যি, খানিকটা মন-গড়া।

সে একদিন গেছে। পাছে শত্রুদের বোমারু আলো দেখতে পেলে ঠিক জায়গাটিতে বোমা ফেলে, তাই আলো দেখানো বারণ ছিল। আলো দেখালে পুলিসে ধরত। সবার জানালা-দরজা বন্ধ, মোটা কালো পরদা দিয়ে ঘেরা, আলোর চারদিকে কালো কাগজের ঘেরাটোপ। শুধু বাতির তলায় একটুখানি আলো পড়ে, বাকি সব অন্ধকার। পড়াশুনো কাজকর্ম সকলের মাথায় উঠেছিল। রাত আটটার পর বাইরে বেরুতে হলে পারমিট দরকার হত।

তবে আমার কথা আলাদা। আমি নতুন পুলিসে ঢুকেছি, আমাদের সুদ্ধ মিলিটারি বানিয়ে দিয়েছে। জানিস্ নিশ্চয়, যারা নতুন পুলিসে চাকরি নেয়, তাদের দিয়েই সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ করানো হয়। কারণ দক্ষ দু'দে লোক মরে গেলে বেশি ক্ষতি হয়।

সে যাই হোক, আমার উপর চব্বিশ ঘণ্টা কালীঘাটে খানা-তল্লাসীর ডিউটি পড়ল। কুখ্যাত চোর-গুণ্ডা কলম সরদারকে খুঁজে বের করতে হবে। মেলা সোনাদানা নিয়ে সে ফেরারী হয়েছে, অথচ পুলিসের খবর যে সে শহরের মধ্যেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। সম্ভবতঃ কালীঘাটে কি খিদিরপুরে, কি চেতলায়। এমনিতেই কলমের পিছু নেওয়া মানে প্রাণটি হাতে নিয়ে বেরুনো। তার উপর খাঁ-খাঁ খালি, কালীঘাট মানেই ভূতের হাট। সত্যি কথা বলতে কি আমি খুব সাহসীও ছিলাম না তখন। সঙ্গে একটা লোক পর্যন্ত দেয়নি আপিস থেকে।

সুখের বিষয় কলমের মোটা বেঁটে কদমছাঁট চুলওয়ালা চেহারা দূর থেকেও চেনা যেত, সাবধানও হওয়া যেত, বামাল ধরতে পারলে এখুনি প্রমোশন, নচেৎ—এই অবধি—বলে আমাদের বড়সায়েব আমার দিকে একবার তাকিয়ে এক দাঁত কিড়মিড়ি করলেন। আমি জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললাম—হ্যাঁ স্যার, ধরে আনছি স্যার। বড়সায়েব আমাকে তিন দিন সময় দিলেন।

আসলে কালীঘাটে তদন্ত করতে আমার খুব বেশি আপত্তি ছিল না। ঐখানে খালের ধারে আমার বন্ধু জগার বাড়ি। বাড়ির বাকি সবাই ঘাটশীলায় ; ছিল শুধু জগা আর তার রাঁধুনে বামুন শঙ্কর, যার রান্না একবার খেলে আর ভোলা যায় না। ঠিক করলাম ওদের বাড়িটাকেই তদন্তের হেড্‌কোয়ার্টারস্ করতে হবে। কলমকে সঙ্গে না নিয়ে আর

আপিসমুখো হওয়া নয়।

পথের আলোয় ঘেরাটোপ দেওয়া, কিছুই দেখা যায় না। প্রায় অনেকটা আন্দাজে তদন্ত চলল। তবে কলম নিজেও নিশ্চয় ভারি নিরাপদ মনে করে খানিকটা অসাবধান হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া আমিও একরকম অদৃশ্যভাবেই চলাফেরা করতাম। আগাগোড়া কালো পোশাক, পায়ে কালো রবারের জুতো, মাথায় তখন কালো কুচকুচে চুলও ছিল। জুতোর জন্যে প্রায় নিঃশব্দে চলি। রাত হয়তো একটা হবে, রাস্তার মিটমিটে আলোয় চমকে দেখি আমার হাত পাঁচেক সামনে যে হনহনিয়ে চলেছে সে যে কলম সরদার, সে বিষয়ে কোনো ভুল হতে পারে না।

সামনেই প্রকাণ্ড পুরোনো বট-অশ্বত্থে ছাওয়া আমলা-বাড়ি। পঞ্চাশ-ষাট বছর সেখানে কাউকে বাস করতে দেখা যায়নি। জগা বলে—বাড়িটার বড় বদনাম, দিনের বেলাতেও কেউ সেখানে যায় না। কলম দেখলাম স্বচ্ছন্দে তার ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বলা বাহুল্য আমিও ঢুকলাম। ঘাস-গজানো খানিকটা কাঁকরের পথ, তারপরেই নড়বড়ে গাড়িবারান্দা দেওয়া বিশাল বাড়ি। সেদিকে তাকালে গা শিরশির করে।

মধুমালতীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, কলম পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ আর লম্বা চাবি বের করে, সদর দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে ঢুকে পড়ল, দরজাটা আধ-ভেজানো রইল। বেজায় ঘাবড়িয়ে গেলাম। টর্চ জ্বাললেই ও দেখতে পাবে। না জ্বেললেই বা যাই কি করে, এদিকে হাত-পা তো পেটের মধ্যে সেঁদিয়েছে। ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় কাঁধের কাছে থেকে কে যেন বলল, "কি মুস্কিল, এটা কি থামবার সময় হল? সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়তে হয়, নইলে কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দেবে আর ধরতে পারবে না। তারপর বড়সায়েব যখন—"

আঁৎকে উঠলাম, ব্যাটা এত কথা জানল কি করে? নিশ্চয় স্টোফানো সাহেব আমাকে অবিশ্বাস করে আমার উপর চোখ রাখার জন্যে গুপ্ত-গোয়েন্দা লাগিয়েছে। যত না রাগ হল, তার চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, ভূতের বাড়িতে তাহলে একা ঢুকতে হবে না! সে বললে, "আবার কি হল? চল, চল, এক মিনিটও নষ্ট করার নয়। আমার পিছন পিছন এসো।"

একরকম বাধ্য হয়েই ঢুকে পড়লাম। ভীষণ অন্ধকার। কলম নিজেকে নিরাপদ ভেবে বেশ দুমদাম শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তিনতলায় তার টর্চের আলো দেখতে পেলাম। লোকটা বলল, "এই রে, ছাদের নিচের চোরা-কুঠরিতে সেঁদিয়েছে। তা যাক। সিঁড়িটা না তুললেই হল।" ঠুক করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ, তারপর চুপচাপ, ঘুটঘুটে অন্ধকার।

লোকটা বলল, "তোমার সঙ্গে আলো নেই?" এবার নিশ্চিন্তে টর্চ জ্বাললাম। যতটা সম্ভব ভালো করে গুপ্তগোয়েন্দাকে দেখে নিলাম। কালো তাল ঢ্যাঙ্গা, কপালের মাঝখানে তিলকের মতো কাটা দাগ; পরনে পরিষ্কার সাদা ফতুয়া, ধুতি, গলায় পৈতে, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। বাড়িময় তিন ইঞ্চি পুরো ধুলো জমেছে, তাই লোকটার চটির শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না।

ধুলোর নীচে মনে হল মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। নিঃশব্দে তিনতলায় উঠলাম। লোকটা আমাকে হলঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাদের কড়িকাঠে ঠেকানো লম্বা একটা কাঠের মই দেখিয়ে দিল। ছাদটা প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচুতে হবে।

লোকটা বলল, "মইয়ের মাথায় ঐ চোরা-কুঠরি। ভালো করে দেখ ঐখানে গোল ঢাকনির মতো দরজা ছাড়া আর পথ নেই। তবে ঘুলঘুলি দিয়ে হাওয়া ঢোকে, দম আটকেও মরে যাবে না। চটপট সিঁড়ি বেয়ে ওঠ দিকিনি। কড়িকাঠের আড়ালে হুড়কো

আছে। ওটি টেনে দিলেই খাঁচা বন্ধ। তারপর থানা থেকে লোকজন বন্দুক এনে ধরে ফেললেই হল।"

আমি বললাম, "বড্ড উঁচু যে। ইয়ে আপনার সব চেনা জানা, আপনি উঠলেই ভাল হত না?" লোকটা মুখ চেপে হাসতে লাগল। "কি যে বল! আমি উঠব ঐ সিঁড়ি বেয়ে, তবেই হয়েছে! নাও, নাও, উঠে পড়, শেষটা বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে।"

সত্যিই উঠলাম, হুড়কোও টানলাম, সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে চোরা দরজার উপর ভারী কিছু পড়ল। ভয় পেলাম, "ভাঙবে না তো?"

"আরে না, না, লোহার তৈরি। এবার নেমে এসে সিঁড়িটা নিয়ে নিচে চল। পঁচিশ ফুট উঁচুতে থাকুন বাছাধন!"

মই কাঁধে তার সঙ্গে একতলায় এসে সিঁড়ির পিছনে মই রাখলাম। তারপর সদর দরজা দিয়ে বাইরের আবছা অন্ধকারে এলাম। লোকটাও বেরিয়ে এসে, দরজাটাকে ঠেসে ভেজিয়ে দিল। তারপর বলল, "চল থানার দিকে এগুনো যাক।"

আমি বললাম, "আচ্ছা স্যার, চোরা-কুঠরির কথা জানলেন কি করে? এখানে আরো এসেছেন নাকি?" সে খুব হাসল। "আসিনি আবার! হাজারবার এসেছি। তোমার সাহায্য ছাড়া ব্যাটাকে ধরতে পারছিলাম না। এবার বুঝুক ঠেলা!"

"কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনিও কি পুলিসের গুপ্ত গোয়েন্দা?"

সে বেজায় রেগে গেল। "গুপ্ত-গোয়েন্দা? আরে ছো ছো! আমি সর্বদা পুলিস-ফুলিস এড়িয়ে চলি। ফুলিস বললাম বলে আবার চটে যেও না যেন। তুমি কিন্তু বেশ চালাক?"

একটু খুসি না হয়ে পারলাম না। "তবে কি কলম আপনার জিনিসই সরিয়েছে নাকি? নাকি আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

ততক্ষণে থানায় পেঁছে গেছি আমরা। লোকটি বলল, "মোটেই না। ব্যাটাচ্ছেলে কাগজ না কলম সে খবরও রাখি না, আর লোকে যদি নিজেদের জিনিস নিজেরা রক্ষা করতে না পারে, তাহলে নিলে আমার কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের বোষ্টম-বাড়িতে দুবেলা মটন চপ আর পাঁঠার ঘুগনি সাঁটাবে, এ আমার সহ্যের বাইরে।"

এই বলে লোকটা আমার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; থানার ক্ষীণ আলোয় স্পষ্ট দেখলাম। আমিও ঝুপ করে মূর্ছা গেলাম। পরে শুনলাম বামাল কলম গ্রেপ্তার।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে ধরলেন? আমি তো কিছু না বলেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম।" থানার ও-সি বললেন, "কেন, আপনাকে পড়ে যেতে দেখে কে একজন লম্বা কালো ভদ্রলোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সব কথা বললেন। আমাদের লোকও তখুনি বেরিয়ে গেল। বেশ মজার ভদ্রলোক, আপনার যথেষ্ট যত্ন হচ্ছে না বলে খুব রাগ দেখালেন। বললেন, 'ষাট বছর আগে হলে এরকম অযত্ন হত না।' ওই বলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন, আর কাউকে দেখতে পেলাম না।"

দরজার কাছ থেকে থানার বুড়ো চৌকিদার বলে উঠল, "দেখবেন কাকে স্যার? ও কি দেখার মানুষ? পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ভূতের বাড়ি আগলাচ্ছে, ও কি যে-সে নাকি? কপালে একটা কাটার দাগ ছিল তো?"

আমি বললাম, "ছিল, ছিল!" বলে আবার প্রায় মূর্ছা যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার খাবার এল।

কর্তাদাদার কেরদানি

ছোটবেলা থেকে আমার মেজো কর্তাদাদামশায়ের গুণগান শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। ছুটি-ছাটাতে যখনি ডায়মণ্ডহারবারে বাবাদের বিশাল পৈতৃক বাড়িতে যেতাম বুড়ো-ঠাকুমা, ঠাকুমা আর মা-পিসিমাদের মুখে মেজো কর্তাদাদামশায়ের প্রশংসা আর ধরত না। ঐ অত বড় বাড়ি, বাড়ি ভর্তি কালো কালো কাঠের বিশাল বিশাল আসবাব, দেয়াল জোড়া চটা-ওঠা গিল্‌টি ফ্রেমের বিরাট আয়না, একশো বিঘে জমি, তার মধ্যে পাঁচটা কালো জলে ভরা প্রকাণ্ড পুকুর, তাতে মাছ কিল্‌বিল্‌ করত, আম-কাঁঠালের বন, নারকেল বাগান, বাঁশ-বন, সবই ছিল যেন সোনার খনি আর সবই নাকি হয়েছিল ঐ মেজো কর্তাদাদামশায়ের দয়ায়। প্রশংসা করবে না কেন লোকে? ছেলেপুলে ছিল না যে ভাগ বসাবে। বিয়েই করেননি যে শ্বশুর বাড়ির লোকরা এসে হাঙ্গামা বাধাবে। তিন পুরুষ ধরে সবাই মিলে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে, ছাপর খাটে অষ্টপ্রহর হাত-পা মেলে, কেবল খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে আর লোহার সিন্দুক থেকে নগদ টাকা বের করে নিয়ে খরচ করেছে।

অবিশ্যি এক পুরুষ পেরোবার আগেই লোহার সিন্দুকের টাকাকড়ি চাঁচাপোঁছা, তখন আরো লোহার সিন্দুক থেকে গয়নাগাঁটিগুলো বের করে ওয়ারিশদের মধ্যে পঞ্চায়েতের মোড়ল এসে সমান-সমান ভাগ করে দিয়ে গেল। তবু কি আর সবাই খুশি হল। আমাদের বুড়ো-ঠাকুমা বলতেন কিন্তু ঐ থেকেই কান্তি মোড়লের আত্মার সদ্গতিও হয়ে গেছিল। কারণ ঐ গয়নার ডাঁই দেখে অবধি তার চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছিল। তা ছাড়া কোনো কোনো ছোকরা ওয়ারিশ ভাগাভাগিতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাঁশ-পেটা করে বুড়োকে গাঁ ছাড়া করবে বলেও হয়তো ভয় দেখিয়ে থাকবে। মোট কথা শেষপর্যন্ত সে বিষয়-আশয় ছেলেপুলেদের বুঝিয়ে দিয়ে লোটা-কম্বল ও গিন্নিকে নিয়ে কাশীবাসী হয়েছিল। বলা বাহুল্য সেখানে কিছু পয়সাকড়ি ও গঙ্গাতীরে ছোট একটা বাড়ি আগে থাকতেই ব্যবস্থা করা ছিল।

সে যাই হোক গে, গয়নাগাঁটিও কারো চিরকাল থাকে না। শেষে এমন দিন এল যখন একটা একটা করে সেগুলো বেচে বেচে, আর কিছু অবশিষ্ট হইল না! তখন ফলের বাগান, পুকুরের মাছ জমা দেওয়া ছাড়া গতি রইল না! তার পর সেগুলোকেও একে একে বেচে দিতে হল। মোট কথা আমরা যখন ছোটবেলায় ছুটি-ছাটাতে ডায়মণ্ডহারবার যেতাম তখন দেখতাম আমাদের বলতে আছে শুধু বিশাল এক পোড়ো বাড়ি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কালো হয়ে যাওয়া খাট আলমারি, যা কেউ কিনতে তো রাজী হয়ই না, দিতে চাইলেও নিতে চায় না, কারণ কারো দরজা দিয়ে ও-সব ঢুকবে না।

আর ছিল দেয়াল জোড়া রঙচটা আয়না, যাতে মুখ দেখে কার সাধ্যি, আর একটা পুকুর, তাও শ্যাওলাতে ঢাকা, কিন্তু নাকি হাঙরের মতো বড়-বড় মাছে ভরা। আর ছিল বিশাল পোড়ো বাড়িটাকে ঘিরে শতখানেক আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাতাবিলেবু, তেঁতুল, নারকেল, জামরুলের গাছ আর আগাছায় ভরা বিঘে পাঁচেক জমি। সেগুলো

নাকি এমনিভাবে দলিল দিয়ে লেখাপড়া করা যে কোনোকালে কেউ বেচতে পারবে না। বুড়ো-ঠাকুমার মুখে শুনেছি, তা না হলে ওগুলোরও ল্যাজের ডগা বাকি থাকত না। অথচ মেজো কর্তাদাদামশাই নাকি মহা পাজি ছিলেন। পড়াশুনোর নাম নেই ; দিনরাত পাড়ার যত ডানপিটে বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছোকরা জুটিয়ে, আজ এর পুকুরে মাছ মারা, কাল ওর আম বাগান সাফাই করা আর যেখানে যত কুস্তির আখড়া আর গান-কেত্তন, যাত্রা-নাটকের আস্তানায় গিয়ে পাল্লা দেওয়া। তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন ওদের দলকে দল নিখোঁজ হয়ে গেল। দুদিন একটু সোরগোল, মা-ঠাকুমাদের অল্প একটু আপসোস, তার পর গাঁয়ে এমনি গভীর শান্তি বিরাজ করতে লাগল যে শোক-দুঃখ ভুলে দুবেলা সবাই শিবঠাকুরকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ জানাত।

গাঁয়ের দেবতা বুড়ো-শিবতলার শিবঠাকুর। সেকালে প্রতি বছর পুজোর সময় ঘটা করে শিবতলায় আলাদা করে ঐ শিবঠাকুরের পুজো হত। 'শিবঠাকুরের বিয়ে' নাটক হত। গাঁয়ের মাতব্বররা অভিনয় করতেন। তাই নিয়ে মেজো কর্তাদাদামশাইয়ের কি রাগ। নারদের পার্ট কখনো ঐ আধবুড়োরা করতে পারে নাকি? নারদ সাজত কান্তি মোড়লের ঠাকুরদা জগা মোড়ল। সে কি নাচতে পারে, না গাইতে পারে? নারদে চেহারা ছিল একটারও? মোটকথা মেজো কর্তাদাদামশায়ের নারদ সাজার বড় সখ ছিল। তিনি ফেরারি হবার পর তাই নিয়ে দু-চারজনাকে আক্ষেপ করতেও শোনা যেত। নাকি অদ্ভুত ভালো অভিনয় করতে পারতেন। চমৎকার দেখতে ছিলেন, খাসা গানের গলা ছিল আর নাচতেন যেন কার্তিকের ময়ূরটি। বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, মেজো কর্তাদাদামশাইয়ের কথা লোকে একরকম ভুলেই গেল। তাঁর কপালের মাঝখানে যে তৃতীয় নেত্রের মতো একটা বড় তিল জ্বলজ্বল্ করত তা পর্যন্ত কারো মনে রইল না। তার মধ্যে আমাদের বাড়ির অবস্থা ক্রমে পড়তে পড়তে আর কিছুই রইল না। ঐ যে কান্তি মোড়লের কথা বললাম, তার ঠাকুরদা জগা মোড়লের তখন তেজারতি ব্যবসার ভারি বোলবোলা। আমাদের বাড়ির অর্ধেক জিনিসপত্র তারই কাছে বাঁধা দেওয়া, মায় আমাদের ও গ্রামের অর্ধেক লোকের জমিজমার দলিলপত্র সুদ্ধ। থেকে থেকে জগা বুড়ো ভয় দেখাত, টাকা শোধ না করলে সম্পত্তি অধিকার করবে।

এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, একদিন পুজোর সময় 'শিবঠাকুরের বিয়ে' নাটক দেখতে সকলে ব্যস্ত, এমন সময় জগা মোড়লের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। তারা সিন্দুক ভেঙে গয়নাগাঁটি, আর তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, ইষ্টিলের ক্যাশ বাক্স বোঝাই বন্ধকী দলিলপত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। আর কোনোদিনও তাদের টিকিটিও দেখা গেল না। জগা সেই যে শয্যা নিল, আর উঠল না। কিন্তু গ্রাম সুদ্ধ সবাই বুড়ো শিব-ঠাকুরকে বিশেষ পুজো দিয়ে এল। আমাদের সকলের জমিজমা বেঁচে গেল। ও-সব যে বাঁধা দেওয়া জিনিস তার কোনো প্রমাণই রইল না।

আরো কয়েক বছর পরে ঘোড়ার ডাকে মাসে মাসে আমাদের গাঁয়ের ফেরারি ছেলেদের সবার বাড়িতে পয়সাকড়ি আসতে লাগল। একবার আমার বুড়ো-ঠাকুমার নামে এক ছড়া মুক্তোর মালা আর একটি চিঠি এল। তাতে লেখা মেজো কর্তাদাদামশাই জাহাজে নাবিক হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নৌকোডুবি হয়েছিলেন। কিন্তু রাখে হরি মারে কে, একটা ভাসমান নারকেল গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে জোয়ারের জলের সঙ্গে তিনি একটা নির্জন দ্বীপে গিয়ে পড়লেন। দ্বীপের উপকূলে ঝিনুকের ছড়াছড়ি। একেকটা খোলেন আর ভিতর থেকে এই বড় একটা করে মুক্তো বেরোয়। খিদের চোটে পোকাটাকে খেয়ে ফেলেন আর মুক্তোটিকে কোঁচড়ে বাঁধেন। এমনি করে দুটি বছর কাটাবার পর আরেকটা জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে। মুক্তোর কথা কাউকে বলেন নি। দেশেও ফেরেন নি। কিন্তু পুরোনো

বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে মুক্তো বেচার টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছেন। এর বেশি যেন কেউ আশা না করে। এখনো কি জগা মোড়ল নারদ সাজে? ইতি...

ঠাকুমা বললেন চিঠিটা যে জাল নয়, তার প্রমাণ চিঠির ঐ শেষের লাইনটি। নইলে, মেজো কর্তা কি আর লিখতে শিখেছিল যে অতবড় একখানা চিঠি ফাঁদবে। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছিল।

সেবার আমরা ঠিক করলাম 'শিবঠাকুরের বিয়ে' নাটক আমরা করব। হলদে হয়ে যাওয়া নাটকের পালার কপি খুঁজে বের করলেন ঠাকুমা। পোড়ো বাড়ির আগাছা কিছু পরিষ্কার হল, পুরোনো পুজোমণ্ডপ ঝাড়াঝোড়াই হল, সেখানে সেকালে যেমন হত, সেইভাবে নাটক করা হবে। তবে বুড়োদের অভিনয় করতে দেওয়া হবে না। অনেক বছর পরে আবার ঘটা করে শিবতলার বুড়োশিবের পুজো হচ্ছে, বুড়োরা সেটা হাতে নিক কিন্তু নাটক করব আমরা। অর্থাৎ ছেলে-ছোকরারা। মেয়েদের পার্টও ছেলেরা করবে। গানের দলে মেয়েরা থাকবে। পয়সাকড়ি আমরা জোগাড় করলাম, কাজেই কেউ আপত্তি করল না।

সবই হল, খালি নারদের পার্ট করার লোক পাওয়া গেল না। নাচবে, গাইবে, দেখতে ভালো হবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। শেষটা ঠাকুমাই বললেন, "আরে, আমার ভাগ্নী দুষ্টুর জামাই কৃষ্ণ কর কলকাতার নামকরা অভিনেতা। ওকে আনিয়ে নে না, যেমনি দেখতে তেমনি নাচে গায়। তোদের সবাইকে ওর পাশে এককেটা দাঁড়কাগের মত দেখাবে। বলিস তো আমিই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি।" দাঁড়কাগের কথাটাতে কেউ খুশি না হলেও, রাজী না হয়েও পারল না।

তাই ঠিক হয়ে গেল ; কৃষ্ণ কর নারদ সাজবে। তবে ব্যস্ত মানুষ, রিহার্সাল দিতে পারবে না। নাটকের এক কপি ওকে পাঠিয়ে দিলে, নিজেই তৈরি হয়ে নেবে। নাটকের দিন বঙ্কুদা ওকে গাড়ি করে নিয়ে আসবেন। আমবাগানের পিছনে বঙ্কুদাদের ছোট্ট অতিথিশালায় যেন ওর ড্রেস রেডি থাকে। ও সন্ধ্যার মধ্যে সাজ বদলে, নাটক শুরু হবার দশ মিনিট আগে মণ্ডপে উঠবে। কারো কারো একটু মন খুঁৎ খুঁৎ করলেও, বঙ্কুদা বললেন, "কৃষ্ণ করের কথার কখনো একচুল নড়ন-চড়ন হয় না।" তাইতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল।

ষষ্ঠীর আগে বুড়োশিবের মন্দিরে পুজো হল। ষষ্ঠীর দিন নাটক হল। নিজেদের প্রশংসা করা উচিত নয় জানি, তবু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হলাম যে অমন নাটক ইহলোকে খুব কম দেখা যায়। স্টেজ সাজানো, পার্ট মুখস্থ, ড্রেস্ পরা, সামিয়ানার নীচে লোক ধরে না। পুরোনো পুজোমণ্ডপ আমাদের বাড়ির লাগোয়া। গ্রীন রুমটা বাড়ির একতলার একটি ঘরে। তার একটা দরজা থেকে মণ্ডপে যাবার পথ, সেটা দরমা দিয়ে ঘেরা। আরেকটা দরজাও আছে, বাইরে থেকে যাওয়া আসার জন্য।

বিকেলেই বঙ্কুদা এসে জানিয়ে গেলেন, কৃষ্ণ কর এসে গেছেন। অতিথিশালায় বসে বঙ্কুদার সঙ্গে একবার মহড়াও দিয়েছেন। এখন বিশ্রাম করছেন, একেবারে সেজেগুজে স্টেজে উঠবেন। আমরা কেউ যেন ঝামেলা না করি। অনেকেই বলেছিল এ-সব চাল ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক অত নামকরা অভিনেতা বিনি পয়সায় অভিনয় করে যাচ্ছেন, সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

সন্ধ্যা এগিয়ে এল, সবাই রেডি। অথচ কৃষ্ণ করের দেখা নেই। আমার ভাই অমি বড্ড মোটা বলে তাকে কোনো পার্ট দেওয়া যায়নি। তার কাজ ছিল গ্রীন রুম আগলানো। শেষটা বঙ্কুদা তাকেই বললেন, "যা তো, একটু এগিয়ে দেখ। হয়তো অন্ধকারে আম-বাগানে পথ হারিয়েছে। যা জঙ্গল তোমাদের বাড়িতে। আমরা এদিকে শুরু করে দিচ্ছি!

প্রথম সীনে তো আর নারদ নেই।"

মণ্ডপের পেছনে প্যাঁ করে ক্ল্যারিয়োনেট বেজে উঠল, অমি আর আমি কৃষ্ণ করের খোঁজে বেরুলাম। বেশি দূর যেতেও হল না, আমরা গ্রীনরুমের দরজা খুলেই দেখি নারদের বেশে কৃষ্ণ কর সিঁড়ির ছোট ধাপটাতে দাঁড়িয়ে। কি ভালো দেখতে কি বলব। রঙ-টঙ মেখে মাথায় জটার ওপর জরির কাঁটা বেঁধে এমনি রূপ খুলেছিল যে সত্যিকার নারদ যদি একবার দেখতেন তো নিশ্চয় বলতে পারি হিংসায় জ্বলে যেতেন। সে কি রূপ! কপালে চিত্র করেছেন, সেটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। যাক সবাই নিশ্চিন্ত হল।

ততক্ষণে প্রথম সীন্‌ও শেষ হয়ে এসেছে, কৃষ্ণ করও আর বিলম্ব না করে মণ্ডপে উঠে পড়লেন। সে যে কি অদ্ভুত অভিনয়, যারা দেখেছিল সবাই একেবারে হাঁ! কৃষ্ণ কর নিজেও নাকি কখনো এত ভালো অভিনয় করেননি। সীনের পর সীন হয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণ করের দেখাদেখি অন্য সকলেও বেজায় ভালো অভিনয় করতে লাগল। ইন্দ্রজালের মতো নাটক চলতে লাগল। দ্বিতীয় অঙ্কের পর আর নারদের পার্ট ছিল না। তাঁর শেষ সীন্‌টি এবার শুরু হবে, এমন সময় কৃষ্ণ কর অমিকে কানে কানে বললেন, "পেছনের দরজায় আমার শত্রু এসেছে। যেমন করে পার ঠেকাও, আমার পালাটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত—তার পর যা হয় হোক।" এই বলে তিনি মণ্ডপে উঠে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে যাবার ছোট দরজাতে আস্তে আস্তে কে টোকা দিতে লাগল। আমরা কেউ কান দিলাম না। অমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কাকে যেন এক ধমক দিয়ে, আবার এসে বসল। জিজ্ঞাসা করাতে বলল, "ঢং করার জায়গা পায়নি, ব্যাটা, কলাপাতা জড়িয়ে সঙ সেজে, ভয় দেখাবার তালে আছে।" আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লোকটার দেখা পেলাম না।

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কর বিপুল হাততালিতে কানে তালা লাগিয়ে গ্রীনরুমে এসে অমিকে বললেন, "বাঃ ব্যাটাকে খুব ঠেকিয়েছ দেখছি। তোমার জন্য কি করতে পারি বল দিদিমণি? বড় আনন্দ দিয়েছ। আচ্ছা, পুকুরটাকে সাফ করিয়ে একটু জল ছেঁচে ফেলার ব্যবস্থা কোরো।" এই বলে দরজাটা একটু ফাঁক করে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে শত্রু আছে বলে এতটুকু ভয় দেখলাম না।

অভিনয় শেষ হয়ে গেল। সবাই কৃষ্ণ করকে খুঁজতে লাগল। অথচ তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বঙ্কুদারা কয়েকজন শেষপর্যন্ত আমবাগানের অতিথিশালায় গিয়ে হাজির হলেন। দেখেন বাইরে থেকে তালা দেওয়া, যেমন কৃষ্ণ করকে বলে দেওয়া হয়েছিল। সবাই অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "কে? কে? ওটা কে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে?"

সবাই মিলে তাকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে আলোর সামনে আনতেই দেখা গেল কিম্ভূতকিমাকার এক মূর্তি, পরনে কলাপাতা ছাড়া আর কিছু নেই, চোখে মুখে প্রচুর মেক্‌-আপ লেপটে রয়েছে। বঙ্কুদাকে দেখেই সে তাঁকে জাপটে ধরে বলল, "দাদা, এই বিপদে ফেলবার জন্যই কি আমাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন?"

বঙ্কুদার দু চোখ কপালে উঠে গেল। "সেকি! কেষ্ট, তুমি? তবে কে অভিনয় করে গেল?" লোকটা হতাশভাবে মাথা নাড়ল। "তা তো জানি না, আমবাগানের সব চেয়ে অন্ধকার জায়গায় ড্রেস্‌-ট্রেস পরে যেই পৌঁচেছি অমনি বাঘের মতো আমার ঘাড়ের উপর পড়ল। কোনো কথা বলল না, খালি আমার ড্রেস্‌ খুলে নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কি করি, সেই ইস্তক কলাপাতা জড়িয়ে বেড়াচ্ছি—এটা কি খুব ভালো কাজ হল?"

বঙ্কুদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "কি আশ্চর্য, না হয় কলাপাতা পরেই গ্রীন-

রুমে যেতে। দরজাটা তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম।"

"গেছিলাম। কিন্তু একজন ষণ্ডামতো ভদ্রলোক এমন তেড়ে এলেন যে পালাবার পথ পাই নে।"

"আহা, এখানে ফিরে এসেও তো অন্য কাপড় পরে গিয়ে আমাদের খবর দিতে পারতে। জাল নারদকে তা হলে ধরা যেত।"

"কী করে ঢুকব! দরজায় তালা দেওয়া, চাবিটা পাছে হারায় বলে মাথার ফাট্টার সঙ্গে সেপ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা। মাথার ফাট্টা তো তার মাথায়।"

সত্যি বলব কি, সবাই তাজ্জব বনে গেল। গোরুখোঁজা করেও সে লোকটাকে পাওয়া গেল না। ড্রেস্‌ সুদ্ধু একেবারে হাওয়া। শেষ পর্যন্ত তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে সবাই একেবারে থ'। ঘরের মেজেতে নারদের ড্রেস্‌ পড়ে আছে, যেন কেউ এইমাত্র ছেড়ে গেছে। মাথার জরির ফাট্টার সঙ্গে চাবিটা সেপ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা। অথচ দরজাটা বাইরে থেকে যেমন তালাবন্ধ করা হয়েছিল, তেমনি ছিল।

অনেক কষ্টে সেদিন কৃষ্ণ করকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল। ঠাকুমা নিজে এসে তার পায়ে ধরাতে তবে তার রাগ পড়েছিল। পরদিন লোক ডেকে পুকুর ছাঁচা হল ; কি জানি জলে ডুবে-টুবে গিয়ে থাকে যদি। কিছু উঠল না, শুধু রাশি রাশি মাছ আর কচ্ছপ, শ্যাওলা আর কয়েকটা সেকালের ঘটি ঘড়া আর ইস্টিলের একটা মকরের নকশা দেওয়া ক্যাশবাক্স। শ্যাওলা জমে তার দফা শেষ। ঢাকনা খুলতেই ভিতর থেকে কতকগুলো কাগজপত্র আর একটা হীরের কণ্ঠি মাটিতে পড়ল।

তাই দেখে আমার বুড়ো-ঠাকুমা বলে উঠলেন, "আরে, এ যে বুড়োশিবতলার শিব-ঠাকুরের হারানো গলার কণ্ঠি। আমার শাশুড়ি বলতেন পুরুতঠাকুর ওটাকে সরিয়ে জগা মোড়লের কাছে বন্ধক দিয়ে গাঁজার পয়সা জোগাড় করেছিল।"

তখন সকলের খেয়াল হল। কে যেন বলল, "তাইতো, তাইতো, এই ভাঙা ক্যাশবাক্সটাও তবে বুড়োর সেই দলিলপত্রের হারানো ক্যাশবাক্স। তার উপরেও তো এইরকম মকর নকশা তোলা ছিল বলে শোনা যায়। আর ঐ পচা-ধচাগুলো তা হলে কি"—অমনি পাঁচজনে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল, "দূর, দূর, বাজে বকিস নে। আমাদের দলিল-টলিল ঠিক আছে।"

হীরের কণ্ঠিটাকে শুদ্ধি করে নিয়ে আবার শিবঠাকুরের মাথায় পরানো হল। সেই উপলক্ষে রাতে আমার ঠাকুমা সবাইকে খুব মাছ কচ্ছপ খাওয়ালেন। শোবার আগে বার বার বলতে লাগলেন, "যাক্‌ যেখানকার যা সব ভালোভাবে শেষ হল। শিবঠাকুর তাঁর কণ্ঠি ফিরে পেলেন।"

বুড়ো-ঠাকুমা ফিক্‌ করে হেসে বললেন, "আর মেজো কর্তাদাদামশায়ের নারদ সাজার সখও মিটল। ওর কাছে কৃষ্ণ কর! কিসে আর কিসে, সোনায় আর সীসে! কপালের মধ্যিখানে কালো কুচ্‌কুচে তৃতীয় নেত্রটি দেখেই আমি তাঁকে ঠিক চিনে ফেলেছি।"

তাই-না শুনে তিন-চার জন ধুপ্‌ধাপ্‌ মুচ্ছো গেল।

আকাশ পিদ্দিম

আকাশ পিদ্দিমটা জেবলে কাচের ডোমে পুরে বাঁশের ডগায় তুলতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। এ-পাড়ায় থেকে থেকেই বিজলি বন্ধ, কাজেই ছাদটা দিব্যি ঘুটঘুটে। চিলেকোঠার দোর অবধিও পেঁছয় নি, পেছন থেকে খোনা গলায় কে ডাকল, "এ্যাই।" ফিরে দেখি পাশের বাড়ির ছাদে থুখ্থুড়ে এক বুড়ি। মাথা থেকে পা অবধি সাদা কাপড়ে ঢাকা।

গুপে বলল, "আমাদের বলছেন?"

বুড়ি চটে গেল, "তোদের ব'লব না তো কাকে ব'লব রে ছোঁড়া? তোঁরা ছাঁড়া এ'খানে আঁছেটা কে'? তাঁ ছাড়া তোঁরাই তো আ'লো দি'লি।"

বঙ্কু বলল, "ইয়ে মানে ঠাকুমা বললেন সারা আশ্বিন মাস আলো দেখাতে হয়, তা হলে দেবতাদের নেমে আসতে সুবিধা হয়।"

"ও তাই বুঝি? তা আঁমিই বা দে'বতাদের চে'য়ে ক'ম কি'সে শুনি? ওরা ব'র দে'বে এ'ই তালে আঁছিস তো'? আঁমিও তো আঁলো দেখেই নেমেছি। অ'বিশ্যি দে'খছি ভুল ছাদে নে'মেছি, তাঁতে কি হ'য়েছে রে? তোঁরা তো তি'নটে অ'ঙ্ক দিলে দু'টো ভুল ক'রিস। এ'খন বাজে ক'থা রে'খে, কি' ব'র চাঁস ব'ল। নে, নে, তাড়াতাড়ি ক'র, আঁমার ঢে'র কাজ।

গুপে, বঙ্কু, তোতা তাই শুনে হাঁ। তার পর গুপে বলল, "আমি দুটো স্টিলের পেনসিল-কাটা চাই।"

বঙ্কু বলল, "আমি একটা ভালো ডট্‌পেন আর ছটা রিফিল চাই।"

সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ি কোঁচড় থেকে দুটো স্টিলের পেনসিল-কাটা আর একটা ডট্‌পেন, আর ছটা রিফিল বের করে দিয়ে বলল, "নে, আঁলগোছে ধ'র, তোঁদের ছুঁলে আঁমাকে নাইতে হ'বে। ব'লিহারি, তোঁদের প'ছন্দ এ'ইজন্য শূ'ন্যি থে'কে আমায় নাবানো! এ' তো ম'টুর দোকান থেকে যে' কোনো স'ময় তু'লে আঁনতে পারিতিস। আঁমিও তাই এ'নেছি এ'কটা ভালো ব'রও চাইতে জানিস না, স্টুপিড!"

তার পর তোতার দিকে ফিরে বলল, "ব'লি, ছোট খোকা, তু'মিই বা কে'ন চুপ? ওঁদের মতো এ'কটা কি'ছু চাও।"

তোতা বলল, "বেশ, আমি আলাদীনের প্রদীপ চাই।"

বুড়ি ভয়ঙ্কর চটে গেল। "তোঁ-তোঁ-তোঁ—চালাকি নাকি—আর কি'ছু চা!"

তোতা বলল, "থাক্‌ তা হলে, কিছু দিতে হবে না! বুড়ি চোখ পাকিয়ে বলল, "দি'তে হবে না আবার কি? দে'বতারা দি'তে পারে আর আঁমি পারি না? ঐ দ্যাখ, পি'দ্দিমের ন'ীচে!"

ওরা তাকিয়ে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে পিদ্দিমের বাঁশ বেয়ে সড়্‌সড়্‌ করে নীচে নেমে এল একটা টিনের টেমি বাতি। দেশের বাড়ির রান্নাঘরে যেমনি জ্বালায়, ঠিক তেমনি।

ঠং করে মাটিতে পড়তেই তোতা তুলে নিয়ে, ফিরে দেখে বুড়ি তখন অন্তর্ধান করেছে।

চিলেকোঠার আলোয় দেখা গেল পুরোনো লম্প, ঝুলকালি মাখা, কার রান্নাঘরে ব্যবহার হত কে জানে। তোতা সেটার গায়ে আঙুল ঘষতেই হুপ্ করে খানিকটা আলো জ্বলে উঠল আর একটা বেঁটে বামুন দেখা দিয়ে বলল, "কি চাই মাস্টার?"

তোতা অমনি বলল, "গুপেদার চেয়ে আরো বড় চারটে স্টিলের পেনসিল-কাটা, দুটো আরো ভালো ডট্‌পেন, আরো বারোটা রিফিল।"

বেঁটে বামুন পকেট থেকে চারটে বড় স্টিলের পেনসিল-কাটা, দুটো ভালো ডট্‌পেন আর বারোটা রিফিল বের করে তোতার সামনে মাটিতে ফেলে দিল। তোতা যেই-না নিচু হয়ে সেগুলো তুলতে যাবে, অমনি বেঁটে বামুন বলল, "একটা ভালো বরও চাইতে পারিস না, তুই এটার যোগ্য নোস!" এই বলে টেমিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্তর্ধান করল।

ওরা সখের জিনিসগুলি পকেটে পুরে গুটি গুটি নেমে এল, কাউকে কিছু বলল না।

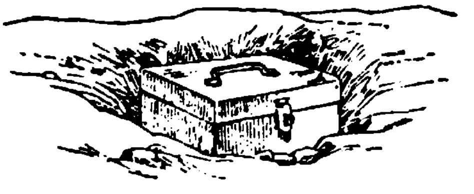

ছায়া

তাসজোড়া বাক্সে পুরতে পুরতে ডাক্তারবাবু বললেন, "তা বললে তো আর হবে না, গোপেনবাবু, সব জিনিস যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এত লোকে দেখেছে, সবাই কি আর মিথ্যে কথা বলে?"

গোপেনবাবু নরম গলায় বললেন, "না, ঠিক তা বলছি নে, তবে কি জানেন, আত্মার যদি অসীম স্বভাব হয় তবে তার একটি সীমাবন্ধ রূপ কি করে দেখা যাবে?"

চৌধুরীমশাই বললেন, "সীমাবন্ধ রূপ আবার কি? আত্মার বিস্তার যেমন অসীম তার ক্ষমতাও তেমনি অসীম, একটা সীমাবন্ধ রূপ নেওয়া তার পক্ষে কিছু শক্ত কাজ নয়।"

দানু বললে, "আর রূপও নিচ্ছে না এক্ষেত্রে, শুধু একটা ছায়া নিচ্ছে, ধরাও যায় না ছোঁয়াও যায় না, ভেতর দিয়ে গঙ্গার ওপারের গাছ দেখা যায়, চাই কি ওর মধ্যে দিয়ে হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।"

চৌধুরীমশাই শিউরে উঠে, গায়ের চাদরটা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

"আসলে কি জানেন গোপেনবাবু, বিয়েথা তো আর করলেন না, তাই সব জিনিস যুক্তি দিয়ে বুঝতে চান। পৃথিবীতে যে এমন বহু জিনিস আছে যার সামনে যুক্তিতর্ক খাটে না, এ অভিজ্ঞতা আপনার হবে কোত্থেকে?"

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

"চলি, গোপেনবাবু, আমার বাড়িতেও কেউ রাত করার যুক্তি মানতে চায় না। কিন্তু আপনার ঐ অসীমের কথাটার মধ্যে যে কিছু নেই তাই বা বলি কি করে। তবে কি জানেন, ছ'ফুট লম্বা মানুষটার ফটোও তো চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি কাগজে ধরে যায়। অবিশ্যি সে ছবিটা কিছু আর আসল মানুষটা নয়, তার হুবহু ছায়াটুকু ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনি কালের পটেও হয়তো বিশেষ অবস্থায় ঘটনার আর পাত্র-পাত্রীর ছাপ

পড়ে যায়, আবার সেই বিশেষ অবস্থা ঘটলে ফটোর মতো সেগুলো দেখা যায়। বলা যায় না কিছুই। চল দানু।"

দানু গলায় কম্ফর্টার জড়াচ্ছিল, পাড়ায় ভালো গাইয়ে বলে তার সুনাম, পুজোর সময় সখের থিয়েটারে তাকে গাইতে হবে, কাজে কাজেই সাবধানের মার নেই। তাছাড়া এদের যা কথাবার্তা এমনিতেই কেমন গাটা শিরশির করতে আরম্ভ করছে। জোর করে হেসে দানু বললে, "ভূত নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে বলুন গোপেনবাবু? তার চেয়ে স্মাগলারদের সম্বন্ধে সাবধান হোন, দেখেছেন তো কাগজে কি লিখেছে, মেয়েও লাগিয়েছে নাকি আর এই সব জায়গাতেই কোথাও স্মাগলারদের আড়ত। মাঝ-গঙ্গায় জাহাজ নোঙর করে সোনাদানাগুলোকে জলে ডুবিয়ে দিলেই হোল! গভীর রাতে সাঙ্গাতরা নৌকা করে গিয়ে জল থেকে সেগুলো উঠিয়ে এনে পাচার করে দেয়। ব্যস্ আর কি চাই!"

চৌধুরীমশাইও খুব হাসতে লাগলেন।

"আরে, জলেও ফেলে না ; এই তো শীতের হাওয়া দিতে শুরু হোল বলে. ওরা এখন জলে ডুব দিল আর কি, তুমিও যেমন! আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, বয়ার তলায় শেকলের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেয়। গিঁট খুলে নিয়ে গেলেই হোল। তবে পুলিসও এতদিনে শুঁকে শুঁকে সব বের করেছে ; তারাও এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে যাচ্ছে, হাতে-নাতে এক ব্যাটাকে ধরতে পারলেই হোল, জেরা করে তার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিতে পারবে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এদের যেমন কথা! কিন্তু বাস্তবিকই একটু সাবধানে থাকবেন গোপেনবাবু, দুষ্টু লোকের কথা কিছুই বলা যায় না। বে-আইনি কাজ করে শেষটা ওদের মনটা এমন হয়ে যায় যে দুটো-একটা খুনখারাপিতে কিছুই বাধে না। তার ওপর একেবারে একা থাকেন তো! আপনার কি মশাই এক-আধটা পুরনো চাকরও থাকতে নেই? এখানকার লোক যে মরে গেলেও এ বাড়িতে রাত কাটাবে না সেটা মানি।"

গোপেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, "পুরনো চাকর তো সঙ্গেই এনেছিলাম, তা সে কিছুতেই গঙ্গার এতটা কাছে থাকতে রাজী হোল না। গঙ্গার গন্ধে নাকি তার হাঁপানি বাড়ে। একটা রাত মোটে ছিল।"

চৌধুরীমশাই বললেন, "গঙ্গার গন্ধ-ফন্ধ কোনো কাজের কথা নয়, আসলে আপনার ঐ মালী-মজুররা স্রেফ তাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়েছে। বুদ্ধির কাজ করেছে। আপনি তো আর ভালো কথা শুনবেন না। পই-পই করে বলেছি, আমার ছোট বাড়িটাতে উঠে আসুন, ঐ রাঁধুনেই রাঁধবে, গঙ্গার ঐ স্যাঁতসেঁতে হাওয়া থেকেও রেহাই পাবেন, চাই কি পুরনো চাকরটাও ফিরে আসতে পারে। মোটে ত্রিশ টাকা ভাড়া। তা ভালো কথা কে শোনে?"

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে পর, ছোট ফটকে তালা দিয়ে, মোটা আমেরিকান তারের জাল ঘেরা বারান্দায় তালা দিয়ে গোপেনবাবু গঙ্গার ধারের বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন। আসলে ঐ একই বারান্দা. গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে, আগাগোড়া তারের জালে মোড়া। আগে নাকি জোয়ারের সময় দু-একবার মানুষখেকো কুমিরকে একেবারে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা যেত, তাই এই ব্যবস্থা। গোপেনবাবু কেনবার আগে ত্রিশ-চল্লিশ বছর নাকি বাড়িতে বড় একটা কেউ বাস করে নি। বড় জোর একটা রাত কি দুটো রাত।

বারান্দার বাইরে রং-বেরঙের ভাঙ্গা চীনেমাটির বাসনের টুকরো বসানো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চাতাল। এক কালে এখানে ফোয়ারা থেকে জল বেরুত, ফোয়ারার চারধার বাঁধানো, গোটা দুই পাথরের বেঞ্চিও রয়েছে।

বারান্দা থেকে গোপেনবাবুর মনে হতে লাগল ফিকে তারার আলোয় একটা বেঞ্চির কোণায় কে বসে রয়েছে। সারা গায়ে সবুজ কাপড় জড়িয়ে, পাৎলা ছিপছিপে একটি মেয়ে যেন গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

গোপেনবাবুর ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে এই প্রথম তাঁর সারা গায়ে কাঁটা দিল। মনে হচ্ছে যেন এক ঢাল ভিজে চুল মাথার ওপর জড়ো করে রেখেছে, কানে গলায় গয়না চিকচিক করছে, গায়ের রং যেন কাঁচা হলুদ। তারার আলোতে সত্যি কতখানি দেখছেন আর কতখানি কল্পনা করে নিচ্ছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির পাশে বেঞ্চির ওপরে রাখা আধ হাত লম্বা একটা কালো বাক্সও চোখে পড়ল।

এতক্ষণে গোপেনবাবুর চৈতন্য হল। তাই তো, চোরাকারবারীরা তো এই রকম সব সুন্দর মেয়েদেরই কাজে লাগায়। কথাটা তো তাঁর অজানা নয় ; সত্যিই তো এ মেয়েকে কখনো কেউ সন্দেহ করতে পারে না, একটা কোমল শ্যামল লতার মতো বেঞ্চির ওপর হাল্কা শরীরটা কেমন এলিয়ে রয়েছে। এতখানি দূর থেকে তার মাধুরী টের পাচ্ছেন গোপেনবাবু, কিসের একটা মৃদু সুগন্ধও যেন নাকে আসছে।

হাতে একটা বন্দুক নেই, লাঠি নেই, অমনি বারান্দার জাল-বসানো ছোট দরজাটির ছিটকিনি খুলে গোপেনবাবু বাইরে এলেন। মোটাসোটা ফর্সা মানুষটি মাথার চুল পাৎলা হয়ে এসেছে, নাকের ওপর মোটা কালো ফ্রেমের চশমা বসানো, চোখটা দিন দিন যেন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কে জানে কাছে গিয়ে হয়তো দেখবেন সব ভুল, কি দেখছেন আর পাঁচ রকম গল্প শুনে কি মনে করে বসে আছেন! ওখানে সত্যি কারো থাকার সম্ভাবনা কম, পথ তো শুধু গঙ্গা, নয়তো দুফুট উঁচু পাঁচিল টপকানো। তাছাড়া এ এলাকার কেউ রাত এগারোটার সময় যে এ বাড়িতে আসবে না সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। তবে এ এলাকাতে যারা থাকে তারা হল সব আটপৌরে মানুষ। অমন মেয়ে এখানকার হবে কেন?

বারান্দা থেকে চার ধাপ সিঁড়ি নেমে, চাতালে বসানো এক-মানুষ উঁচু লাল গোলাপের গাছের সারি পার হয়ে শুকনো ফোয়ারার ধারে এসে দেখেন যা মনে করেছিলেন ঠিক তাই, বেঞ্চিতে কেউ বসে নেই।

কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে এল। তবে কি গোপেনবাবু মনে মনে চেয়েছিলেন যে, ঐখানে ওই রকম একটি মেয়ে সত্যি থাকুক? ওরকম মেয়ে হয় কখনো? ও তো চল্লিশ-বছর ধরে দেশী বিদেশী কাব্যে পড়া যত সুন্দরী তাদের রূপরস দিয়ে মনগড়া একটা ছবি, একটা ছায়া, কি যেন বলছিল দানু, ওর মধ্যে দিয়ে চাই কি হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।

কিন্তু কি একটা অনভ্যস্ত সুগন্ধে, বাতাসটা তবে কেন ভারী হয়ে আছে? গোপেনবাবু চারদিক চেয়ে দেখলেন গন্ধরাজের ঝোপের গাঢ় সবুজ ছায়া থেকে খানিকটা ফিকে সবুজ যেন আলগা হয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ তাকে এতটা কাছে দেখে গোপেনবাবু কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন।

মেয়েটি একটু ম্লান হেসে বললেন, "বড় বিপদে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন। এটা লুকিয়ে রাখুন।" বলে বুকে আঁকড়ে-ধরা কালো বাক্সটি পরম নিশ্চিন্তভাবে গোপেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

গোপেনবাবুর কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় না, অস্বাভাবিক হেঁড়ে গলায় বললেন, "কি—কি আছে ওতে?"

সে খিলখিল করে হেসে উঠল, সে হাসি গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গঙ্গার বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটার কি এতটুকু বুদ্ধি নেই, কে জানে পুলিসরা

কোথায় ওর সন্ধানে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। চোরাকারবারী গোপেনবাবু আগে কখনো চোখে দেখেন নি, তাই ভালো করে তাকে দেখলেন। ইস্, এরা এত রূপসীও হয়! চোখে ধাঁধা লেগে যায়। কপাল ঘিরে বেঁটে বেঁটে ভিজে কোঁকড়া চুলের গুছি, দু'কানে দুটি সবুজ পাথর, তারার আলোয় ঝিকমিক করছে, পাৎলা পাখির ডানার মতো ভুরু, কি যে সূক্ষ্ম কি যে মসৃণ, জোরে কথা বলতে ভয় করে। অথচ ওরই ওই আধাভিজে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কোথাও একটা মুখকাটা ভোঁতা বন্দুক লুকিয়ে আছে। অব্যর্থ টিপও নাকি চোরাকারবারী মেয়েদের, দানু কোন কাগজে নাকি পড়েছে। এর হাতের আঙুল-গুলো সত্যি সত্যি চাঁপার কলির মতো, একটা আঙুলে এই বড় একটা সবুজ পাথর-বসানো আংটি।

খুসি হয়ে কেন লোকে পাপ করে, কিসের জন্য নরকে যাওয়া সার্থক মনে হয়, সে রহস্য হঠাৎ গোপেনবাবু বুঝে ফেললেন। হাত বাড়িয়ে বাক্সটি ধরলেন। এত ভারী যে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল।

মেয়েটি খুব কাছে এসে হেসে বললে, "খুব ভারী, না? খুলেই দেখুন না এত ভারী কেন?"

বলে বাক্সের ডালা নিজেই তুলে দিল। বাক্সভরা সোনার মোহর। সে বললে, "একটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রাখুন, কেমন?" বলে এক মুহূর্তের জন্য গোপেনবাবুর হাতের কব্জির ওপর নরম কচি আঙুল রাখলে।

গোপেনবাবুর কান ঝিমঝিম করতে লাগল, ভাবলেন একেই বোধহয় সুখমৃত্যু বলে। পর মুহূর্তেই মেয়েটি অনেকখানি দূরে সরে গেল। বলল, "ওগুলো আমার নয়। পরে গোলমাল চুকে গেলে—বনানী দেবী, বনহুগলী—এই নামে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন?" কিছু বলতে পারলেন না গোপেনবাবু। একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। সে একটু একটু করে সরে যেতে লাগল, দেখতে দেখতে এতটা তফাতে চলে গেল যে, এই তার সবুজ শাড়ি গাছের সারির সঙ্গে মিশে যায়, আবার এই যেন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তারপর গঙ্গার ধারের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়ের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেল, আর তাকে আলাদা করে দেখা গেল না।

গোপেনবাবু বাক্স নিয়ে ঘরে এলেন। মাথার ভিতরটা একেবারে পরিষ্কার, কোথায় লুকোতে হবে আর বলে দিতে হল না। চাতালের সিঁড়ির পাশেই পাতাবাহারের চীনে-মাটির টব সরিয়ে ছোট্ট খুর্পির দিয়ে গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বাক্স পুঁতে যত্ন করে মাটি চাপা দিয়ে, টবটি আবার যথাস্থানে রেখে, নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে শুয়ে পুলিসের লোকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এল তারা ঠিকই, ঘণ্টা দুই পরেই, সঙ্গে তাদের চৌধুরীমশাই, গ্রাম-পঞ্চায়েতের পাণ্ডা তিনি, এসব ব্যাপারে বাদ পড়েন না। বড় ফটকের ঘণ্টা দিয়ে একটু লজ্জিতভাবে এসে দুটো একটা মামুলী প্রশ্ন করল শুধু।

"জিগ্গেস করতে হয় বলে কচ্ছি স্যার, নইলে এদিকে যে কারো নদীর দিক থেকে আসা সম্ভব নয়, সেটা আমরা খুব জানি। নদীতেও আমাদের লোক আছে যে! তবে মেয়েছেলেরা কত্তে পারে না এমন কাজ নেই, তাই একবার খোঁজ কত্তে আসা। আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুন গে। জালের দরজায় তালা দেন আশা করি? এ গাঁয়েরই কারো কারো সঙ্গে ওদের সড় আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনভাবে সোনাদানা চালান হয় যে, বে-আইনি বলে ধরে কার সাধ্যি! চলি স্যার।"

তারা গেলে পর দরজায় তালা দিয়ে গোপেনবাবু শয্যা নেবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি লেগে থাকল।

পরদিন সকালে রাধেশ্যাম এসে চা টোস্ট নিয়ে গোপেনবাবুকে ডেকে তুলল। তার কাছে খিড়কি দোরের চাবি থাকে। চোখের কোলে তার কালি।

"কি হোল রাধেশ্যাম?"

সে বললে, "কাল রাতে গাঁয়ে কেউ ঘুমোয় নি বাবু, সারারাত খানাতল্লাসি চলেছে। আমিনদের বাড়িতে মেয়েছেলেটি ধরা পড়ে গেছে। তক্তাপোষের নিচে সোনা। তাই দেখতে গেলাম, কি সোঁদর, মাইরি। কাঁদতে ইচ্ছে কচ্ছিল।"

গোপেনবাবুর হাতখানি কাঁপছিল, অনেক যত্নে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, "সোনা হয়তো আর কেউ এনেছে? ও মেয়ে আনবে কেন?"

"সে তো তাই বলছে। সে নাকি কিচ্ছুটি জানে না।এমনি বেড়াতে এসেছিল, আমিনের ঠাকুমা ওর ধাইমা ছিল, হেনাতেনা কত কি। খুব কাঁদছিল মেয়েটা। ঐ দেখুন লরি এলো, ওকে থানায় নিয়ে যাবে। কি হোল গো, বাবু?"

গোপেনবাবু পেয়ালা ফেলে আথালি-পাথালি ছুটে চললেন। কাঁদছে মেয়েটা? হয়তো ভাবছে গোপেনবাবুই খোঁজ দিয়েছেন। কেমন অসহ্য লাগল ভাবনাটা। লরির কাছে পেঁছে দেখেন লাল নীল কাপড়-পরা, এক গা সোনার গয়না পরে, ঠোঁটে গালে রং মেখে লম্বা চওড়া এ কোন মেয়েকে তোলা হচ্ছে? আঃ, বাঁচা গেল।

রুমাল দিয়ে হাসি চেপে গোপেনবাবু ঘরে ফিরে রাধেশ্যামকে নতুন করে চা আনতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে দানুকে নিয়ে চৌধুরীমশাইও এসে উপস্থিত, চুল সব উস্কো-খুস্কো, উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন। দানু বসে পড়েই বললে, "শেষটা গেলি তো বাছা ফটকে? মেয়েছেলে হয়ে এসবে ঢোকা কেন! চা খাওয়ান গোপেনদা।" চৌধুরীমশাই পা দু'খানি মেলে দিয়ে বসলেন।

দানু বললে, "যাক, আপনার একটা বিপদ ঘুচল। চোরাকারবারী মেয়ে ধরা পড়ল। এবার ভূত হতে সাবধান।"

চৌধুরীমশাই বললেন, "না, ঠাট্টা নয়, রাত্রে এমনিতেই গা ছমছম করে, তাই কাল আর কিছু বলিনি, কিন্তু এ বাড়ির দুর্নাম কি একেবারে মিছিমিছি হয়েছে ভেবেছেন? এটা জগু বোসের বাগানবাড়ি ছিল তা জানেন? দেউলে হোয়ে জগু বোসও মল, কে এক সুন্দরী বাইজি বাক্সভরা মোহর নিয়ে নিখোঁজ হোল, সেও প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর হোতে চলল। জগু বোসের বৌ বনানী দেবী এখনো বেঁচে। নাকি বনহুগলীতে বুড়ো বয়সে একরকম না খেয়ে দিন গুনছে।"

শিরার মধ্যে রক্ত-চলাচল বুঝি থেমে যায়। নাকি, ছবি, নাকি ছায়া, ওদের মধ্যে দিয়ে নাকি হেঁটে চলে যাওয়া যায়।

নিঝুম দুপুরে নির্জন চাতালের ধার থেকে টব সরিয়ে বাক্স তুলে তুলো দিয়ে এঁটে প্যাক করে, চটে সেলাই করে, গোপেনবাবু কলকাতায় এসে বড় পোস্টাপিস থেকে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বনহুগলীতে রেজিস্টার্ড পার্সেল পাঠালেন। ফিরবার সময় তিনটে বেকার উড়নচণ্ডে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কাজকর্ম না শিখলে চলে কখনো?

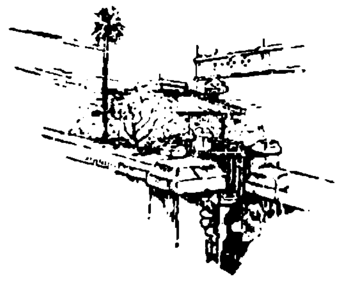

চেতলায়

চেতলা, কালীঘাট, আদিগঙ্গা যতই পবিত্র স্থান হোক-না-কেন, ও-সব জায়গা মোটে ভালো না। আর লোকের মুখে মুখে কি-সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায় তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মশামাছি তো আছেই। চিল্‌তে চিল্‌তে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরি ঝুর্‌ঝুরে সব বাড়ি, তায় আবার প্রায় সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। এক ফালি উঠোনের মধ্যে এই বড়-বড় সব গাছ—তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ ; তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে যে কোনো বাড়ি থেকে যে-কোনো বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা, পুরোনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণগুলো নিজেরাই আবার ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ থাকে। মুখ-দেখা আর কি করে বন্ধ করে, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে সবাই জানতে পারে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, চোর-ছ্যাঁচোড়, খুনে দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কি আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে ; নেই-ও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড় কাকা ওখানকার থানার মেজো দারোগা। তা ছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইভ জন্মায় নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে 'মিসার হতাশা'। ওর বড় কাকাও কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেল তা হলে ওঁর হেড-আপিসে উন্নতি হয় কি করে? অবিশ্যি ও-সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং ভয়ের জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধে হতেই যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর হাতে এক গোছা শঙ্কটতারিণী মাদুলী বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিশে আর কিই-বা করতে পারে?

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিন দিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনি নি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে। কি বড়-বড় সবুজ রঙের চিংড়িমাছ নিয়ে কে বিক্রি করতে এল। চিলেকোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট্‌-ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, "না বাছা, এখানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ। বটু তো চটে কাঁই, কি ভালো ভালো চিংড়িমাছ। ছোট্‌-ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, "ব্যাস্‌ মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল ! আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অত বড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে পরে নেবে। বটু বলল, "আহা, বলল যে বিক্রি না হলে পচে যাবে !"

কাষ্ঠ হেসে ছোট্‌-ঠাকুমা বললেন, "তুইও যেমন। তা ছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।" এই বলে ছোট্‌-ঠাকুমা জল খেতে বসলেন। বটুও বলল, "তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না।" আমি

বললাম, "যাঃ! ভূতের হাঁটু উলটো দিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।" ছোট্-ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "ইদিকে এখনো রোদ আসে নি বাবা, ছায়া দেখবি কি করে? সে যাই হোক, আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাস নে। জায়গাটা ভালো নয়।" গিজ্‌গিজে সব বাড়ি, বটগাছ তলায় যেতে হলে সারকাস্ করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলার লট্‌খটে বারান্দায় দুজনে গল্প করছি। ছপ্ করে কি একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কি সুগন্ধ ভুর্-ভুর্ করতে লাগল। তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড়-বড় চিংড়িমাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সেই মিচ্‌কে লোকটা মিট্-মিট্ করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, "কে, কে ওখানে?" সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোত্থাও নেই। খেয়ে ফেললাম দুজনে মিলে সব ক'টা চিংড়ি মাছ। যদি ওগুলো চিংড়িমাছ না-ও হয় তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠোনে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোট্-ঠাকুমা সাদা পাথরের রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড়-বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তিভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট্-ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদত্তিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে—" আরো কি বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট্-ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, "অমন অছেদ্ধা করিস নে, বটা। উনি আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বনাশ করবেন, খুশি রাখলে আমাদের জন্য না করতে পারেন এমন জিনিস নেই। ঐ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে যে বছরে বছরে পাশ করে যাচ্ছিস্, সেটা কি করে সম্ভব সে কথা কখনো ভেবেছিস? হুঃ!" এই বলে ছোট্-ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন আর তার বদলে একটি আশীর্বাদী—" আর বলা হল না কারণ সেই সময় বড় কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় বললেন, "আর টেকা যাচ্ছে না। গোল-বাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।"

তাই শুনে বড় কাকী এমনি চমকে গেলেন যে হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, "কিন্তু—কিন্তু—" বড় কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, "কিছু কিন্তু কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছটা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে।"

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড়ত। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়ি-গঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে-আইনী জিনিস বস্তা বস্তা পাচার হয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুত-ঠাকুর সেজে এটা-ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন। দিয়েছে নালিশ করে।

বড় কাকা বলেছিলেন, "একটা লোককে কিছুতেই ধরা যায় না, ফুস্‌ফাস্ করে এখান দিয়ে ওখান দিয়ে গলে পালায়। কোনো দোকানদারের সঙ্গে ষড়্ও থাকতে পারে, শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কিরকম মিচ্‌কে মতো, মোটা মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা

বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড় কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট্-ঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যাস্, আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাস নে যেন। দুগ্গা! দুগ্গা!" বড় কাকা চলে গেলে বললেন, "কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঃ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়ি-গঙ্গায় স্পষ্ট জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, "ঐ গোল-বাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখে নি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। সুদিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রুপোর বাসন বেচে-বুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়ি মা নাকি খুচরা পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিল যে ব্যাটা খুঁজেই পায় নি—এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও-বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড় কাকা তদন্ত করতে। খুচরা টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটা তো বিয়েই করে নি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, শুঁটকো, কালো, চাকর-বাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়ি-গঙ্গায় মাছ ধরত। —কে? কে ওখানে?"

খচ্‌মচ্ করে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্‌কে লোকটা হাসি হাসি মুখ করে উঠে এসে, নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "চা চা গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে।" সত্যিই ছিল চা-দোকানের কেতলিতে একটু চা, একটা মাটির ভাঁড়, বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামতেও হয় নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো। চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচ্‌কে মুখ যেন ভাজি হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজি খাবে নাকি?" জিব কেটে বলল, "এ্যা, ছি ছি, ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজকার মতো খেয়ে এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওসা—" বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না।

মিচ্‌কে লোকটি বলল, "বড়-কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা-ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্য রেখে গেলাম। আমি বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।"

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে? এখানে বুঝি খেতে পাও না?" ফিক্ করে হেসে মিচ্‌কে লোকটা বলল, "দু বেলা নৈবিদ্যি পাই, আবার কষ্ট কিসের। ঐ এল বলে! আমি উঠি!" বলেই হাওয়া! নীচে বড় কাকাদের রাগ-রাগ গলার হাঁকডাক শোনা গেল, নিশ্চয় কিছু দুষ্কৃতকারী-টারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে-সঙ্গে হুড়্‌মুড়্ করে আদ্যিকালের তালগাছটা ভেঙে পড়ল। পোকা ধরা, পুরোনো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার! তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরোনো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভরতি। আর চাঁচাপোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা, তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠান্ডা।

পর দিন বড় কাকা বললেন, "আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ি ঠাকরুন তা হলে বাউন্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য, এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।"

ছোট্-ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, "কত বাঁচিয়ে ছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে! ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।" ফোঁৎ ফোঁৎ করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড় কাকা তো অবাক।

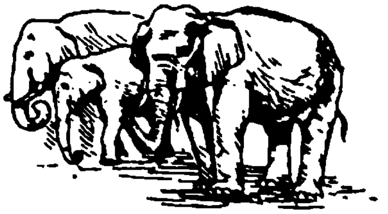

পিলখানা

মন-টন খুব খারাপ। তা আর হবে না? পুজোর সময়ে হাওড়ার এই গলিতে আটকা আছি। আটকা কেন, একরকম বলতে গেলে কয়েদি আসামী হয়েই আছি। জেলখানার বন্দীরাও এর চেয়ে খারাপভাবে থাকে না। বেরুতে দেয় না, কথা বলবার লোক নেই, দেয়ালের ঐ ছোট চার কোনা জানলাটা খুলে দিনে তিনবার আমার খাবার ঢুকিয়েই, আবার দড়াম্ করে বন্ধ করে দেয়, পাছে আমার গায়ের জল-বসন্তের বীজ ওদের গায়ে লেগে যায়। বাড়িতে তো দেখে এলাম, মা রোজ রাতে বুন্টির সঙ্গে এক খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

নাকি আমার পড়ার ব্যাঘাত হতে পারে! গায়ে গুটি গুটি মতো বেরুলে পড়ার কী করে ব্যাঘাত হয় বুঝলাম না। আর পুজোর ছুটিতে কেউ পড়ে নাকি? তা কে শোনে! অমনি বলা নেই কওয়া নেই, আমাকে বগল-দাবাই করে এনে খুড়ো-দাদু এইখানে পুরেছে। কী খারাপ খেতে দেয় কী বলব। সবটাতে তেঁতুল-গোলা। তা হলে নাকি জল-বসন্ত হয় না। যত সব বাজে কথা।

এখন সন্ধে হয়ে গেছে, আজ ষষ্ঠী, দূরে কাদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে, কাছেও পুজো হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে, বাজনা বাজছে। কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। আমার জানলার নীচের গলিটা আসলে এই বাড়ির নিজস্ব গলি। বেশ চওড়া। ওদিকের বাড়ির সব জানলা ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করা। নাকি একশো বছর আগে দুই শরিকে হাতি ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। সায়েব হাকিম এসে এই ব্যবস্থা করেছিল। তাই ওদের নাকি এখনো রাগ আছে, বলে সায়েব ঘুষ খেয়েছিল। এদের সঙ্গে কথা বন্ধ।

এই বাড়িটা নাকি দুশো বছরের পুরোনো। এই পাড়াটাই দুশো বছরের হবে, খোলা খোলা নর্দমা, রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতে সিঁড়ি দিয়ে না-উঠে, এক ধাপ করে নামতে হয়। সেদিন খুব বৃষ্টি হল আর রাস্তার সব জল সক্কলের বাড়ির একতলায় গিয়ে জমা হল। জিনিসপত্র সব উঁচু-উঁচু তক্তপোষে তোলা, পা উঠিয়ে বসে যে যার কাজ করে যেতে লাগল, কারো কোনো অসুবিধা হল না। দুশো বছরের অভ্যেস। বাড়িতে এই সময়ে আমরা খাই। গরম গরম হাতরুটি করে দেয় পিসিমা, আমরা ছক্কা ও আলুরদম দিয়ে খাই। তার পর একটা বড় কলা, কিম্বা আম, কিম্বা আতা খাই। এই গলিটার ভিতর দিকে একটা আতাগাছ দেখতে পাই, তাতে বড়-বড় আতা পেকেছে। মা থাকলে...! যাক গে, আমার এগারো বছর বয়স হয়ে গেছে, আজকাল আমি আর কাঁদি-টাঁদি না। কিন্তু এরা রাতে আমাকে চিনি না-দিয়ে দুধসাবু দেয়, তা নইলে নাকি আমার জল-বসন্ত হবে। সে কখন খাওয়া হয়ে গেছে, আবার আমার খিদে পেয়েছে।

আমি আসবার আগে পিসিমা বলেছিল এটাই নাকি আমাদের পৈতৃক বাড়ি। দুশো বছর ধরে আমরা সবাই এখানেই জন্মেছি, এখানেই মরেছি। ভাব একবার! একতলার ছাদ বেজায় নিচু, কিন্তু দোতলা-তিনতলার ছাদগুলো এমনি উঁচু যে রাতে ভালো করে দেখা যায় না। দেয়ালে লাগানো-আলো অতদূর পৌঁছয় না। যা-কিছু ওখানে আঁকড়ে-মাকড়ে ঝুলে থাকতে পারে, তার পর এক সময় সুবিধা বুঝে ঝুপ্ করে

আমার ওপর প'লে, আগে থাকতে আমি টেরও পাব না। এ ঘরের সঙ্গে লাগোয়া স্নানের ঘর। ঘরের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া থাকে। নইলে বাড়ির অন্য ছেলেদের মধ্যে দিয়ে রোগ ছড়ায়। খুড়ো-দাদু একবার করে এসে আমাকে পড়ায়। রাতে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়, গলিতে বাতি নেই। ছিল একসময় নিশ্চয়, দেয়ালে মস্ত একটা ব্র্যাকেট গাঁথা ছিল। রাতে আমার ভয় করে ঘুম ভেঙে যায়। বলেছি না, মন-টন খুব খারাপ। বাবাকে একটা চিঠি লিখতে পারলে হত। এই আলোতেই লিখতে পারতাম, যদি একটা পোস্ট-কার্ড পেতাম।

আমার আবার কম মন খারাপ হলে ঘুম আসে না, বেশি মন খারাপ হলে বেজায় ঘুম পায়। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম প্রায় কারিকুরি-করা উঁচু খাটটার ওপর, এমন সময় মনে হল কোথায় টুংটাং করে আস্তে আস্তে অনেকগুলো ঘণ্টা বাজছে আর নাকে এল কেমন একটা অদ্ভুত জানোয়ারপানা গন্ধ। নিশ্চয়ই বুড়ো চৌধুরী এ-বছর পুজোয় যাত্রার বদলে সারকাসের ব্যবস্থা করেছেন। আমাকে অবিশ্যি কোনোটাই দেখতে দেবে না। এক যদি বাবা কোনোরকমে টের পেয়ে—নাঃ, শব্দটা বড্ড বেশি কাছে এসে পড়েছিল।

অমনি উঠে পড়ে ছুটে গেলাম জানলার কাছে। বাইরে তাকিয়ে আমার চক্ষুঃস্থির। একটা-দুটো নয়, গলি দিয়ে একটার পর একটা কুড়িটা হাতি আসছে, প্রত্যেকের ঘাড়ে মাথায় ফাট্টাবাঁধা মাহুত আর গলায় ঘণ্টা। দেয়ালের পুরোনো ব্র্যাকেটে কে একটা সেকেলে লণ্ঠন ঝুলিয়েছিল, তারই আলোতে হাতিগুলো সাবধানে এগুচ্ছিল, পা-ফেলার কোনো শব্দ হচ্ছিল না, কিন্তু গলার ঘণ্টাগুলো একটু একটু দুলছিল, তাই শব্দ হচ্ছিল।

"হেই! হেই!" প্রথম হাতিটা আমার জানলার নীচে পেঁৗছেই থেমে গেল। এ-বাড়ির একতলাটা এত নিচু আর হাতিটা এত উঁচু যে, মাহুত আর আমি একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেলাম। দেখলাম বুড়োমতো, গায়ে গেঞ্জি, কানে মাকড়ি। চোখাচোখি হতেই সে বলল, "ওকী! চোখে জল কেন ছোটকর্তার? কেউ কিছু বলেছে?"

আমি চোখ মুছে বললাম, "জল কোথায়? ও তো ঘাম বেরুচ্ছে। আমার খিদে পেয়েছে।"

লোকটা হাসতে লাগল. "খিদে পেয়েছে তো হুকুম করুন। চোদ্দোপুরুষের গোলাম হাজির থাকতে ভাবনা কী? এই মোতি, কী নিয়েছিস মোড়ের মাথার বাগান থেকে, দিয়ে দে বলছি।"

হাতিটা শুঁড় তুলে আমার কোলে এই বড়-বড় দুটো পাকা আতা দিয়ে চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে লাগল, ঠিক যেন হাসি পেয়েছে।

আমি খুশি হয়ে বললাম, "তোমরা বড় ভালো। তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছ?"

সে বলল, "আমি হাইদার, ছোটকর্তা, ঐ যে গলির ওমাথাটা এখান থেকে দেখা যায়-না, ঐখানে আমাদের পিলখানা। সেখানে কুড়িটা হাতি থাকে। রোজ এই সময় বড় পুকুরে জল খাওয়াতে নিয়ে যাই। এই সময় পথঘাট ফাঁকা থাকে। দুটো-একটা হাতি আছে ভীড় দেখলে এখনো ঘাবড়ায়। এরা সব বর্মী হাতি কিনা. আগে কখনো শহর দেখে নি। এবার চলি. কেমন? আতা ধুয়ে খেও, মোতি শুঁড়ে করে এনেছে তো।"

আমি বললাম, "কাল আবার আসবে তো?"

হাইদার বলল. "রোজ রোজ আসব, এই সময়, তুমি কিন্তু মন খারাপ করো নি। পালঙ্কের তলায় ঐ কাঁঠাল-কাঠের তোরঙ্গটা খুলে দেখ-না কেন, তোমাদের চোদ্দ পুরুষের জমিয়ে রাখা কত মজার জিনিস আছে ওতে।"

আমি বললাম, "তাই নাকি? কেউ কিছু বলবে না তো?"

হাইদার বলল, "তোমার জিনিস তুমি হাঁটকাবে, কে আবার কী বলবেটা শুনি? এই বাড়িতে একশোটা ঘর, একশোটা শরিক। এ-ঘরটা তোমাদের তা জানতে না?"

হাতির সারি চলতে শুরু করল, গুনে দেখলাম মাঝে-মাঝে একটা করে বাচ্চা হাতি, সব নিয়ে কুড়িটা! আতা দুটো ধুয়ে খেয়ে ফেললাম। কী ভালো যে কী বলব!

পরদিন সকালে উঠে গলি দেখে বুঝবার জো ছিল না যে, রাতে ওখান দিয়ে কুড়িটা হাতি গেছে। তারা কখন ফিরেছিল, কে জানে। লণ্ঠনটাকেও দেখলাম নামিয়ে রেখেছে। একবার ভাবলাম খুড়ো-দাদুকে হাতির কথা জিজ্ঞাসা করব। তার পরই মনে পড়ল বুড়ো চৌধুরীর সঙ্গে খুড়োদের একশো বছর কথা বন্ধ। তাদের ভাড়া করা হাতি রাতে খুড়োদের গলি দিয়ে খুড়োদের বড় পুকুরে জল খেতে যায় শুনলে খুড়ো তো রেগে চতুর্ভুজ হবেন, তার ওপর হয়তো এ পথটাও বন্ধ করে দেবেন। তা হলে হাইদারের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ভারি খিট্‌খিটে খুড়ো-দাদু, হাতির কথা তাঁকে কোনোমতেই বলা যায় না। তবু পড়তে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "গলির ও-মাথায় কারা থাকে খুড়ো-দাদু?"

বেজায় রেগে গেলেন, "তোর তাতে কী দরকারটা শুনি? পড়াশুনোয় মন নেই, কেবল চার দিকে চোখ।" বলে এমনি হাঁড়িমুখ করে বসে রইলেন যে, আমি তখন কিছু বলতে সাহস পেলাম না।

উনি চলে যাবার সময় শুধু বললাম, "একটা পোস্টকার্ড দেবেন খুড়ো-দাদু? বাবাকে একটা চিঠি লিখব।"

"ওঃ! আমার বাপের ঠাকুরদা এলেন! যা খবর নেবার আমিই নিয়ে থাকি। সবাই ভালো আছে। তাই নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

বললাম, "বাইরে থেকে ছিটকিনি দেবেন না। আমি বেরোব না।"

খুড়ো-দাদু বললেন, "তার পর নিখোঁজ হয়ে গেলে তোর বাবাকে কী বলব শুনি।" এই বলে বাইরে থেকে ছিটকিনি দিয়ে চলে গেলেন।

দুপুরে খাটের তলায় তোরঙ্গটা টেনে বের করে খুললাম। আশ্চর্য সব জিনিসে ভরতি। পুরোনো বাঘবন্দী খেলার ছক-কাটা বোর্ড, রবার-ছেঁড়া গুলতি, হলদে হয়ে যাওয়া পড়ার বই, ছেঁড়া কাপড়-চোপড়। আমার একটা ফোটো। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার এত পুরনো ফোটো কি করে হবে? পিছনে আমার মতো হাতে লেখা মনি রায়। বাবার নাম। তা হলে বাবার ফোটো। এ-ঘরে বাবা কি ছোটবেলায় থাকতেন? সারাদিন বসে অনেক পড়াশুনা করে ফেললাম।

কী করে বাবাকে একটা চিঠি লেখা যায়?

সন্ধের আগেই আমার দুধসাবু পেঁছে দিয়ে, খুড়ো-দাদুরা সপ্তমী পুজো দেখতে গেলেন। তখন আমি জানলার কাছে বসে খুব খানিকটা কেঁদে নিলাম।

"হেই! হেই!—এই দেখ! এ কী কাণ্ড!"

মুখ তুলে দেখি একেবারে নাকের সামনে হাইদারের মুখ। আজ মোতি হাতিকে কিছু বলতে হল না, শুঁড় বাড়িয়ে নিজের থেকেই আমার হাতে আতা গুঁজে দিল। ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম কী নরম, কী মোলায়েম। মোতি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মিট্‌মিট্ করে হাসতে লাগল। তার পিছনে হাতির সারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল।

হাইদার বলল, "কী হয়েছে বলবে নি?"

অমনি তাকে সব কথা বলে ফেললাম। শুনে হাইদার একটুক্ষণ চুপ করে বলল,

"পোস্টকার্ট আবার কী ?"

মুখ্যু বেচারি পোস্টকার্ট জানে না। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা বাড়িতে চিঠি লেখ না? তাকেই বলে পোস্টকার্ট।"

হাইদার বলল, "চিঠি? চিঠি কে নিয়ে যাবে কর্তা? বছরে একবার নিজেই চিঠি হয়ে চলে যাই। কিন্তু তোমার জন্য তো একটা কিছু করতে হয়। আচ্ছা যদি ঘর থেকে ছেড়ে দিই, একা-একা বাড়ি যেতে পারবে?"

"খুব পারব, নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু ওরা তো সদর দরজায় তালা দিয়ে গেছে, কী করে খুলবে?"

হাইদার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "শুনলি তো মোতি? কই, লাগা দাঁকনি! জানলা থেকে সরো কর্তা!"

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল মোতি হাতি হাঁটু দিয়ে একতলার দেয়ালটা একটু ঠেলে দিল, আর অমনি পড়্-পড়্ মড়্-মড়্ করে দেয়াল ভেঙে, জানলা ভেঙে, নীচের রাস্তা অবধি দিব্য একটা সাঁকোর মতো হয়ে গেল। আমি আর অপেক্ষা করলাম না, অমনি পড়ার ব্যাগটা বগলে পুরে এক দৌড়ে নেমে এলাম। হাতির লাইন সুদ্ধ হাইদার ততক্ষণে হাওয়া। কোথাও ওদের দেখতে পেলাম না।

আমি ছুটে মোড়ের মাথায় গিয়ে বাস ধরলাম। যখন বালিগঞ্জে আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন হয়তো রাত নটা, বাবাদের খাবার দিচ্ছিল। আমাকে দেখে বাবার চক্ষু চড়কগাছ। মা হয়তো বকবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন, আমি ছুটে গিয়ে বাবার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেকেটে একাকার করলাম।

আমার গলার আওয়াজ শুনে বুন্টিও ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিছুতেই আর গেল না, বলল, "আমি সেরে গেছি, কেন যাব?" বলে হাউমাউ করে সেও বাবার কোলে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিল। ভারি ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে মেয়েটা।

ঠিক তখনি আমাদের জন্য পুতুল, হকি-স্টিক, বেলুন, মুড়ি-ল্যাবেঞ্চুশ, শোনপাপড়ি নিয়ে জ্যাঠামশাই এলেন। আমরা বাবার গেঞ্জিতে চোখ-টোখ মুছে ফেললাম।

অনেক রাতে বাবার পাশে শুয়ে ঘর বন্ধ থাকার কথা, হাইদার আর মোতি হাতির কথা বাবাকে বললাম।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, "তোর জ্যাঠামশাই যখন তোর মতো, আমি একটু ছোট, আমাদের মা-বাবা বর্মা থেকে আসার পথে জাহাজসুদ্ধ নিখোঁজ হয়ে যান। ঐ ঘরে আমরাও মাস তিনেক ছিলাম। বড় দুঃখকষ্টে ছিলাম রে। তখনো রোজ রাতে হাইদার আসত, হাতির সারি নিয়ে। আমাদের ফল-টল খেতে দিত। একদিন হঠাৎ বলল, কাল তোমাদের মা-বাবা আসবে দেখো। ওমা, সত্যিই তাই। ঝড়ে পড়ে জাহাজ আসতে দেরি হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল জাহাজডুবি হয়েছে। আরো কিছুদিন ছিলাম ঐ বাড়িতে, কিন্তু হাইদার আর হাতিরা আর আসে নি।"

আমি বললাম, "তোমরা কেন গলি দিয়ে পিলখানায় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলে না?"

বাবা আস্তে-আস্তে বললেন, "পিলখানা? পিলখানা কোথায় পাব রে? সে তো আরো একশো বছর আগেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল।"

বললাম, "আর দেখো নি, বাবা?"

বাবা বললেন, "না রে, শুধু দুঃখী লোকেরা ওদের দেখতে পায়।"

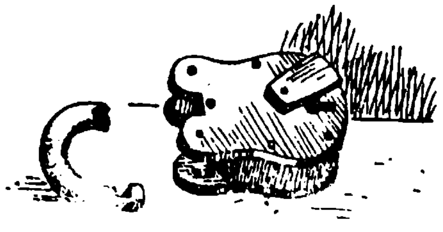

রাত্রে

নীলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে চুরি হবার দু'মাস পরে বিশে গিয়ে ধরা দিল। ততদিনে খোঁজ-খোঁজ রব অনেক কমে এসেছে, কেন যে বিশে ধরা দিল কেউ ভেবেই পায় না।

"বাবু, আমাকে এখন থেকেই গারদে পুরে রাখুন। অতগুলো গয়নাগাঁটি চুরি করেছি, আমাকে ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না।"

থানার ইন্‌স্পেক্টরবাবু ওকে পাগল ঠাওরালেন। এক সঙ্গে অত সোনাদানা পেয়ে ব্যাটার চোখ ঝলসে নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে গামছায় বাঁধা অমন রাশি-রাশি হীরে-মণি দেখে ইন্‌স্পেক্টার বাবুর নিজেরই সৎজীবনের উপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল, আর এ লোকটা বলে কি!

"বাবু, আমি কিচ্ছু চাই না, খালি আমাকে এখুনি ফাটকে দিন। অনুতাপ? না বাবু, অনুতাপ-টাপ আমার হয়নি। আমার এখনো মনে হয় যারা ঐরকম অসাবধান, তাদের জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলাই উচিত। তাছাড়া আমরা যদি চুরিচামারিই না করব তবে আপনাদের চাকরীরই বা কি অবস্থা হবে? সেজন্য নয় বাবু; আমার উপর দয়া করে আমাকে হাজতে দিন। দেখুন আমি মোটেই ভালো লোক নই। তাছাড়া কী আর বলব বলুন, এরপর আমি কখনো একা-একা অন্ধকার রাতে ঘুরে বেড়াতে পারব না, এখানে-ওখানে নির্জন জায়গা দেখে গা ঢাকা দিতে পারব না, খালি বাড়িতে রাত কাটাতে পারব না।"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু অবাক হয়ে দেখলেন বিশের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিচ্ছে, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। একটা টুলে তাকে বসিয়ে বারবার বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই। সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল দিকি—কোনো ভয়ের কারণ নেই।"

কাষ্ঠহাসি হেসে বিশে বললে, "ভয়? ইনস্পেক্টরবাবু ভয়ের কথা বলছেন? তবে শুনুন: ঠিক দু'মাস হল গয়নাগুলো নিয়েছিলাম। একা হাতেই কাজ সেরেছিলাম। একতলায় গয়নাগাঁটি রেখে কেউ দোতলায় ঘুমোয় বলে শুনেছেন? তায় আবার বাক্সে তালা দেওয়া সস্তা খেলো একটা লোহার সিন্দুক। ওঁদের একটু দয়া করে বলে দেবেন তো গয়নাগাঁটিতে কিছু কম পয়সা খরচ করে, সিন্দুক একটা ভালো দেখে কিনতে।

পরের জিনিস কখনো চুরি করেছেন? পালিয়ে বেড়ানো কাকে বলে জানেন? যাকে দেখি তাকেই মনে হয় শত্রু, বন্ধুবান্ধবকেও মনে হয় বিশ্বাসঘাতক, কোথাও নিশ্চিন্ত হবার যো থাকে না, নিরাপদ একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। যাই হোক, একদিন এখানে দুদিন ওখানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। উঃ, বলিহারি আপনাদের পুলিসদের বুদ্ধি! কতবার যে তাদের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে এসেছি, একবার পথ বাতলে দিয়ে-ছিলাম পর্যন্ত। বয়সও হচ্ছে আজকাল, ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। একদিন দুপুররাতে আমাকে ধরে ফেলেছিল আর কি! ছুটতে ছুটতে আমার দম বেরিয়ে গেছে, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। কোথায় যাই? সামনে দেখি একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, তার সদর দরজা একটুখানি খোলা।

ঢুকে পড়ে সেটাকে ঠেলে বন্ধ করে তাতেই ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। ভাঙ্গা জানলা দিয়ে একটু একটু রাস্তার আলো আসছে। এখুনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি পড়বে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকারে যখন চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম এটা খালি বাড়ি। আঃ! কি আরাম যে লাগল বাবু, সে আর কি বলব! একটি রাত অন্ততঃ নিশ্চিন্তে ঘুমোন যাবে, কে জানে হয়তো দু'চারদিন এখানে এই খালি বাড়িতে লুকিয়ে থাকাও যাবে। এখানে আবার কে আমার খোঁজ করবে, আমি নিজেই আবার ও জায়গাটা খুঁজে পাব কিনা সন্দেহ। হেঁটে হেঁটে পালিয়ে পালিয়ে পায়ের গুলিদুটো দড়ির মত পাকিয়ে উঠেছে, দুটো দিন একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে। একটু নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে।

আস্তে আস্তে দরজার খিল তুলে দিলাম। দেশলাই জ্বালতে সাহস হ'ল না যদি ভাঙ্গা জানলা দিয়ে দেখা যায়। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। কেউ কোথাও নেই। বহুদিন কেউ এখানে থাকে নি, চারদিক ধুলোয় ধুসর। আশ্চর্য হলাম ভেবে রেফেউজিরা কেন এটাকে দখল করেনি। বোধহয় খুঁজে পায় নি। কোথাও কিচ্ছু নেই। একেবারে খালি বাড়ি।

কাঠের সিঁড়ি মাঝে মাঝে ক্যাঁচ কোঁচ করে ওঠে, তা ছাড়া চারদিক একেবারে নিঝুম। তিনতলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার, জানালার খড়খড়ি সব এঁটে বন্ধ করা, একটুও আলো আসে না। সাহস করে দেশলাই জেলে সামনের বড় ঘরটাতে ঢুকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল শুনতে পেলাম। পকেট থেকে মোম-বাতির টুকরো বের করে জ্বাললাম। মস্ত খালি ঘরে শুধু একটা বড় তক্তপোষ, বিশাল উঁচু ছাদ। কাঠের জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ করা। মোমবাতিটা তক্তপোষের উপর নামিয়ে, গামছা দিয়ে তক্তপোষটা ভালো করে ঝেড়ে নিলাম।

তারপর পা দুখানি মেলে তার উপর বসে পড়লাম। সে যে কি আরাম সে আর আপনি কি বুঝবেন!

গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটি খুলে ফেলে তক্তপোষের উপর গয়নাগুলো ঢেলে ফেললাম। মোমবাতির আলোতে সেগুলো চিকমিক করতে লাগল। এই আমার এত দুঃখের কারণ। এমন সময় স্পষ্ট শুনলাম পায়ের শব্দ! পুলিসের লোক? কি বলব বাবু, বুকটা এমন জোরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল যে নিজের কানে সে শব্দ শুনতে পেলাম। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে কে উঠে আসছে। সামনের দরজায় আগল দিয়ে এসেছি। তবে কি পিছনে কোনও দরজা খোলা ছিল? সত্যি বলছি, সে যে বাইরে থেকে নাও আসতে পারে একথা আমার একবারও মনে হয় নি।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম। গয়নাগুলো লুকিয়ে ফেলতেও ভুলে গেলাম।

পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে তিনতলায় এসে পৌঁছল, তারপরই দরজার সামনে তাকে দেখতে পেলাম। সে যে কিরকম রূপসী, আমি মুখ্যু মানুষ, কথায় বোঝাতে পারব না। এই এক হাঁটু কালো কোঁক্ড়া চুল, সাদা পদ্মফুলের মত মুখখানি, টানা টানা চোখ দুটি হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে, চাঁপাফুলের মতো হাত দিয়ে গায়ের উপর সাদা কাপড়খানিকে জড়িয়ে ধরেছে। বিধবা মনে হল। মাথায় সিঁদুর নেই, গায়ে গয়না নেই, খালি রূপ দিয়ে, ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি তাকে দেখে একেবারে হাঁ করে চেয়ে রইলাম, মুখে কথাটি সরল না। তাঁর চোখ দুখানি আমার কোলের কাছের গয়নার ঢিপির উপর পড়ল। অমনি তার মুখখানি ছলছলিয়ে উঠল, কাছে এসে আমাকে বলল, "ওমা! এত গয়না কোথায় পেলে?" দুখানি ফর্সা হাত বাড়িয়ে গোছা গোছা গয়না তুলে ধরে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

"এর জন্য মানুষ খুন করে, পাপ করে, প্রাণ দেয়! ঈস্, এত গয়না কারো থাকতে পারে আমি জানতাম না। দেখি, দেখি, এ যেন চুনি পান্না গজমোতি মনে হচ্ছে।"

আস্তে আস্তে দু'গাছা লম্বা মালা নিজের গলায় পরিয়ে দিল। দু'হাতে হাঙরের মুখ দেওয়া বালা পরল, চুর পরল, আঙুলে আংটি পরল। সেইখানে তক্তপোষের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে গা ভরে গয়না পরল। আমার কেমন যেন দশার মতো হল, কিছু বলতে পারলাম না। ভাবছিলাম যদি বাইরে থেকেই এল তো ওর চুল কাপড়-চোপড় ভেজে নি কেন?

তারপর আস্তে আস্তে যখন উঠে দাঁড়াল, ঠিক যেন দুগ্‌গো ঠাক্‌রুন। আমায় বললে, "একটি আয়না দিতে পার?" আমি মাথা নাড়লাম। "আয়না নেই? সে কি কথা! তবে আমি কোথায় আয়না পাব?" চারদিকে একবার তাকাল, তারপর দরজার দিকে চলল। তখন আমার চৈতন্য হল। ছুটে গেলাম তার পিছন পিছন, "কোথায় যাচ্ছেন মা-ঠাক্‌রুন আমার গয়না নিয়ে?" সেও ছুটে দরজা দিয়ে বেরোল, আমিও তার পিছন পিছন দৌড়লাম। সিঁড়ির মাথায় ধরে ফেলি আর কি। এমন সময় মাথা ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। মুখখানি যে কি হতাশায় ভরা! তারপর সেইখান থেকে সিঁড়ির নিচু রেলিং-এর উপর দিয়ে এক লাফ দিল।

বিশে দু'হাতে কান ঢেকে বলল, সে পড়ার শব্দ এখনও আমার কানে লেগে আছে। তারপর সব যখন চুপ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে পুঁটলিটা বেঁধে মোমবাতি হাতে করে নিচে নামলাম। এখানে আর নয়, শেষে কি খুনের দায়ে পড়ব!

নিচে এসে দেখলাম চারদিকে গয়নাগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে, সে মেয়েটির চিহ্নমাত্র নেই। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাগলের মতো সবদিক চেয়ে দেখলাম, ধুলোর উপর আমার ছাড়া কারো পায়ের ছাপ পর্যন্ত নেই। এতক্ষণে আমার প্রাণে ভয় ঢুকল, আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। গয়না যেমন তেমনই পড়ে রইল, কোনও রকমে দরজার আগল খুলে ছুটে জল-ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।—"বাবু, এই নিন বাকি গয়নাগুলো, আর আমাকে আরও চার-পাঁচজন দুষ্টলোকের সঙ্গে এক ঘরে বন্ধ করে রাখুন।"

গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস

যারা শহরে বাস করে তারা দু'চোখ বুজে জীবনটা কাটায়। কোনো একটা বিদেশী তেল কোম্পানীর সব থেকে ছোট সাহেব অরূপ ঘোষের মুখে এ কথা প্রায়ই শোনা যেত। সাহেব বলতে যে বাঙালী সাহেব বোঝাচ্ছে, আশা করি সে কথা কাউকে বলে দিতে হবে না। বিলিতি বড় সাহেব আজকাল যদি-বা গুটিকতক দেখা যায়, ছোট সাহেব

মানেই দিশি! তবে অরূপের বুকের পাটাও যে কারো চেয়ে নেহাত কম, এ কথা তার শত্রুরাও বলবে না।

সমস্ত বিহার, ওড়িষ্যা, আর পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে অজস্র গাড়ি চলার ভালোমন্দ পথ আর অগুন্তি রাত কাটাবার আস্তানা আছে, এ বিষয়ে যারা ও-সব জায়গায় না গিয়েছে, তাদের কোনো ধরণাই নেই। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার গল্প বলে তারা। বিশেষ করে কোনো নির্জন আস্তানায় দু-চার জনা যদি অতর্কিতে একত্র হয়। সেদিন যেমন হয়েছিল। বলাবাহুল্য অরূপ ছিল তাদের একজন।

বিদেশী তেল কোম্পানীর ছোট বড় সাহেবদের তিন বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি চড়ে বেড়ানো নিতান্ত নিন্দনীয়! কাজেই অরূপের গাড়িটা খুব পুরোনো ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি, দুর্ভোগ কপালে থাকলে তাকে এড়ানো সহজ কথা নয়, কাজেই এই আস্তানায় পেঁছতে শেষ বারো মাইল আসতে, তার দেড় ঘণ্টা লেগেছিল এবং পাঁচিশ-বার নামতে হয়েছিল। ফুয়েল পাম্পের গোলমাল, সেটি না সারালেই নয়। অথচ ক্ষুদে অখ্যাত বিরামাগারের সামনের নদীর মাথায় কোথাও প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে থাকবে, তার ফলে নদী ফেঁপে ফুলে একাকার। পুরোনো লজ্ঝড়ে পুল থরহরি কম্পমান। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক ছাড়া কেউ তাতে চড়তে রাজী হবে না।

তবে এর চাইতে অনেক মন্দ জায়গাতেও রাত কাটিয়েছে অরূপ। সেই কথাই হচ্ছিল। ম্যানেজার ছাড়া, শুধু একটা চাকর। তা ছাড়া তিনজন আগন্তুক ; অরূপকে নিয়ে চারজন। ম্যানেজার মানে কেয়ার-টেকার। এখানে কেউ থাকেও না, খায়-দায়ও না। হয়তো দৈবাৎ অসুবিধায় পড়লে রাত কাটিয়ে যায়। নিজেদের খাবার-দাবার খায়।

বনবিভাগের ইন্সপেক্টর কালো সাহেব ডি-সিল্‌ভা বলল, “আরে তোমরাও তো খাও-দাও, ঘুমোও।” তা খায় সত্যিই। কেয়ার-টেকার খৃশ্চান ; যে বেয়ারা রাঁধে সে কেয়ার-টেকারের হুকুম পালে বটে ; কিন্তু তার হাতে খায় না। নদীর ওপারে মাইল দেড়েক দূরে রবি গাঁও থেকে রসদ কিনে আনতে হয়। আজ আর কেউ নদী পার হতে পারে নি। ভাঁড়ার ঠন্‌ঠন্‌। তা ছাড়া এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর যে-কেউ এসে উঠলেই অমনি তার নফর হতে হবে, এমন যেন কেউ আশা না করে।

ডি-সিল্‌ভা পরিষ্কার বাংলা বলে, তার আদি নিবাস ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। এবার সে রেগে উঠল। “মাই ডিয়ার ফেলো, আমি তোমাদের মতো নই, আমি ইউরোপিয়ান, তোমাদের রাঁধাবাড়ার তোয়াক্কা রাখি না। আমার রসদ আমার সঙ্গে থাকে। আমি শুধু জানতে চাই এ জায়গাটা রাত কাটাবার পক্ষে নিরাপদ কি না।”

অরূপ না হেসে পারল না। “বনের মধ্যে যার কাজ তার অত ভয় কিসের?”

তৃতীয় ব্যক্তির নাম নমসমুদ্রম কি ঐ ধরনের কিছু। বোধ হয় পুলিশের লোক। ডি-সিল্‌ভার সঙ্গেই এসেছিল। সে সর্বদা ইংরেজি ছাড়া কিছু বলে না। এবার সে ব্যস্ত হয়ে বলল, “না, না, সেরকম ভয়ের কথা হচ্ছে না। আর হবেই-বা কেন? তোমাদের মতো উৎসাহী ইয়ংমেন তো এ-সব বনের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ বন্য জন্তু মেরে-কেটে সাবাড় করে এনেছ! ও অন্য ভয়ের কথা বলছে।”

অরূপ জুতোর ফিতে ঢিলে করে, মোজাসুদ্ধ পা টেনে বাইরে এনে, আঙুলগুলো নেড়ে একটু আরাম বোধ করে বলল, “তা হলে কিরকম ভয়ের কথা মশাই?” সে তেল কোম্পানীর কর্মী, রাষ্ট্রভাষা তার মুখে সহজে আসে। শুনে চতুর্থ ব্যক্তি দাড়ি নেড়ে বলল, “ঠিক, রাইট।” নমসমুদ্রম কাষ্ঠ হাসল—“এমন সব ভয়ের ব্যাপার যা বন্দুকের গুলিতে বাগ মানে না। ঠিক কি না?” ডি-সিল্‌ভা বলল, “অবিশ্যি আমার তাতে এসে যায় না। ইউরোপের লোকেরা এ-সব বিষয়ে অনেকটা উদার। তা ছাড়া আমার পীরের

.রগায় মানত করা আছে। আমার ক্ষতি করে কার সাধ্যি।"

সরদারজি বললেন, "তবে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে বৈকি। এই যেমন গত বছর সবাই পই-পই করে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের ট্রাক দুর্ঘটনার অকুস্থলে যাবার পথে মোপানির ডাক-বাংলায় রাত কাটালাম। বেশ ভালো ব্যবস্থা, আমার ডালরুটি আমার সঙ্গে থাকে, চৌকিদারটিও ভদ্র। আমার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আর স্নানের ঘরে জল আছে কি না অনুসন্ধান করেই সে হাওয়া হয়ে গেল। আমিও ক্লান্ত ছিলাম, মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনাও ছিল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে উঠতে গিয়ে খাটের পাশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে, ও হরি, তল পাই না! কিছুতেই আর মেজেতে পা ঠেকল না। নামাও হল না। কখন আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি যে-কে সেই। খাটের পাশে ঐ তো চটিজোড়া রয়েছে, কেউ ছোঁয় নি। ভালো করে ঘরটা পরখ করলাম, কেউ যে দড়ি বেঁধে কি অন্য উপায়ে খাটটাকে শূন্যে তুলবে, তার কোনো চিহ্ন নেই। ভাবলাম দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কাপড়-চোপড় পরে চায়ের জন্য বসে বসে হয়রান হয়ে, চৌকিদারের ঘরে গিয়ে তাকে টেনে বের করলাম। আমাকে দেখে সে অবাক! 'সাহাব, আপনি—আপনি—! ও বাংলোতে তো কেউ রাত কাটায় না। কাল সেই কথাই বলতে চেষ্টা করছিলাম, আপনি কানও দিলেন না।'

"হাসলাম। আমার কনুই-এর ওপর কালীঘাটের মাদুলী বাঁধা সে কথা আর ব্যাটার কাছে প্রকাশ করলাম না। অবিশ্যি বলা বাহুল্য জায়গাটার নাম মোপানি নয়। সরকারের ক্ষতি করতে চাই না বলে নামটা পাল্টে দিলাম।"

নমসমুদ্রম বলল, "ডি-সিল্‌ভার আর আমার গত বছর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তরাইয়ের এক চা বাগানে এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। বাগানও দেখব, ডি-সিল্‌ভা কি-সব গাছের নমুনা সংগ্রহ করবে আর আমার একটা তদন্তের কাজও ছিল। সন্ধে থেকে চা-বাগানে কেমন একটা অস্বস্তি লক্ষ করলাম। অন্ধকারের আগেই আপিস-সেরেস্তার কারখানা-গুদোমখানার দরজা-জানলা দুম্‌দাম্‌ বন্ধ হয়ে গেল। কর্মীরা যে যার কোয়ার্টারে দোর দিল। অথচ এখানে এমন কিছু একটা শীত পড়ে নি। আকাশে ফুট্‌ফুট্‌ করছে চাঁদ। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে, চা-বাগানের মালিকও নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমাদের বললেন, 'শুয়ে পড় তোমরা, এ সময়টা এ-সব জায়গায় খুব ভালো নয়। শিকার? কাল সকালে ভালো শিকারের বন্দোবস্ত করেছি।' কিন্তু এত সকালে শোব কি! বন্দুক নিয়ে দুজনে বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

"চা-বাগান গিয়ে ঘন বনে মিশেছে। মাঝখানে শুধু একটা উঁচু সেতু। সেটা পেরুনো আমাদের কাছে কিছুই নয়। পূর্ণিমায় কখনো বনের মধ্যে বেড়িয়েছেন? চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে কুচিকুচি হয়ে, এখানে ওখানে পড়ে হীরের মতো জ্বলে। কোথাও অন্ধকার জমে থক্‌-থক্‌ করে। মনে হয় গাছগুলো জেগে উঠে চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। গা শির্‌শির্‌ করে। কোথাও সাড়া-শব্দ নেই।

"হঠাৎ দেখি আমাদের থেকে দশ হাত দূরে প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ। এত বড় নেকড়ে এ-দেশে হয় জানতাম না। তার চোখ দিয়ে আলো ঠিকরোচ্ছে, মুখটা একটু হাঁ করা, বড়-বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরছে। মাথাটা একটু নিচু করে, বিদ্যুৎবেগে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর গায়ের চাপে ঝোপঝাপগুলো সরে সরে যাচ্ছে।

"আমার সারা গা হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল। বন্দুক তুলবার জোর পাচ্ছিলাম না। অথচ ডি-সিল্‌ভা নির্বিকার। যেই জানোয়ারটা আমাদের পার হয়ে গেল মনে হল এমন সুযোগ আর পাব না। অমনি সম্বিৎ ফিরে এল। বন্দুক তুলে ঘোড়া

টিপলাম। খুব বেশি হলে জন্তুটা তখন আমাদের কাছ থেকে সাত-আট হাত দূরে। আমার অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলিটা তার গা ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন একটা গাছের গায়ে সেটাকে বিঁধে থাকতে দেখা গেছিল।

"নেকড়েটা ভ্রূক্ষেপও করল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি নিমেষের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার কেমন মাথা ঘুরে গেল, ডি-সিল্‌ভা না ধরলে পড়েই যেতাম।" অরূপ বলল, "ভারি অদ্ভুত তো!"

ডি-সিল্‌ভা চুপ করে শুনছিল। এবার সে মুখ থেকে সিগারেট বের করে বলল, "অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! আমি তো ওর পাশে দাঁড়িয়েও নেকড়ে-ফেকড়ে কিছু দেখলাম না, খালি একটা বুনো গন্ধ নাকে এল। একফোঁটা রক্তও মাটিতে দেখা গেল না। পরদিন ভোরে বাগানের মালিক শিকারের প্ল্যান বাতিল করে দিয়ে, একরকম জোর করেই আমাদের রওনা করে দিলেন। খুব বিরক্ত মনে হল! তবে এ-সব ব্যাপারে কোনো এক্সপ্ল্যানেশন খুঁজবেন না, মশাই। নেহাত সমুদ্রের মা গুরু-বংশের মেয়ে, নইলে আর দেখতে হত না।"

অরূপ খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। এদের যত সব গাঁজাখুরি গল্প। ইন্টেলিজেন্সের অপমান। ডি-সিল্‌ভা বলল, "কি হল? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বনে-জঙ্গলে, নির্জন জায়গায় আমাদের মতো ঘুরে বেড়ান কিছুদিন, তার পর দেখবেন সব অন্যরকম মনে হবে।"

সরদারজিও হাসলেন। বললেন, "বিশেষ করে যদি গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসে একবারটি রাত কাটাতে হয়।" পরিবেশটি যে এইরকম একটা আলোচনারই যোগ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। এক দিকে ক্ষুব্ধ নদীর জল ফুঁসছে, অন্য দিকে বনের গাছপালায় বাতাসের আলোড়ন, তার উপর মেঘলা আকাশের নীচে চার দিক থেকে এরই মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাতাসটা থম্‌থমে।

তবু, গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসের নাম শুনে অরূপের হাসি পেল। সে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, "কেন সেখানে কি হয়?" সরদারজি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "সেকি! আপনি থাকেন কোথায় যে অমন একটা সুখ্যাত জায়গার কথা জানেন না? ভাবতে পারেন সেখানে টাকা দিয়েও সরকার কখনো একটা চৌকিদার কি বেয়ারা রাখতে পারে নি। কেউ রাজী হয় নি। এটা একটা হিস্টরিক্যাল ফ্যাক্ট। বনের মধ্যে খাঁ-খাঁ খালি বাংলো পড়ে থাকত। নাকি সন্ধের পর জন্তু-জানোয়ারও তার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না!"

অরূপ আবার হেসে উঠল। "তাই নাকি? অথচ আমি সেখানে পরম আরামে গতকাল রাত্রিবাস করে এলাম। চৌকিদারের আপ্যায়ন আর বাবুর্চির রান্নার তুলনা হয় না। কোত্থেকে যে ঐ ব্যাক-অফ-বিয়ণ্ডে আমার জন্য মাশরুম আর অ্যাসপ্যারাগাস জোগাড় করে খাওয়াল তা ওরাই জানে। জানেন ফেদার-বেডে রাত কাটালাম। পোর্সিলিনের বাথ-টাব ভরে গরম জল দিল। একটা পয়সা নিল না দুজনার একজনও। কত মন-গড়া গল্পই যে আপনারা বিশ্বাস করেন তার ঠিক নেই। তবে এ কথা সত্যি যে আমার গাইড-বুকে ওটার নামেও পাশে লেখা আছে, অ্যাবান্ডন্‌ড ১৯০০ এ. ডি.! গাইড-বুকের লেখকও তেমনি। নিশ্চয় আপনাদের কারো কাছ থেকে ঐ তথ্য সংগ্রহ করেছিল!" বলে অরূপ খুব হাসতে লাগল। "আর তাই যদি বলেন, গাইডবাবুকে আমাদের আজকের এই আস্তানারও নাম নেই, তা জানেন? এটাই-বা এল কোত্থেকে?"

অরূপ হাসলেও বাকিরা কেউ হাসল না। তারা বরং ত্রস্ত চঞ্চল হয়ে উঠে, "ম্যানেজার! ম্যানেজার!" বলে চেঁচাতে লাগল। এলও ম্যানেজার এক মুহূর্তের জন্য, বেয়ারাটাও এল। কি যেন বলবারও চেষ্টা করল। তার পরেই সব ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। ঘর বারান্দা কিছুই রইল না। শুধু সামনে অন্ধকার বন আর পিছনে নদীর ফোঁস্‌-

ফোঁসানি। ওরা ধুপ্‌ধাপ্‌ করে যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। সরদারজি অরূপকে সঙ্গে টেনে নিলেন। পনেরো মাইল ফিরে গিয়ে ছোট শহরে ওরা রাত কাটিয়ে সকালে যে যার পথ দেখল। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

খালি অরূপকে জীপ ও লোকজন নিয়ে একটু বেলায় গিয়ে গাড়িটা উদ্ধার করতে হল। তখন নদীর জল কমে গেছে, পুল আর কাঁপবে না। গাড়ি সারানো হলে অরূপ পুল পার হয়ে ওদিকের পথ ধরল। তার আনা লোকগুলোর পাওনা চুকিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, "নদীর তীরে গাছের নীচে শুকনো ফুল কেন?" তারা হেসে বলল, "গাঁয়ের লোকের কুসংস্কার মশাই। মাসে একবার এখানে বুনোকিদেওর পুজো দেয়। তিনি নাকি বিপন্ন যাত্রীদের রক্ষা করেন।" অরূপ বলল, "গোলাবাড়ি সার্কিট হাউসের ব্যাপারটা কি?" তারা অবাক হয়ে বলল, "সে তো কবে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।"

অশরীরী

এখন আমি একটা সাধারণ খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও, এক বছর আগেও একটা সাংঘাতিক গোপনীয় কাজ করতাম। সে কাউকে বলা বারণ। বললে আর দেখতে হত না, প্রাণটা তো বাঁচতই না, তারও পর সব চাইতে খারাপ কথা হল যে চাকরিটাও চলে যেত। তবে এটুকু বলতে দোষ নেই যে কাজটা ছিল খবর সংগ্রহ করা। কোথায়, কেন, কার জন্য, সে-সব তোমরাই ভেবে নিয়ো।

আমার বয়স তখন বাইশ; নামটা আর বললাম না। আমাদের পাড়ার হরিশ খুড়ো চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই আমার বড় সায়েব—সায়েব হলেও তিনি কুচ্‌কুচে কালো—আমাকে বলেছিলেন, "দেখ সর্বদা 'নেই' হয়ে থাকবে। তুমি যে আদৌ আছ সে কথা টের পাওয়া গেলে চলবে না। তোমার আলাদা একটা চেহারা, কিম্বা চলা-ফেরা, কিম্বা কথা বলার ধরন গজালেই চাকরিটা যাবে। পানাপুকুরে এক ফোঁটা ময়লা জল হয়ে থাকবে, সমুদ্রের ধারে এক কণা বালি হবে, এক কথায় স্রেফ অশরীরী হয়ে যাবে। কথা বললে কি বলছ এটুকু বোঝা যাবে, কিন্তু আলাদা করে গলার আওয়াজ মালুম দেবে না। আর সব চাইতে বড় কথা হল যে নিজের চেহারা বলে কিছু রাখতে পাবে না, যাতে তুমি মরে গেলেও তোমাকে সনাক্ত করা না যায়। ওরকম করে তাকাচ্ছ কেন, এ কিছু শক্ত কাজ নয়, কিছু করতে হবে না, স্রেফ 'নেই' হয়ে থাকতে হবে। বেশি লেখাপড়া জানারও দরকার নেই। বলো, পারবে তো?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।"

বড় সায়েব বেজায় রেগে গেলেন, "ফের কথার ওপর কথা! চুপ করে থাকতেও কি শেখাতে হবে নাকি? কি নাম তোমার?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

সায়েব খুব খুশি হয়ে বললেন, "খুব ভালো। মাইনে নেবার সময় নাম লিখবে না, টিপ-সই দেবে না। নাম তো ভাঁড়ানো যায়, কিন্তু টিপ-সই দিয়ে সবাইকে চেনা যায়। দুনিয়ার কোনো দুজন লোকের একরকম আঙুলের ছাপ হয় না। ১লা তারিখে আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবে, খাতায় লেখা হবে 'নষ্টামি বাবদ দুইশো টাকা।' আচ্ছা, যেতে পার।"

আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে তিনটে আঙুল দেখালাম। বড় সায়েব হেসে বললেন, "আচ্ছা, তিনশো টাকাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, বিপদে পড়লে আমরা বলব তোমাকে চিনি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ; শুনলাম আমার নতুন নাম ইংরিজি হরপের 'কিউ'। যেখানে যত সন্দেহজনক খবর শোনা যেত, নিজে দেখে এসে আপিসের পাশের গলিতে যে ভাঙা টাইপ-রাইটার ভাড়া খাটত, তাতে টাইপ করে জমা দিতে হত। তার পরের ছয় মাসে কোথায় যে না গেলাম, কি যে না দেখলাম, তার ঠিক নেই। অথচ আমাকে কেউ দেখতে পেত না। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে যেতাম। যেখানে ভিড় নেই, শুধু ভাঙা দেয়াল, সেই দেয়ালে একটা দাগ হয়ে মিশে থাকতাম। একবার একটা চোরাই গুদোমে সারাদিন শ্রমিকদের একজন হয়ে গিয়ে রাশি রাশি গোপন খবর এনে দিয়েছিলাম। বড় সায়েবের মাইনে বেড়ে গেছিল। আরেকবার একটা বিদেশী মাল-জাহাজে সারাদিন একটা পিপে হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা খুঁজিয়ে পাইয়ে দিলাম। সেইজন্য খবরের কাগজে বড় সায়েবের সে কি প্রশংসা !

সে যাই হোক, শেষবারের কাজটার কাছে ও-সব কিছু না। নাকি গড়িয়ার দিকে এতকাল কোনো বে-আইনি কাজ হয় নি যে সকলের সন্দেহ হল নিশ্চয় কোনো গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। তার ওপর সব বাংলা কাগজে যখন ছোট্ট একটা নোটিশ বেরুল টিপ-বোতাম পরিষদের প্রথম সভা গু-শু-৭, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে গড়িয়াতে, শুক্রবার সাতটায় গোপন সভা বসবে।

বড় সায়েবের ঘর থেকে প্রায় অদৃশ্যভাবে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাঁর পেয়ারের বেয়ারা বলল, "টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেবে না।" রুমাল জড়িয়ে হাত পাতলাম। সে এক কুচি লাল কাগজ বের করে বলল, "দু টাকা।" একটা আঙুল দেখালাম। তাকে টাকা দিয়ে টিকিট পকেটে ফেলে চলে এলাম।

শুক্রবার পাঁচটায় যখন বাসে সব চাইতে ভিড় হয়, তখন, বেছে বেছে সব চাইতে ভিড়ের বাসে উঠলাম। উঠে চারটে লোকের মধ্যিখানে এমন 'নেই' হয়ে রইলাম যে কন্ডাক্টার টিকিট চাইল না। চাইবে কেন, আমার তো আর শরীর-টরীর নেই যে বাসের জায়গা জুড়ে থাকব।

গড়িয়াতে নেমেই একটা চায়ের দোকানে ভিড় দেখে, সটান সেখানে গেলাম। এক ভাঁড় বেজায় হালকা, বেজায় গুড়ের চা নিয়ে, তক্তার ওপর দশ পয়সা ফেলে দিলাম। সস্তা তো হবেই, শুকনো শালপাতা দিয়ে এ-সব চা বানাতে হয়, চা-পাতা দিলে আর ঐ দামে দিতে হত না।

ভাঁড় নিয়ে একটা বাঁশের খুঁটির পিছনে গুম্ হয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছিল ঐ শুক্রবার নিয়ে নাকি চারদিন পকেট-মার হয় নি। চট্ করে বুঝে নিলাম সভা তা হলে পকেটমারদের। একটা চিম্‌ড়ে লোক চায়ের ভাঁড় শেষ করে, সামনের বাঁশ বাগানের দিকে পা বাড়াতেই, বাকি সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল—"মশাই অমন কাজও করবেন না। ঐ বাঁশবাগানের পথ দিয়ে একটিমাত্র জায়গায় যাওয়া যায়, সেটি হল গোরে-

বাড়ির ভাঙা কেল্লা, ভূতেদের থান! দিনের বেলাতেও ও-পথে কেউ যায় না। কাগ-চিল, কুকুর-বেড়ালও না।”

লোকটা ভয়ে ভয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে উল্টো দিকের মাঠের পথ ধরল। সকলে হাঁপ ছেড়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমিও সেই সুযোগে ঐ লোকটির পিছন পিছন চললাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মাঠ ভেঙে ঘুরে সে আবার বাঁশ বাগানের ও-পারে, সেই রাস্তাটাই ধরল। আমি তার পিছনে 'নেই' হয়ে চললাম। শুকনো পাতার ওপর এতটুকু পায়ের শব্দ হল না, নইলে এতদিন কি শিখলাম!

তার পরেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কেল্লা। সেখানে পোঁছে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। কেল্লার চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে, চারি দিকে এমনি ঘন বন হয়ে গেছে যে, তার বেশি কিছু ঠাওর হল না। লোকটা একটুও দাঁড়াল না, সটাং বনের মধ্যে দিয়ে সেঁদিয়ে গিয়ে, কেল্লার লোহা-বাঁধানো প্রকাণ্ড সদর দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। আমিও তার সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরে সেঁদিয়ে গেলাম ; সে কিছু টেরই পেল না। ঢুকেই একটা প্যাসেজ, তার ও-ধারেই মস্ত ঘরে সভা বসেছে। সে কী ভিড় আর কী ভয়ঙ্কর তর্কাতর্কি! ঘরে একটা জানলা নেই, উঁচু ছাদে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে, তাও এমন আড়াল করা যে বাইরে একবিন্দু আলো যাচ্ছে না। যদিও ঘরে কয়েকটা ডে-লাইট বাতি জ্বলছে, তাতে ঘরের অন্ধকার কাটছে না, ঘুপ্সি ঘুপ্সি ভাব, একটা সোঁদা গন্ধ, পায়রার, নাকি বাদুড়ের বা অন্য বিকট কিছুর কে বলতে পারে।

সেই অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে যেতে যেতে বুঝলাম যে কেউই আলো চায় না : কারো মুখ চেনা যাচ্ছে না ; সকলের একরকম কাপড়চোপড়, চেহারা, ঘাড় গুঁজে বসার আর আড়চোখে চাওয়ার অভ্যাস। এদের সঙ্গে আমার এতটুকু তফাত নেই দেখে, নিশ্চিন্তে অদৃশ্যভাবে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম দরজার কাছে। বেরুবার পথ ঐ একটি, আর সব বন্ধ, হয়তো একশো বছর খোলা হয় নি, খোলা যায়-ও না।

ফ্যাঁসফেঁসে বেড়ালে গলায় যা বলা হচ্ছিল তার কতক কতক বুঝতে পারলাম। এরা ইউনিয়ন করতে চায়, কিন্তু শত্তুরদের জ্বালায় কিছু হয়ে উঠছে না। আজকের ঐ কুখ্যাত নির্জন জায়গায় কারো অনধিকার প্রবেশের কোনো সম্ভাবনাই নেই—হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা থামের পাশের সব চাইতে অন্ধকার কোণ দিয়ে সর্-সর্ করে কেউ ছাদের অস্পষ্টতা থেকে নেমে এসে, আমার থামের ও-পাশে দাঁড়াল। আমার গা শিউরে উঠল।

বক্তা তাঁর সরু সরু হাত-পা নেড়ে বলে চললেন, “সাধারণ নাগরিকদের অধিকার থেকে কেন আমাদের বঞ্চিত করা হবে? জনতা থেকে আমরা অভিন্ন ; আলাদা করে চিনুক তো কেউ! বলুক দেখি আমরা কেমন দেখতে, কেমন গলার আওয়াজ! আমাদের—” আমার গা শিউরে উঠল! আরো গোটা দশেক ছায়া ছায়া মতো এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আবছায়াতে মিশে রইল।

বক্তা একটু ইতস্তত করে বললেন, “আমাদের একটা আস্তানার দরকার ছিল, এর চাইতে ভাল আস্তানা কোথায় পাওয়া যাবে? আমরাই তো আসল অশরীরী, সকলের চোখের কাজ করি, কেউ আমাদের দেখতে পায় না। এই ছোট ইঁটের টুকরো ফেলে আজ এখানে আমাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা—” এই অবধি বলে ইঁটটা হাতে করে তুলেছে, অমনি ঘরে একটা শোরগোল উঠল, না, না, না, না—তার পরেই মানে হলঘরের আনাচ-কানাচ থেকে পঁচিশ-ত্রিশটা ছায়ামূর্তি বক্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি অদৃশ্যভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বক্তা একটা কোঁক্ শব্দ করে বসে পড়ল।

হঠাৎ বক্তার পাশে বসা ছুঁচোমুখো একটা লোক গর্জন করে উঠল, "নটে! ভজা! কার্তিক! কচ্ছিসটা কি? এই সমস্যা!" সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য ভাব ছেড়ে দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ছোকরা খালি হাতেই মঞ্চের উপর উঠে পড়ে। ওরে বাপ্ রে! সেই ছায়া-মূর্তিগুলোকে পেল্লায় পেটাতে লাগল। সেই ফাঁকে বক্তা উঠে পড়ে দে দৌড়।

আমি এমন পেট্নাই জন্মে দেখি নি। আগন্তুকদের আগাপাশতলা ধাঁই-ধড়াক্কা মার! তার মধ্যে কে রব তুলল, "ব্যাটারা সব পুলিশের চর, অশরীরী সেজে এয়েচেন। লাগা! লাগা! ভজা, দেখছিস কি?" ভজা বললে, "পেছলে যাচ্ছেন যে!"

শেষটা তাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেই হল। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে মঞ্চ থেকে নেমে, স্রেফ জলের স্রোতের মতো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গলে, ঘরের একটি মাত্র দরজা দিয়ে সব নিমেষের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল! ধন্যি পুলিশের ট্রেনিং।

হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্য বোধ হয় ভিড় থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হয়ে পড়েছিলাম! কারণ পালাতে পালাতে শেষের লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে একরকম কোল-পাঁজা করে তুলে ধরে বাইরের জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলে বলল, "চ'লে চ'ল্! চ'লে চ'ল্! দে'খছিস কি'!" বলে একটা শ্যাওড়া গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়ল।

ততক্ষণে ডে-লাইট হাতে নিয়ে নটে-ভজারাও দোরগোড়ায় দেখা দিয়েছে। সেই আলোতে দেখলাম যে লোকটা গাছে চড়ছে, তার গোড়ালি দুটো সামনের দিকে! তক্ষুনি গাছ-গাছড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে মুর্চ্ছো গেলাম। ওরা বোধ হয় আমাকে খুঁজে পায় নি। অবিশ্যি আমি যে আছি, তাও ওরা জানত না। খুঁজবে কাকে?

বড় সাহেবের কাছে আর যাই নি। আজকাল খবরের কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। অবিশ্যি একেবারে 'নেই' হয়ে।

ট্যাঁপার অভিজ্ঞতা

অনেক দিন আগের ঘটনা, লিখেওছিলাম এ বিষয়ে সে সময়ে, তবে তার কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। সত্যি না বানানো যদি জানতে চান তাহলে বলি, যে গল্প শুনবে তার অত খবরে কি দরকার? তার কাছে যে-ঘটনা বানানো আর যে ঘটনা কোন্ কালে চুকে-বুকে গেছে, তাতে কি তফাত? ব্যাপারটা শুনুন তো আগে।

আজকের আধ-বুড়োদেরও নিশ্চয় মনে আছে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে সবাই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে নানান্ অস্বাস্থ্যকর আর বিপদসঙ্কুল জায়গায় গিয়ে নিরাপত্তা খুঁজেছিল। সেই সময়ে আমার এক খুড়োর বাড়ির সকলে ঠিক করলেন মাস ৬-৭-এর জন্য কার্সিয়াং গেলে ভালো হয়। সেখানে একটা ছোট বাড়ি খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। স্বাস্থ্যকর জায়গা; চমৎকার দৃশ্যাবলী। তা বড় পিসিমা কিছুতেই অ-দেখা বাড়িতে যাবেন না, তাই তাঁর নাতি ট্যাঁপাকে পাঠানো হল একবার সে দেখে

আসবে।

ট্যাঁপাকে পায় কে! ছোট একটা সুটকেসে গরম কাপড়চোপড় আর একটা মোটা কম্বল পুরে সে তো রওনা দিল। বড় বাজারে মালিকের অফিস থেকে চাবি নিতে গিয়ে শুনল, চাবির দরকার নেই, বাড়ি খোলা, তোষক বালিশ মায় বাসনপত্র সব আছে। বললেই চৌকিদার সব খুলে দেবে, তাকে পোস্টকার্ড দেওয়া হয়েছে।

যথা সময়ে ট্রেন থেকে নেমে, সুটকেসটা কাঁধে করে ভাও-হিল্ রোড দিয়ে ট্যাঁপা চলল। চমৎকার জায়গা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে পথ উঠেছে, বাঁকে বাঁকে খুদে দোকান আছে, সেখানে পান বিড়ি দেশলাই কেরোসিন চাল ডাল আলু নুন সব পাওয়া যায়।

অর্ধেক পথ উঠে ডান হাতে ছোট্ট রাস্তা বেরিয়েছে। একটা মোড় নিয়েই ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। এ অঞ্চলে ঐ একটাই বাড়ি। লাল টিনের ছাদ, সবুজ দরজা-জানলা। লাল রঙের কাঠের গেট। সেটি ক্যাঁচ্ করে খুলে, ভেতরে গিয়ে ট্যাঁপা "চৌকিদার! চৌকিদার!" করে মেলা হাঁকডাক করেও যখন সাড়া পেল না, তখন নিজেই সামনের কাচের দরজাটি ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

লম্বা হলঘর, নারকেলের ছোবড়ার ম্যাটিং পাতা। সোফা চেয়ার টেবিল, মায় ছাতা-টুপি রাখার একটা আয়না দেওয়া র‍্যাক্ পর্যন্ত রয়েছে। শোবার ঘরের সুইচ্ টিপে দেখল আলো জ্বলছে, চানের ঘরের কল খুলতেই জল এল। খাসা বাড়ি। এখানে ৬-৭ মাস আরামে কাটানো যাবে। কাল সকালেই ফিরে যাবে। সঙ্গে দুবেলার জন্য প্রচুর খাবার।

ঠিক সেই সময় চারদিক ঝেঁপে বৃষ্টি এল। পাহাড়ে যেমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশায় আকাশ, পাহাড়, উপত্যকা সব লেপেপুঁছে একাকার হয়ে গেল। দিন না রাত কারো বুঝবার জো রইল না। এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে ট্যাঁপা দেখে এক রোগা ফিরিঙ্গি বুড়ো, হাতে একটা ছোট ব্রীফ্-কেস্, ভিজে চুপ্পুড়। কোথায় আছাড় খেয়েছে, প্যান্টের হাঁটুতে শ্যাওলা আর কাদা লাগা, গাল-বসা, ফ্যাকাশে মুখ। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত-কপাটি লাগছে।

সাহেব বলল, "ভিতরে আসতে পারি কি?"

ট্যাঁপা বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, এমন দিনে কেউ কুকুর-বেড়ালকেও ফিরিয়ে দেয় না। এসো, ভিজে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আমার গরম পাজামা-সুট পরো। চা আছে, খাও।"

শোবার ঘরের দুটি খাটে বিছানা পাতা, একটি করে কম্বল। সাহেব চা খেয়ে বিছানায় ঢুকবার আগে ব্রীফ্ কেস্ খুলে রাশি রাশি একশো টাকার নোট বের করে ম্যাটিং-এর উপর শুকোতে দিল। দুটো কম্বলেও তার শীত যায় না দেখে, ট্যাঁপা তার সাধের গরম জলের ব্যাগটি পর্যন্ত তার পায়ের কাছে ঠুসে দিল।

তারপর খাবারদাবার খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে, নিজেও অন্য খাটে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। তিন দিন ছিল প্রবল বৃষ্টি। খাবারদাবার শেষ। রান্নাঘরে পুরনো প্রাইমাস স্টোভ ছিল, ছেঁড়া একটা ছাতাও ছিল। ট্যাঁপা মোড়ের দোকান থেকে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ তেল এনে, স্টোভ ধরাতে গিয়ে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় আর কি! ছাদ অবধি আগুন উঠল। সাহেব দৌড়ে এসে, তারি মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কলটা খুলে, আগুন কমাল। বড় ভালো মানুষটা। জ্বর গা, কিছু খেল না, শুধু চা আর কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক। নোট-গুলো সম্বন্ধে বললও না কিছু। শুকোলে আবার ব্রীফ্ কেসে ভরে রাখল। তৃতীয় দিন সকালে রোদ এসে ঘর ভরে দিল, আকাশ ঘন নীল, মেঘের চিহ্ন নেই। ট্যাঁপা তার জিনিসপত্র গুছিয়ে সায়েবের কাছে বিদায় নিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। বলা বাহুল্য

কলকাতায় ফিরে শুনল তার দেরি দেখে ইতিমধ্যে ঘাটশীলা যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। জিনিসপত্র নিয়ে বড় পিসিমারা আগের দিন রওনা হয়েও গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এর পর ১৫ বছর কেটে গেল। ট্যাঁপা তখন দস্তুরমতো সংসারী। হঠাৎ এক পুজোর ছুটিতে কার্সিয়াং যাবে ঠিক করল। খুব সহজেই সেই বাড়িটিই পাওয়া গেল। এবার ট্যাঁপা নিজেই উদ্যোগী হয়ে আগে গেল বাড়ির অবস্থা দেখে আসতে। এবার সঙ্গের সুটকেস স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় রেখে, খালি হাতে বাড়ি দেখতে গেল। সেদিন বিকেলেই ফেরার ইচ্ছে।

সেই বাড়ি ; সেই একটু ঝুলে-পড়া পাকা গেট ক্যাঁচ্ করে খুলে গেল। সেদিনও চৌকিদার এল না ; কিন্তু সদর দরজা খুলে গেল ; আলো জ্বলল, কলে জল এল। আর সেই ১৫ বছর আগের মতো চারদিক অন্ধকার করে, আকাশ পাহাড় উপত্যকা লেপেপুঁছে বৃষ্টি নামল।

তারি মধ্যে সদর দরজায় কে ধাক্কা দিল, মনে হল ঘড়ির কাঁটা ১৫ বছর ফিরে গেছে। দরজা খুলেই ট্যাঁপা দেখল এক রোগা ফিরিঙ্গি বুড়ো, হাতে ছোট ব্রীফ্-কেস্, ভিজে চুপ্পুড়। কোথায় আছাড় খেয়েছে, প্যান্টের হাঁটুতে শ্যাওলা আর কাদা। ঠক-ঠক করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁত-কপাটি লাগছে। গাল-বসা ফ্যাকাশে মুখ।

সাহেব বলল, "ভিতরে আসতে পারি কি?" ট্যাঁপা দরজাটা হাঁ করে খুলে দিয়ে, সাহেবের পাশ কাটিয়ে, সেই জল-ঝড় মাথায় করে, এলোপাথাড়ি পাহাড়ের পথ ধরে স্টেশনের দিকে ছুট দিল। ফিরেও দেখল না সাহেব কি করছে।

ভয়

ছাপাখানাটি খুব ছোট হলেও সারাদিন সেখানে কাজ হত। ছুটি হতে হতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যেত। ছাপাখানার পাশে একটা চায়ের দোকান ছিল। কুড়ি পয়সা দিলে এক ভাঁড় গুড়ের চা আর ঝালঝাল আলু-চচ্চড়ি দিয়ে মোটা একটা হাতরুটি পাওয়া যেত। খেয়েই বঙ্কু রওনা দিত। দুটো বাড়ি, তারপরেই বন। এসব জায়গায় কোথায় শহর শেষ হয়ে বন শুরু হল বলা মুস্কিল। শহর বলতে অবিশ্যি খুবই ছোট শহর। গ্রামও বলা চলে। তবে ছাপাখানায় অনেক বাইরের লোক কাজ করত। তারা ঐ গ্রামেই থাকত। গ্রাম বললে চটে যেত, বলত ছোট শহর।

বনের মধ্যে শালগাছই বেশি। মাঝে মাঝে পলাশ, মহুয়া, শিমুল, বুনো তাল। দিনের বেলায় চমৎকার। সন্ধ্যে হলেই মুশকিল। ছায়া-ছায়া ; অদ্ভুত সব শব্দ। গুরু-শিষ্য প্যাঁচা ডাকে। বনের নাম ঘনার বাদা। এককালে এখানেই কুখ্যাত ঘনা-ডাকাতের আস্তানা ছিল। সে প্রায় একশো বছর আগে। তখন কি দিনে কি রাতে, কেউ পারলে

এ-বনের ধারে-কাছে আসত না।

রাতে এখনো আসে না। দিনে মধু আর আঠা নিতে এলেও, রাতে আসে না। ঘনা নাকি এখনো ডাকাতি ছাড়ে নি। অনেকে নাকি দূর থেকে তাকে দেখে অমনি চোঁ-চোঁ দৌড় দেয়।

বঙ্কুর নাইট-স্কুলটা বনের ওপারে। লেখাপড়া শিখতে হলে কষ্ট করতে হয়। বাবার ডান পা কাটা গেছে, পেনশন যা পায় তাতে ওদের চলে না। তাই বঙ্কুকে ওদের হাইস্কুল ছেড়ে, এই নাইট স্কুলে পড়তে যেতে হয়। অন্য দিন সঙ্গে লখা থাকে। ওর বন্ধু লখাও ছাপাখানায় কাজ করে। দুজনে থাকলে ভয় করে না। ঘনা একা, লোক খোঁজে।

তখনো আলো ছিল। হয়তো ছ'টা বেজেছিল। শাল গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছিল। পাখি ডাকছিল। ঝোপে-ঝাড়ে খুস্-খুস্ খর-খর। বঙ্কু আধ ঘণ্টার মধ্যে বন পার হয়ে, বন-বিভাগের আপিসের গায়ে লাগা নাইট-স্কুলে পেঁছে গেল।

বঙ্কুর বয়স চোদ্দ। আর তিন বছরে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে, ছাপাখানার কাজ শেখার স্কুলে ভরতি হবে। পরীক্ষার জন্যেও তৈরি হবে, আবার রোজ পাঁচ ঘণ্টা কাজ করার জন্য মাইনেও পাবে। আরো তিন বছর পরে পাস করে বেরুলে সরকারী কাজ পেয়ে যাবে। মা-বাবা সেই আশাতেই আছেন। ছোট বোন নুটুও বলে, "দাদা আমাকে বড় পুতুল কিনে দেবে।"

তাই মন দিয়ে পড়ে বঙ্কু। পড়তে পড়তে ভাবে এরপর আবার বন পার হতে হবে। একা। এক সময়ে ছুটি হয়ে গেল। তখন রাত ন'টা। বঙ্কু আজ একা বনের পথ ধরল। সঙ্গে আলো ছিল না। আলো কোথায় পাবে, টর্চের বড্ড দাম। একটা বটগাছের কোটরে লখা কয়েকটা শুকনো বাঁশের আগা ছেঁচে শুকনো পাতা জড়িয়ে মশাল বানিয়ে, লুকিয়ে রেখেছিল। বঙ্কু সেই একটা বের করে শহরের শেষ পান-বিড়ির দোকান থেকে ধরিয়ে নিল।

জগাদা বলল, "একা যাচ্ছিস নাকি? আজ আবার অমাবস্যা। লখা কোথায়?"

"লখার জ্বর।"

"না হয় আমার এখানে চাট্টি খেয়ে শুয়ে রইলি। সকালে বাড়ি যাস্।"

"মা-বাবা ভাববে, জগাদা।"

মশাল ধরিয়ে বঙ্কু রওনা হল।

মশালে যেমন আলো-ও হয়, তেমনি আবার মনে হয় চারদিকে গাছের ছায়াগুলো নড়ছে-চড়ছে। বঙ্কু পা চালিয়ে এগোতে লাগল। হঠাৎ শুনল ছোট ছেলের কান্না। বঙ্কুর গায়ের রক্ত হিম। ও নিশ্চয় সত্যিকার ছোট ছেলের কান্না নয়, অন্য কিছুতে ওকে ভোলাবার জন্য ঐ রকম শব্দ করছে।

কোনো দিকে না তাকিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল বঙ্কু। ছোট ছেলেটার কান্না থামল না। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, আবার ফোঁপাতে থাকে। নুটু আগে ঐ রকম করে কাঁদত।

বঙ্কু মশাল নিয়ে চারদিক খুঁজতে লাগল। জায়গাটা বড্ড ঘুপ্‌সি। তার মধ্যে বেদেরা খরগোশ ধরবার ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কামড়ানো ফাঁদ। গোটা দুই খরগোশ পড়েছিল আর একটা ছোট ছেলে। কাঠুরেদের ছেলে কি না কে জানে। এ জায়গা ভালো না। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু ছেলেটার মুখে আলো পড়তেই, বঙ্কু দেখল তার চোখের কোণে জল জমেছে, ঠোঁট কাঁপছে। হয়তো বছর তিনেক বয়স। বঙ্কু তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ফাঁদের কাটা কাটা দাঁতগুলো তার একটা পায়ে কামড়ে বসেছিল। সঙ্গে একটা সবুজ ডালেও কামড় পড়েছিল বলে পা-টা কেটে পড়ে যায় নি।

হঠাৎ কানের কাছে ফোঁস্ শব্দ শুনে দেখে কুচকুচে কালো একটা লোক, কপালে কাটার দাগ, লাল লাল চোখ, উঁচু উঁচু দাঁত, বিকট চেহারা। কিন্তু লোকটা নরম গলায় বলল, "টেনে খুলো না, বাপু, পা কাটা যাবে। দাঁতের ফাঁকে ঐ পাথরটা গোঁজ।" মশালটা পাথরে ঠেকা দিয়ে, ছোট একটা অসমান ঢিল নিয়ে আস্তে আস্তে ফাঁদের দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিতেই, ফাঁদের হাঁ বড় হল। বঙ্কু ছেলের ঠ্যাংটা টেনে বের করে আনল। ছেলেটা নেতিয়ে পড়ল। বঙ্কুর হাত পা ঠাণ্ডা।

কালো বিকট লোকটা বলল, "না, না, কিছু হয়নি। ব্যথার চোটে অচৈতন্য হল। ঐ যে তোমার ডান হাতে ছোট ছোট পাতা দেখছ, ঐ খানিকটা পাথরে ঘষে লাগিয়ে দাও। দেখতে দেখতে ঘা সেরে যাবে।"

তাই করল বঙ্কু। লতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিল। তারপর ছেলেটাকে কোলে করে উঠতেই, লোকটা বলল, "আমার পা-টা কেউ বাঁচায়নি গো, আঙুলগুলো সব কাটা পড়েছিল।" ওর পায়ের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল বঙ্কু। ডান পায়ে একটাও আঙুল নেই।

এমন সময় দূরে মশালের আলো দেখা গেল আর ডাক শোনা গেল। নাকু-উ-উ-উ। হারে নাকু-রে-এ-এ! সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেহারার লোকটা কোথায় যে সরে পড়ল, তার ঠিক নেই। ছেলেটাকে খুঁজতে এসেছে গাঁয়ের লোকরা। সঙ্গে সঙ্গে এসেও পড়ল। পাগলের মতো চেহারা ঐ বোধ হয় ছেলের মা। বঙ্কুর কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বারবার সে বলতে লাগল, "বাঁচি থাক, সুখী হ, ভগবান তোর ভালো করুক।"

কাঠুরেদের ছেলেটা নাকি ভারি দুরন্ত! কেমন করে দল-ছাড়া হয়ে গেছিল। তারপর হাসতে হাসতে সবাই দল বেঁধে গ্রামে ফিরল। ছেলের বাপ হঠাৎ বলল, "বড় বাঁচিয়েছিস্, বাপ্, খনার হাতে পড়লে উকে আর দেখতে পেতাম না। খনা বড় ভয়ঙ্কর!"

বঙ্কু বলল, "কেমন দেখতে খনা?"

"কি জানি! কাছে গেলে তো নিঘ্যাত মিত্যু! শুনেছি কালো কুচকুচে, কপাল কাটা আর ডান পায়ে একটাও আঙুল নেই। বড় ভয়ঙ্কর সে।"

বঙ্কুর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল।

সে বলল, "না, না, খনা বড় ভালো, মোটেই ভয়ঙ্কর নয়।"

এরপর নাকি খনাকে আর কেউ কখনো দেখেনি।

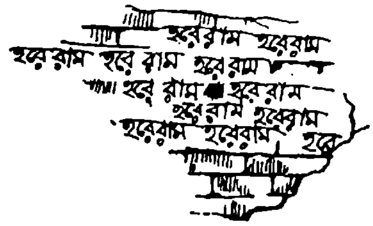

তেপান্তরের পারের বাড়ি

নটের বেশি সাহস। সে বলল, "কি যে বলিস, গুরু! লোকে বলে তেপান্তরের মাঠ জায়গা ভালো নয়। তোর যেমন কথা! আরে, লোকে তো এও বলে যে নটে-গুরু ছেলে ভালো নয়!" বলতেই গুরু ফিক্ করে হেসে ফেলল।

তা ছাড়া একেবারে দশ-দশটা টাকা কেই-বা দিচ্ছে কাকে? ওখানে এক রাত্তির বাস করলেই বাড়ির মালিক যদি ঐ অতগুলো টাকা দেয়, তা হলে থাকবে নাই-বা কেন? নাকি একশো বছর কেউ ওখানে রাত কাটায় নি। মনে পড়তেই গুরু অবাক হল, "হ্যাঁরে নটে, সত্যি কেউ রাত কাটায় না?"

"কেউ না, কেউ না, উদ্বাস্তুরাও তেপান্তরের মাঠ পার হয় না।"

আড়চোখে গুরুর দিকে চেয়ে নটে বলল, "কেউ কিছু বললে নাহয় পালিয়ে আসব। তাই বলে এমন একটা সৎ-কাজ করব না?"

তাই বটে। ওখানে রাত কাটাতে পারলে, বাড়িওলার বাড়ি বিক্রি হবে, কল্যাণ সংঘ সস্তায় ওটা কিনবে, কিনে ভেঙে ফেলবে, এক দঙ্গল লোক মজুরি পাবে। উদ্বাস্তুরা মিনি-মাগনায় ইঁট-কাঠগুলো পাবে, নতুন বাড়ি উঠবে, মুটে, মজুর, মিস্ত্রি, ঠিকাদার, সকলের কম-বেশি রোজগারপাতি হবে। যাদের কেউ নেই তারা সেখানে থাকবে, ইস্কুল হবে, কাঠের আসবাবের কারখানা হবে, বই বাঁধাইয়ের দোকান হবে, হাঘরেরা চাকরি পাবে. আর—আর নটে-গুরুও দশ টাকা পাবে।

বাড়ির মালিক কালো চশমার ভিতর দিয়ে ওদের মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বললেন, "খারাপ জায়গা হলে থাকতে বলব কেন? আমার নিজের ঠাকুরদার বাবার তৈরি, চার দিকে আম জাম কাঁঠাল নারকোলের গাছ, তার বাইরে একমানুষ উঁচু পাঁচিল। অথচ কেউ না থাকলে কল্যাণ সংঘের বাবুরা কিনবে না। শোনো একবার কথা! অমন ভালো বাড়ি. পূব-দক্ষিণ খোলা, আদি গঙ্গার ধারে।"

নটে বলল, "আপনি নিজে গিয়ে একরাত থেকে ওদের দেখিয়ে দিন না কেন? আপনার দশ টাকা বেঁচে যায়।"

মালিক বললেন, "দশ টাকা বেঁচে যায়? দশ টাকাকে আমি নস্যির মতো মনে করি। তোরা একটি রাত কোনোরকমে থাক-না বাপু, দশ কেন পনেরো টাকা দেব। আজ রাতেই যা।"

তাই শুনে গুরু নটের দিকে তাকাতেই মালিক বললেন, "কচুরি, আলুর চাট, মিঠে গজা আর লিমনেট টিফিন দেব সঙ্গে। কিন্তু সব ঘরের দেয়ালে হরিনাম লিখে আসতে হবে। তবেই কল্যাণ সংঘ বিশ্বাস করবে অপদেবতা-টেবতার বাস নয় ও বাড়ি। বলে কিনা আমার অতি বড় বৃদ্ধ প্রপিতামহ দুই সন্ধে শিবপুজো করতেন!"

নটে-গুরু চলে গেল, মালিকের বউ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তেরিয়া হয়ে বলল. "একটু দয়া-মায়াও নেই শরীলে? দুধের বাছাদের দিলে পাঠিয়ে ভূতের খপ্পরে! বলি. তুমি কি মানুষ?"

শুনে মালিক অবাক. "কাকে দুধের বাছা বলছ? ওদের দেখলে দুধ কেটে ছানা

বেরোয়। ওরা হল গিয়ে কালীঘাটের মার্কামারা ছোঁড়া! বাড়িটা বিক্রি হয় তুমি চাও না? ভূত ভাগাতে ওরাই পারবে। উপরন্তু টাকাও পাবে।”

এর ওপর আর কথা চলে না।

পরে গুরু বলল, “সন্ধে অবধি অপেক্ষা করে কাজ নেই, রোদ থাকতে থাকতেই চল্, তেপান্তর পেরিয়ে ওখানে গিয়ে আড্ডা গাড়ি। টিফিন তো বুড়োই দেবে বলেছে। অন্ধকারে তেপান্তরে গা ছম্-ছম্ করবে।”

যেমন কথা তেমনি কাজ। পাঁচটা না বাজতেই মালিকের বউয়ের রান্নাঘর থেকে পুরোনো একটা চুপড়ি ভরে কচুরি, আলুর চাট, জিবে গজা, কাঁচকলার আচার আর থলিতে চার বোতল লেমোনেড নিয়ে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে নটে-গুরু তেপান্তরের ওপর দিয়ে পুবমুখো হাঁটা দিল। ওদের সামনে সামনে সরু লম্বা হয়ে ওদের ছায়া দুটোও চলল। গুরু থমকে দাঁড়িয়ে নটেকে বলল, “হ্যাঁরে, সত্যি আমাদের ছায়া তো? মানে আর কিছু যদি সঙ্গে—” নটে ওর কান টেনে, ঘাড়ে রদ্দা মেরে দেখিয়ে দিল ওদেরই ছায়া বটে।

খুব বড় মাঠের জায়গাই-বা হবে কোত্থেকে ঐ এলাকায়। দেখতে দেখতে ডাঙা পেরিয়ে ওপারের রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে ওদের চক্ষুস্থির! বলে নাকি একশো বছর কেউ বাস করে নি ও বাড়িতে! নটে-গুরু দেখল বাড়ি লোকজনে গম্‌গম্ করছে। আশে-পাশের যত উদ্বাস্তুদের সব চাইতে বদমাইস ছেলেমেয়েরা ঐ বাড়ির বাগানে জমায়েত হয়ে, সে কি হুল্লোড় লাগিয়েছে! সিকি কিলোমিটার দূর থেকে তাদের হৈ-চৈ, হ্যা-হ্যা হাসি, চ্যাঁ-ভ্যাঁ কান্নায় কানে তালা লাগার জোগাড়।

এ আবার কি গেরো রে বাবা। ওরা যে কাউকে ও-বাড়ির ত্রিসীমানায় এগোতে দেবে তা তো মনে হয় না। আম-কাঁঠাল গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, ফটকে চড়ে কম করে কুড়িটা ছেলেমেয়ে দোল খাচ্ছে। কেউ গেঞ্জি পরা, কেউ জাঙিয়া পরা, কেউ উদোম গায়ে কুচ্‌কুচে কালো রঙ, উস্কোখুস্কো মাথার চুল, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। কারো হাতে ঢিল, কারো হাতে চ্যালা কাঠ। এগোয় কার সাধ্যি!

নটে বলল, “থামলি যে বড়? বাড়ির ভিতর ঢুকে দ্যালে হরিনাম লিখতে হবে না? বাড়ি তো বন্ধ দেখছি, চাবি-টাবিও দেয় নি বুড়ো। নাকি কোন্ কালে হারিয়ে গেছে।”

ছোট-ছোট এক রাশি পাথরের কুচি ওদের গায়ে মাথায় এসে পড়ল। রাগলে গুরুর জ্ঞান থাকে না, চটে-মটে বলল, “কি হচ্ছেটা কি?” একটা টিঙটিঙে রোগা ছেলে আঙুল দিয়ে চুপড়ি দেখিয়ে বলল, “কি আছে রে ওতে?”

“আমাদের টিফিন। এই বাড়িতে রাত কাটাব, তাই টিফিন এনেছি।” অমনি বিচ্ছু-গুলো বলে কি না, “এ্যাঁ! তাই নাকি? তা টিফিনটা কি জিনিস বাপু?”

নটে বলল, “কচুরি, আলুর চাট, জিবেগজা, কাঁচকলার আচার।” তাই শুনে আম-গাছের ওপর থেকে বিশ-পঁচিশটা একসঙ্গে বলে উঠল, “বলিস কিরে! তা আমরাও তো এখানে রাত কাটাব। দে দে আমাদেরও ভাগ দে। এই-না বলে একটার ঠ্যাং আরেকটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে বিশ হাত লম্বা একটা দুষ্টু ছেলের মালা বানিয়ে নটের হাত থেকে টিফিনের চুপড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে, ঢাকনি খুলে, এক খাবলা এ খায় তো আরেক খাবলা ও খায়, এক নিমেষে চুপড়ি খালি করে ফেলে দিয়ে, ফটক হাট করে খুলে দিয়ে বলল, “আয় আয়, ভিতরে আয়, আমাদের এত খাওয়ালি, তোরা আমাদের বন্ধু।”

নটে-গুরুর মুখে কথাটি নেই। তবে বদমাইশ দেখে ভড়কাবার পাত্র ওরা কেউ ছিল না। ওরা ভাবছিল এই তো ভালো হল, খাবারটা গেল তার আর কি করা যাবে। এমন তো আর নয় যে না খেয়ে রাত কাটিয়ে ওদের অভ্যেস নেই। এবার এদের দিয়েই বাড়ি

খুলিয়ে দেওয়ালে হরিনাম লিখিয়ে কোনো মতো রাতটাকে ভোর করতে পারলেই হয়ে যাবে। তার পর কল্যাণ সঙ্ঘ এসে উদ্বাস্তু তুলুক, কিম্বা যা-খুশি করুক নটে-গুরুর কোনো আপত্তি নেই।

ওদের ঘিরে দাঁড়াল ছেলেমেয়েগুলো, "বল্‌ তোদের জন্য আমরা কি করতে পারি? তোদের মতো কেউ হয় না রে, বাপ্‌!" নটের সাহস বেশি, সে বলল, "তবে শোন, আমরা কেন এইচি বলি। এই বাড়িতে রাত কাটালে, বাড়ির মালিক আমাদের পনেরো টাকা দেবে বলেছে!" শুনে ওদের কি হাসি! "ধেৎ! তাই কখনো দেয়! বলে দোর-গোড়ায় মলেও মুখে একমুঠো গরম ভাত কেউ দেয় না।" অমনি সকলে চাকুম্‌-চুকুম্‌ ঠোঁট চেটে বলল, "ই-ই-স্‌! গরম গরম ভাত কি ভালো জিনিস রে বাবা!"

ওদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা, সব চেয়ে রোগা, সব চেয়ে কালো যে তার নাম নাকি ঢ্যাঙা। সেই ঢ্যাঙা বললে, "তা বললে তো হবে না, চাঁদ। মিছিমিছি পনেরো টাকা দেবে কেন? একসঙ্গে পনেরো টাকা তো আমরা কেউ চক্ষেও দেখি নি!"

গুরু বলল, "মিছিমিছি নয়। এখানে কেউ রাত কাটাতে পারলে, কল্যাণ সঙ্ঘের বাবুরা বাড়িটা কিনবে, আশ্রম বানাবে, ইস্কুল করবে, ছুতোরের দোকান করবে, বই বাঁধাবার কারবার করবে—"

হেঁড়ে গলায় ঢ্যাঙা বলল, "তা ঐ আশ্রমে কে থাকবেটা শুনি?" "কেন, যাদের কেউ নেই, বাড়িঘর নেই, তারা থাকবে।" হি হি করে হেসে একদল বলে উঠল, "আমাদের তো বাড়িঘর নেই, কেউ নেই। তা হলে আমাদের মতো ছেলেমেয়েরা থাকবে বলছিস!" ভাত রাঁধা হবে তাদের জন্য? রোজ রোজ ভাত, রুটি, খিচুড়ি এই-সব হবে!" সদরের তালাটা খুলে দিতে পার?" দেখা গেল উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েগুলো লোক খারাপ নয়। অমনি ওরা হাঁক পাড়ল, "গিরগিটি রে, ওরে গিরগিটি, কোথা গেলি?" বলতে বলতে একটা হিল্‌হিলে রোগা ছেলে এসে বলল, "কেন, কি করতে হবে?"

"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, শুধু দেয়াল বেয়ে তিন তলার ছাদে উঠে, চিলেকোঠার শিকলি খুলে বাড়ির সব দোর-জানলা খুলে দে।"

ব্যস্‌, আর বলতে হল না। যেমন কথা তেমনি কাজ। সত্যিকার গিরগিটির মতো সর্‌-সর্‌ করে দেয়াল বেয়ে ছেলেটা ওপরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব দরজা-জানলা খুলে হাট করে দিল। শুধু তাই নয়, কোত্থেকে সব কাঠকয়লার টুকরো, ভাঙা ইঁটের কুঁচি এনে, এর পিঠে ও চেপে, দেখতে দেখতে প্রত্যেক ঘরের ছাদ থেকে নীচে পর্যন্ত হরিনাম লিখে ফেলল! নটে-গুরু হাঁ।

এর মধ্যে কখন সূর্য ডুবে গেল, চারি দিকে অন্ধকার নেমে এল, শুকনো কাঠের মশাল জ্বালা হল, বোধ হয় গাছ নেড়িয়ে কাঁচা আমের গুটি তুলে এনে কচ্‌কচিয়ে টিপিন খাওয়া হল আর সে কি চ্যাঁচামেচি, গান, তিড়িং-বিড়িং নাচ আর হ্যা-হ্যা হাসি! এরকম ছেলেমেয়ে বাপের কালে কখনো ওরা চোখে দেখে নি। কখন যে কোন ফাঁকে রাত কেটে ভোর হয়ে এল তা-ও ওরা টের পেল না। শেষে এক সময় ছেলেমেয়েগুলো ওদের ঠেলা দিয়ে বলল, "ওকি! ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, আগে কথা দাও হঙক-বঙকরা সত্যি সত্যি এখানে ইস্কুল করবে, রোজ ভাত রেঁধে ছেলেদের খাওয়াবে। নইলে সব পণ্ড করে দেব। বাড়ি ছেড়ে এক চুল নড়ব না।"

নটে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ হবে, হবে। তোদের তখন এ-বাড়িতে আর হুল্লোড় করা হবে না। বলিস তো লিখে দিচ্ছি!" শুনে ওদের সে কি খিল্‌ খিল্‌ হাসি! "পড়তেই জানি না তো লিখব কি রে! আচ্ছা, তোদের মুখের কথাতেই হবে।"

এর পর ওরা ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। জাগল অনেক বেলায়, চার দিক ভোঁ-ভোঁ, কারো

টিকির দেখা নেই, গেছে সব নিশ্চয় ওদের উদ্বাস্তু কলোনিতে। দুপুরে এসে আবার নিশ্চয় আমগাছের ডাল ভাঙবে। ভাঙুক তো, ওদের কথা মালিককে বলে দরকার নেই। শেষটা যদি কলোনিতে গিয়ে মালিক গোল বাধায়!

মালিকের কাছে কল্যাণ সঙ্ঘের বাবুরাও বসেছিল, নটে-গুরুর সঙ্গে তারাও চলল বাড়ি দেখতে। দেয়ালে কেমন হরিনাম লেখা হয়েছে দেখা দরকার। তবেই প্রমাণ হবে ভূত-টুত সব বাজে কথা।

তেপান্তরের মাঠ শেষ হয়ে এসেছে, দূর থেকে হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ আসছে। গুরু নটের দিকে তাকাল। কি সাংঘাতিক! বিচ্ছুগুলো এরই মধ্যে আবার শুরু করে দিয়েছে নাকি! কিন্তু আরেকটু কাছে যেতেই দেখা গেল তা নয়, ওদের সাড়া পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা পাখি কিচির্-মিচির্ করতে করতে নীল আকাশে উড়ে পড়ল।

আর কি বাকি রইল? কল্যাণ সঙ্ঘ বাড়ি কিনল, আশ্রমও হল, একপাল হাঘরে ছেলেমেয়ের থাকবার জায়গা হল, রোজ বড়-বড় হাঁড়ায় তাদের জন্য ভাত রান্না হয়। বাড়ির মালিক খুশি হয়ে নটে-গুরুকে পনেরো টাকা দিয়েছিল! কথাটা জানাজানিও হয়েছিল। নানা লোকে নানা কথা বলেছিল। অন্য লোক টাকা পেলে ওরকম তো বলবেই! খালি গুরুর বাউন্ডুলে ছোট্দাদু একটু অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। ষাট বছর আগেও ঐ বাড়ি খালি পড়ে থাকত। উনি নাকি একবার পিট্টির ভয়ে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ঐ বাড়িতে গা-ঢাকার তালে ছিলেন। তা বিচ্ছুগুলো ওঁকে ঢুকতেই দেয় নি। মহা বদমাইস্ ছেলেগুলো, বিশেষ করে ঢ্যাঙা বলে একটা লম্বা কালো ছেলে আর গিরগিটি বলে একটা হিল্‌হিলে ছোকরা, সে ব্যাটা সটাং দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করেছিল!

তবে ওরা আর কখনো আসে নি!

সন্ধ্যা হোল

প্রতি মাসে একবার করে আমাদের মহিলা সমিতি বসে শনিবার সন্ধ্যাবেলায়। সেদিন হিসাবপত্র দেখা হয়, কাজ গুছোন হয়, একটু চাও খাওয়া হয় আর এনতার গল্প-গুজব হয়। এক একদিন ফিরতে একটু রাত হয়ে যায়, কারো কিছু গাড়ি-ঘোড়া নেই, দূরও নয়, যে যার দরকার মতো উঠে পড়ে। আবার এক একদিন কেউ একা বাড়ি ফিরতে চায় না। সব গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে পথ চলে সেদিন। মহিলা সমিতির সেজপিসিমার হাতে সুতো, কাপড় ইত্যাদির ভার থাকে, তার হিসেব সব সময় মেলাতে পারেন না, মিস্ মল্লিকের সঙ্গে তাই নিয়ে কত সময় কথা কাটাকাটিও হয়, দু' চার মাস কথাও বন্ধ থাকে। তারপর সেজপিসিমা আবার ঘুসঘুসে জ্বরে পড়েন, নিজের একতলা ঘরখানিতে একা শুয়ে থাকেন। মিস মল্লিক সন্ধ্যাবেলায় হাঁড়িমুখ করে, হাতে এক শিশি লাল কাচের মতো পেয়ারার জেলি নিয়ে সেজপিসিমাকে দেখতে যান, দুজনায় খানিক কাঁদাকাটিও করেন। পরের শনিবার দুজনা পাশাপাশি বসেন, সবাই একটু মুখ টিপে হাসে। তাতে ওঁদের কিছু এসে যায় না। একদিন সেজপিসিমা বললেন, "ভূতে

বিশ্বাস করি কি করি না এ বিষয় আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ বললেই তো ভূত কেন হতে পারে না, তোরা তার এক শ' রকম প্রমাণ এনে দিবি। কিন্তু পথেঘাটে ট্রামে-বাসে এই যে হাজার হাজার মানুষ দেখিস্, এরা কি সবাই জ্যান্ত মানুষ বলতে চাস্ নাকি? তবেই তো হয়েছিল! যেটুকু চাল ডাল পাওয়া যাচ্ছে তাও উঠে যেত।"

আমাদের করবী বললে, "জ্যান্ত মানুষ নয় তো কি তারা, সেজ্‌পিসিমা?"

সেজ্‌পিসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, "বলেছি তো এ বিষয় কিছু বলতে চাই না। কিন্তু আমাদের সেণ্টারের নুটুকে জানিস্ তো, তাঁতের সুতোর ব্যবস্থা করতে গেছিল ড্যালহৌসি, ফিরতে সে কি দেরী। বিকেলে ওখানকার ট্রামেবাসে কি হয় জানিস্ই তো। যেন থিক্ থিক্ পোকা ধরে যায়। কোথায় ক্যাণ্টিন-ম্যাণ্টিনে চা খেয়ে, কে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মোট কথা মেলা দেরী হয়ে গেল। শেষটা ট্রাম-স্টপে এসে দেখে পথঘাট ভোঁভাঁ, গাড়ি-ঘোড়া জন-মনিষ্যি নেই। কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। ওসব অঞ্চল কি পুরোন আর সেকালে ওখানে কি না বীভৎস কান্ড হয়ে গেছে, কে না জানে। এমন সময় দুটো লোক এসে একেবারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ভয়ে তো নুটুর প্রাণ উড়ে গেল। ঠিক সেই সময় অন্ধকার থেকে একগাদা কাগজপত্র বগলে নিয়ে তিনজন বুড়ী মেম বেরিয়ে এসে নুটুর সঙ্গ নিল। মিশনারি মেম, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলে। তাদের দেখেই লোক দুটি চোঁচাঁ দৌড় মারল। মেমরা বলল, এরকম নির্জনে একলা দাঁড়িয়ে থাক কেন, তোমাদের হিন্দুদের বুদ্ধির বহর দেখে আশ্চর্য হতে হয়। নুটুর একটু বিরক্ত লাগলেও, ত্রাণকর্ত্রীদের চটানোটা ভালো বলে মনে করল না। ওরা ওকে বলল, চল তোমাকে মোড় অবধি এগিয়ে দিই। একটু আগেই লোকজন গাড়ি-টাড়ি সব পাবে। তারপর সমস্ত রাস্তা খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে করতে ওরা ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল। বলল, তোমরা তোমাদের মরাদের ভগবানের হাতে ছেড়ে দিতে ভয় পাও, ম'লে পর নিশ্চিন্ত হতে পারো না, বছরে বছরে আবার নতুন করে শ্রাদ্ধ কর, ছিঃ! মরা আগলাতে লজ্জা করে না! ততক্ষণে ওরা মোড়ের মাথায় পেঁ'ছে গেছে, আলো, লোকজন, ট্রাম সব নাগালের মধ্যে এসে গেছে, নুটুরও সাহস বেড়ে গেছে। সে বললে, যাও, যাও, আর বোলো না, আমরা মরা আগলাই না আরো কিছু! আমরাই বরং পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে ছাইগুলোকে পর্যন্ত জল দিয়ে ধুয়ে সাফ্ করে দিই। তোমরাই মরাদের ছেড়ে দিতে পারো না, সাজিয়ে গুছিয়ে, বাক্সবন্দী করে, যত্ন করে মাটিতে পুঁতে, তার উপর থাম্বা গেড়ে, তার উপর ফুল রাখো—" বলতে বলতে ট্রাম আসছে কি না দেখবার জন্য একটু মুখ ঘুরিয়েছি কি, অমনি ফিরে দেখি তিনটে মেমই অদৃশ্য! কোথায় গেল তারা? থুরথুরে বুড়ী, এমন নয় যে তর্কে কোনঠাসা হয়ে টেনে দৌড় মারবে, তাছাড়া সোজা পথ, দুদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। গেল কোথায়?"

রমাদি বললেন, "হ্যাঁ, ওরা তর্ক সইতে পারে না শুনেছি।"

করবী কিছু বলল না। মিস্ মল্লিক প্রমাণ সাইজ পাঞ্জাবীটার পকেট-লাগানো পরীক্ষা করতে করতে বললেন, "তা তো বটেই। নেই বলে প্রমাণ দিলেই তো আর নেই হয় না। প্রমাণের কি-ই বা দাম বল। অবিশ্যি খৃষ্টানদের সম্বন্ধে নুটুদি যা বলেছিলেন তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না, কারণ আমাদের খৃষ্টান ধর্মে মানুষের দেহটাকে অত প্রাধান্য দেওয়া হয় না, সে থাকল কি গেল, তাতে কারো কিছু এসে যায় না, থাম্বা গাড়া কি ফুল দেওয়া-টেওয়া কিছু নয়, আত্মাটাই হল সব। তবে যীশুকেই সব আত্মার গতি করে দিতে হবে, এও তো কম আবদার নয়! আর ইচ্ছে হলে তারা ফিরবে না-ই বা কেন? জায়গা জুড়ে থাকছে না, খাচ্ছে-দাচ্ছে না—"

মিস্ মল্লিকের ছোট বোন বিন্দু মল্লিকের চার কাঁটায় মোজা বোনার অনেকগুলো

ঘর পড়ে একেবারে দু'তিন লাইন নেমে গেছিল বলে, এতক্ষণ সে আলোচনায় যোগ দেয় নি। তবে সেও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সমাদ্দার মাসিমার ক্রুশকাঁটা চেয়ে নিয়ে, সে ঘরগুলিকে বুনে কাঁটায় তুলে, নিরাপত্তার জন্য আরেক ঘর বুনে নিয়ে, তারপর সমাদ্দার মাসিমাকে ক্রুশ কাঁটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "খবরদার না বোলো না—কিছু মনে করলেন না তো মাসিমা, এতক্ষণ আটকে রাখলাম বলে?" এতক্ষণ ধরে লেস বোনার সুতোর ফাঁস আঙুলে পরিয়ে বসে থেকে থেকে, আসলে সমাদ্দার মাসিমা খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, যারা চারটে বিলিতী কাঁটা কিনে এত বোনাবুনি করতে পারে, তারা কি একটা প্লাস্টিকের ক্রুশ কাঁটাও কিনে রাখতে পারে না? আর ক্রুশকাঁটা কেন, মাথার কাঁটা দিয়েও তো বুদ্ধি থাকলে পড়া ঘর তুলে নেয়া যায়। তবু সে বিষয় কিছু উত্থাপন না করে অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "আহা, কি বলছিলে তাই বলো না। খায়-দায় না কি যেন?"

বিন্দু মল্লিক তিন কাঁটার সব ক'টি ঘর এক জায়গায় জড়ো করে এনে, তার চারদিকে দু' ফাঁস উল জড়িয়ে—বলা তো যায় না, আবার পড়তে কতক্ষণ—মোজাটাকে কোলের উপর নামিয়ে বললে, "একেবারে যে কখনই খায়-দায় না—ও কি, লিলিদি, অমন শিউরে ওঠার মতো কিছু হয় নি—কি বলছিলাম, হ্যাঁ, একেবারে যে কখনই খায়-দায় না তাও বলা যায় না।"

লিলিদি সমিতির সেজপিসিমার আরেকটু কাছে ঘেঁষে বললেন, "যা বলবার চটপট বলেই ফেল্ না রে, বাপু, ওরকম আধ-খ্যাঁচড়া বললে যে গায়ে কাঁটা দেয়। ও, অপু, আচ্ছা, বারান্দার আলোটা আজ জ্বালিস্ নি কেন বল দিকি নি? যা, সুইচ্‌টা নামিয়ে দিয়ে আয় তো।" অপু বললে, "ওবাবা! আমি পারব না।"

বিন্দু মল্লিক বললে, "গল্পটা শুনবে, না শুনবে না।"

"না, না, তুমি বল।"

"আমার ঠাকুমার কাছে শোনা, বুঝলে; মিথ্যে হবার জো নেই। ঠাকুমার শাশুড়ি ছিলেন যাকে বলে দজ্জাল মেয়েমানুষ। তিন তিনটা বৌমা আর তিন আইবুড়ো মেয়েকে দীর্ঘকাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে, শেষটা হার্টের রোগে ধরল। কিন্তু হলে হবে কি, যেই না অবস্থা সঙ্গীন হয়ে আসে, মেয়ে বৌরা হাসিমুখে এ ওর দিকে তাকাতে শুরু করে, অমনি দু'এক ফোঁটা ওষুধ খেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। ওদের কপালে আর সুখ লেখা ছিল না। এমনি সময় একদিন দারুণ জলঝড়ের রাতে শাশুড়ির শরীরটা একটু খারাপ বোধ হওয়াতে মহা হাঁকডাক লাগালেন, যাও এক্ষুনি ডাক্তার ডেকে আনো, পাড়ার ডাক্তারের অসুখ তো হালসিবাগানে কে নতুন ডাক্তার বসেছেন তাকেই আনো। শেষ পর্যন্ত বড় বৌ ঐ দুর্যোগ মাথায় করেই ডাক্তার আনতে গেল। খানিক বাদে ডাক্তারও এলেন, কালো পোষাক, কালো ব্যাগ নিয়ে। দেখে-শুনে ওষুধ দিলেন, ব্যাগ থেকে বের করে ছোট্ট সাদা একটা বড়ি। শাশুড়ি মহা খুসি, দে ওঁকে চা দে, কি কেক-টেক করেছিস আমাকে লুকিয়ে, তাই দে ওঁকে। ডাক্তারও কেকের খুব তারিফ করলেন, "ঐ এক চিমটি নুনও দিয়ে দেবেন গোলার সঙ্গে, দেখবেন আরো হাল্কা হবে। আরেকটু চিনি পেতে পারি কি চায়ে?" শেষ চুমুকটি খেয়ে ডাক্তারও উঠেছেন আর শাশুড়িও খাবি খেতে শুরু করেছেন। ঠিক সেই সময় বড়বৌমা চুপ্‌পুড় ভিজে হালসিবাগানের ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। হৈ-চৈ। আগের ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত হেসে বললেন, "ভুল ওষুধ দিয়েছিলাম কি না।" বলেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আরে উনি তবে কে? ও আবার কি কথা? সঙ্গে সঙ্গে এরাও দু'চার জনা বেরিয়ে এলেন, কিন্তু সিঁড়ির মাথায় কিম্বা সিঁড়িতে কোথাও জনমানুষ নেই।" বিন্দু মল্লিক আবার

বোনাটা তুলে নিল।

করবী মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলল, "ও আবার কি ভূতের গল্প হোল? ও হয়তো একটা দুষ্টু লোক, কি একটা পাগল ছিল। কিম্বা ঐ মেয়ে-বৌদের কেউই হয়তো ওকে ভাড়া করে এনেছিল। শাশুড়িকে সাবাড় করবার জন্য।"

মিস্ মল্লিক শুকনো গলায় বললেন, "সে তোমার যা ইচ্ছে মনে করতে পারো কিন্তু আমরা খৃষ্টানরা ধর্মে বিশ্বাস করি আর ঐ দারুণ জলঝড়ের মধ্যে দিয়ে এলেও লোকটার কাপড়-চোপড় ছিল খটখটে শুকনো। নীচে দরওয়ান ছিল, সে কাকেও গাড়ি করে আসতেও দেখেনি, বেরুতেও দেখেনি। তোমরা বিশ্বাস কর না কিছু; ঐ জন্যই আমি কিছু বলি নি, বিন্দুটার সবটাতেই বেশী বেশী।" বিন্দু মল্লিক তাই শুনে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল।

সবাই করবীর উপর রাগ করতে লাগল। সেজপিসিমা বললেন, "আমার দাদা খুব রাত করে ট্রামে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় কালীতলার মোড়ে চেক্ চেক্ আলোয়ান গায়ে দিয়ে একটা লোক উঠে দাদার পাশে বসল। তার সারা গায়ে ন্যাপথালিনের গন্ধ। চোখদুটো ঢুলুঢুলু। টিকিটের পয়সা চাইলে দিল বের করে একটা এই বড় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টাকা। কণ্ডাক্টারও তা কিছুতেই নেবে না, ওর কাছেও আর কিছু নেই। শেষটা দাদাই ওর ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। হেদোর মোড়ে দাদাও নামলেন সেও নামলে। নেমেই বললে, দাঁড়ান, এইখানেই আমি থাকি, পয়সাটা না দিলেই নয়, কারো কাছে ঋণী থাকতে হয় না।"

এই বলে পাশেই একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল, আবার তখুনি ফিরে এসে দাদার হাতে চারটে পয়সা গুঁজে দিয়েই মিলিয়ে গেল, সে তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর। দাদা একরকম ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে দেখেন সে পয়সাগুলোও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের ভারী ভারী পয়সা।"

করবী আবার বললে, "আহা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ দেওয়া কত পয়সা তো এমনি চলে। তাছাড়া পয়সারও ভূত হয় বলতে চান?"

সেজপিসিমা কোনো উত্তর না দিয়ে সুতোর লচ্ছির গিট্ খুলতে লাগলেন।

লিলিদিও হঠাৎ উঠে এসে একেবারে আসরের মাঝখানে বসে বললেন, "তোমরা তো আমার মাসিমাকে চেনো? এযে যাঁর সঙ্গে আমি থাকি। ওঁর যখন প্রথম ছেলে হয় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটে সাহাদের যে ঐ বিরাট বাড়িতে দুটো ঘর নিয়ে থাকেন ওঁরা। স্বামীটা তো একটা লক্ষ্মীছাড়া, কোনোদিন রাত বারোটায় বাড়ি ফিরল আবার কোনো-দিন হয়তো ফিরলই না। ছেলেটার একবার দারুণ জ্বর, মাসিমার নিজেরও জ্বর, তিনদিন স্বামীর দেখা নেই, কে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। ভাবছেন না খেয়ে বুঝি মরতে হবে, এমনি সময় দরজার কড়া নেড়ে—ই-ইক্ টুপ করে সমিতি ঘরের আলোটা নিভে গেল।

ওরকম হামেসাই আলো নেভে, পুরোন সব তার, কথায় কথায় ফিউজ হয়। তবু কি রকম যেন মনে হয়। সেজপিসিমা হাতড়ে হাতড়ে সেলাইকলের দেরাজ থেকে মোম-বাতির টুকরো বের করেন, প্যাণ্ট সেলাইতে মোটা জোড়ার জায়গাতে মোম না ঘষে দিলে ছুঁচ উতরোয় না, তাই সর্বদা মোমবাতি মজুত থাকে। টিমটিম করে আলো, যে যার ব্যাগ থলি চটি খুঁজে নিয়ে একসঙ্গে উঠে পড়েন। সভা ভঙ্গ হয়। করবী সেজপিসির সঙ্গে বাড়ি যায়। কি জানি!

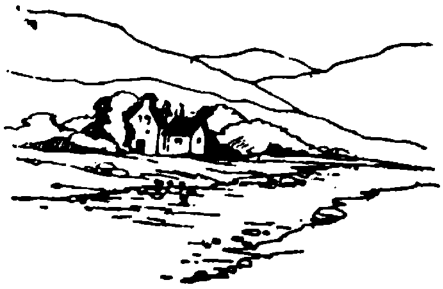

লাল টিনের ছাদের বাড়ী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকের ঘটনা ; অকুস্থল ভারত-বর্মা সীমান্তের একেবারে উত্তরপূর্ব কোণা ; জায়গাটার নামধাম নাই করলাম। আমার পলটুকাকা কন্‌ভয় নিয়ে সেখানে যখন পেঁছিলেন, নির্ধারিত সময়ের পর তখন পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে, চারদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

সাধারণ চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে জায়গাটার প্রচুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। একদিকে একটা অচেনা চেহারার পাথুরে ব্রহ্মপুত্র, সবেমাত্র পাহাড় থেকে ছাড়া পেয়ে আছড়ে আছড়ে চলেছে ; অন্যদিকে সাদা জমাট হিমালয়। তার উপর চাঁদের আলোর বান ডেকেছে, চোখ ঝল্‌সে যায়, কান ঝালাপালা হয়। কিন্তু কে না জানে যুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আদর নেই। ক্লান্ত শরীরটাকে কোনোমতে ট্রাক্‌ থেকে টেনে নামিয়ে রতন সিং বললেন, 'আঃ, কি বুদ্ধি তোমার পি, এস্‌! একেবারে খোলা নদীর পাড়ে কন্‌ভয় থামালে!'

পল্টুকাকা হেসে বললেন, 'কোনো নৌকোর কি সাঁতারুর কি কুমীরের এ নদী পার হবার সাধ্যি নেই।' রতন সিং বললেন, 'কিন্তু ফুটফুটে চাঁদের আলোয় বোমারুর অব্যর্থ টার্গেট! ওদের দুশো গজ এগিয়ে ঐ তেঁতুল বনের আড়ালে থাকতে বল, ও—ও নদীরই ধারে বলতে গেলে। কিন্তু আলো জ্বালবে না, ঠান্ডা রসদ খাবে।'

কনভয় এগিয়ে গেলে পল্টুকাকা একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, 'এই জায়গাই তো, চীফ্‌?'

রতন সিং বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'বারবার ম্যাপ মিলিয়েছি, এই জায়গা না হয়ে যায় না। ঐ দ্যাখ, নদীর ধারে লাল টিনের চাল দেওয়া দোতলা বাড়িও রয়েছে ; অত কাঁচা কাজ আমি করি না।'

'কিন্তু তাহলে সেই যে, যার আমাদের মিট করবার কথা ছিল—অবশ্য পাঁচ ঘণ্টা দেরী করে আসা হয়েছে, এতক্ষণ ধরে তার অপেক্ষা করতে বয়ে গেছে ; রাতে এখানে একা অপেক্ষা করাটা কি তার পক্ষে খুব নিরাপদ মনে কর নাকি?'

পল্টুকাকা গলা নামিয়ে বললেন, 'যে কাজ সে বেছে নিয়েছে, তাও কি খুব নিরাপদ কাজ?'

চারদিকটা অস্বাভাবিক চুপচাপ, ব্রহ্মপুত্রের কলধ্বনিটাকে পর্যন্ত নীরবতার ভাষা বলে মনে হয়। পল্টুকাকা চারদিকে চেয়ে বললেন, 'গা ছম্‌ছম্‌ করে, যাই বলুন। তার ওপর ঐ পেট্রল ডিপোতে যা বললে সে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। সূর্য ডোবার পর এ জায়গার দশ মাইলের মধ্যে নাকি পারতপক্ষে কেউ আসে না, ঐ বাড়িটা ভূতের বাড়ি—'

রতন সিং বাধা দিয়ে বললেন, 'ঠিক সেই জন্যই তো এই জায়গা বেছে নেওয়া। এখানে নিরাপদে কনভয় নিয়ে দিন কাটানো যাবে। ঐ মেয়ের নাম কুসুমকুমারী, সে এই দিককারই মেয়ে ; তার পথ ভুল করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই ; তোমার ও-সব ভয়-ভাবনার উপরে থাকে সে ; রাঁধেও নাকি খাসা। সাতদিন সাত রাতের পর, গরম

রান্না খাবার খেয়ে, ছাদের নিচে, খাটের ওপর পাতা বিছানায় শুয়ে—ঘুমোনোর সঙ্গে সঙ্গে সুখের কি কোনো তফাৎ আছে মনে কর? চল।' এখান থেকে কন্ডরের কোনো সাড়া শব্দই পাওয়া যায় না। রতন সিং পল্টুকাকার আগে আগে ইচ্ছা করেই যেন জোরে জোরে পা ফেলে, লাল টিনের ছাদের বাড়িটার দিকে এগোলেন। স্বাভাবিক স্পষ্ট গলায় বললেন, 'বুঝলে হে, কুসুমকুমারীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিতান্তই দরকার। সে তো শুধু আমাদের রাঁধাবাড়া দেখাশুনো করবে না, তার জন্য আবার একটা বাইরের লোকের কোনো দরকার ছিল না, আসলে সে-ই হল এস্ ঘাঁটি। পল্টুকাকা হঠাৎ চমকে উঠলেন। রতন সিং কাষ্ঠ হেসে বলে চললেন, 'এইখানে আমাদের গোপন ঘাঁটি করা চলবে কি না, শত্রুদের কতদূরে কোথায় অবস্থান, এ সব খবরই ওর নখাগ্রে। অথচ দেখলে মনে হবে যেন স্রেফ্ একটি সীমান্তের পাড়াগাঁর মেয়ে। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় ভুলেও কিন্তু ওকে বুঝতে দিও না যে, ওর পরিচয়টা আমাদের জানা আছে। সি-ওর এই রকমই হুকুম। দুচ্ছেদ্য আবরণে এস্ ঘাঁটির পরিচয় মোড়া থাকবে, নেহাৎ আমি ক্লান্ত বলে, বলে ফেললাম।'

পল্টুকাকা শুনে কাঠ। এস্ ঘাঁটির কীর্তিকলাপ তাঁর অজানা ছিল না, সে যে একজন মেয়ে হতে পারে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। পল্টুকাকার মতে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ স্থান হল রান্নাঘরে। বলতে বলতে ওঁরা লাল টিনের ছাদের বাড়িটার দোর গোড়ায় এসে পেঁছিছেন। একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে বাড়ি; অমন দুরন্ত নদীর পাড়ে কেউ যে বাড়ি করে একথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। তবে মজবুত গাঁথুনি, আগাগোড়া পাথরের, নদীর পাড়ও উত্তরে দক্ষিণে অনেকদূর অবধি পাথর দিয়ে বাঁধানো, উঁচু পাড়িতে অনেক বিদেশী গাছের বাহার; চাঁদের আলোতেও বোঝা যাচ্ছে এখন তারা অযত্নে মলিন।

রতন সিং মুখে যাই বলুন, ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় একটু ভয় ঢুকেছিল, তাই প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'জায়গাটাতে এলে যে মন খারাপ হয়ে যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তাই বোধ হয় ঐ সব গাঁজাখুরি ভূতের গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। কুসুমকুমারী সম্ভবতঃ এইখানেই আমাদের থাকার জায়গা ঠিক করেছে। ভূতের বাড়ির মতো নিরাপদ আস্তানা আর কোথায় পাবে?' রতন সিং জোর করে হাসতে চেষ্টা করলেন—দরজায় একটু ধাক্কা দিয়ে দেখা যাক, কি বল?' ঠিক সেই সময় দরজাটা আপনা থেকেই খুলে গেল। পল্টুকাকার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। ভাগ্যিস, দরজা খুলে কুসুমকুমারী এক গাল হেসে বেরিয়ে এল, নইলে হয়তো সত্যি সত্যি এলিয়েই পড়তেন, আর তা হলে রতন সিং ওঁকে পোস্টেজ বিভাগে চালান না করে ছাড়তেন না।

মন্দ ব্যবস্থা হল না মোটের ওপর; যদিও কুসুমকুমারীর ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী থেকে বোঝা গেল সে ওঁদের আসার বিষয় সঠিক খবরই পায় নি। তবু ওঁদের সঙ্গে কিছু শুকনো সামগ্রী ছিল, আলু ছিল, চাল ছিল, মাখন ছিল, বাড়িতে এককালে মুর্গি ছিল, এখনো তাদের বুনো বংশধররা ডিম পাড়ে, লঙ্কা গাছে লঙ্কা ঝুলছিল। চাঁদের আলোয় সে সব সংগ্রহ করে, রাত ন'টার মধ্যে কুসুমকুমারী সুন্দর নক্সা করা পুরোনো চীনে-মাটির বাসনে তাঁদের যা খাওয়াল সে আর ভুলবার নয়।

বাস্তবিক যারা ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে এ বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলাটা কিছুই আশ্চর্য নয়। ঠিক মনে হয়, সময় এখানে কুড়ি বছর আগের একটা বিশেষ মুহূর্তে পেঁছে চুপ করে থেমে রয়েছে। মেঝেতে ম্যাটিং পাতা, কাঠের সিঁড়িতেও ম্যাটিং। ওপরে পাশাপাশি তিনটি শোবার ঘর। লোহার খাট, তার পুরোনো নারকেল ছোবড়ার গদীর ওপর কুসুমকুমারী আলমারি থেকে কম্বল আর চাদর বের করে বিছানা পেতে দিল। বালিসে পরিষ্কার ওয়াড় পরিয়ে দিল।

সবই হল, শুধু আসল ব্যাপারটি ছাড়া। কুসুমকুমারী মুখ ফুটে কথা বলে না।

তা বলবেই বা কেন, রতন সিং আর পল্টুকাকাই যে ঠিক লোক, কুসুম তা জানবে কি করে? শেষ পর্যন্ত রতন সিং তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলেন শত্রুরা কোথায়, এখানে মাসখানেক নিরাপদে থাকা যায় কি না।

কুসুমকুমারীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, সে শিউরে উঠল, তার মুখ খুলে গেল। —না, না, না, কাল ভোরেই চলে যাও, এ জায়গা ভালো নয়। কাল রাতেই তারা আসবে। কাউকে বাদ দেবে না। আর এক মুহূর্ত সে দাঁড়াল না, নিচে কিছু জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার, দরজা জানলা বন্ধ হওয়ার শব্দ, তার পর সব চুপচাপ ; শুধু কানের কাছে ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল গর্জন।

পূবদিক ফর্সা হবার আগেই ওঁদের ঘুম ভেঙে গেল, পাঁচ মিনিটে সামান্য জিনিসপত্র বাঁধা সারা, ওঁরা তৈরী। বিছানার চাদর, কম্বল, বালিসের ওয়াড় সব যথাস্থানে তুলে রাখা হল, জানলা দরজা বন্ধ করা হল। তাকে আরেকবার দেখতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু এসব কাজে যারা জড়িয়ে পড়ে, কোনো রকম ব্যক্তিগত সম্পর্কের তারা ধার ধারে না, একথা দুজনারই জানা ছিল। তবু একতলার পরিচ্ছন্ন খাবার ঘর, রান্নাঘর দেখে যখন মনে হল না যে গতকাল রাতে এখানে একজন মেয়ের সেবার হাত পড়েছিল, দুজনারই মন ভারী হয়ে উঠেছিল।

বলা বাহুল্য, সূর্য ওঠার আগেই কন্‌ভয় রওনা হয়ে গিয়েছিল। তারপর মার্গারিটাতে রিপোর্ট করতে হল : পরদিন সত্যি সত্যি নদীর ধারের ঐ সব অঞ্চলে শত্রুদের বোমা পড়েছিল, লাল টিনের ছাদের বাড়িটার নাকি আর কোনো চিহ্ন থাকে নি। প্রায় মাস ছয় বাদে কলকাতায় একটা ক্লাবে সি-ওর সঙ্গে পল্টুকাকার দেখা। সি-ওর মহা আক্ষেপ, মিছিমিছি কন্‌ভয় নিয়ে ওঁদের অতদূরে পাঠানো হয়েছিল বলে, তার দশদিন আগেই যে এস্ ঘাঁটি এয়ার-রেডে নিখোঁজ, সেটা তাঁর জানা ছিল না। ওঁদের বোধ করি বড়ই কষ্ট হয়েছিল!

সেখানে সি-ওর বন্ধু কর্ণেল লাহিড়ীও ছিলেন, 'এটা আবার একটা কথা হল? দিল্লীতে আমার রতন সিং-এর সঙ্গে দেখা, সে কিন্তু বলল এস্ ঘাঁটি নিখোঁজ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কুসুমকুমারী বলে যে গ্রামের মেয়েটিকে আমরা এস্ ঘাঁটি বলে জানতাম, সে বেঁচেই আছে এবং তার কর্তব্যও ভোলে নি। সে-ই ওঁদের সঙ্গে দেখা করে সাবধান করে দিয়েছিল, তাই ওঁদের কন্‌ভয়টাও বেঁচে গেছিল। তা নিখোঁজই বল আর যাই বল। কি বলেন ক্যাপটেন, সেদিন কি খুব কষ্ট হয়েছিল?'

পল্টুকাকা মাথা নাড়লেন, 'না, না, কোনো কষ্টই হয় নি ; বড় যত্ন পেয়েছিলাম। ও বাড়িতে কারো অযত্ন হয় না। ওখান থেকে একশো মাইল দূরে বটগাছের নিচে যে ছোট্ট পেট্রল ডিপো আছে, সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করলে, তারা বলে যে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ও বাড়ি থেকে কেউ অযত্ন পেয়ে ফেরে নি। এমন কি এই কুড়ি বছর ধরে যে বাড়িতে কোনো জনমানুষের বাস নেই, এখনো নয়। সেই ভয়েতেই কেউ ওদিক মাড়ায় না। যাক্, লাল টিনের ছাদের বাড়িটা এতদিন বাদে ব্রহ্মপুত্রের নিচে ডুবে গেল? ভয়ের মধ্যে অভয় দেবার আর কেউ রইল না তা হলে!

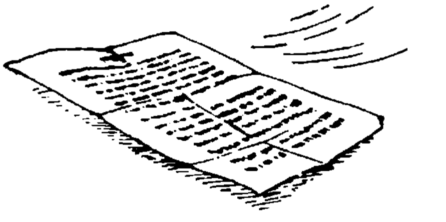

সোহম

কিশোরীবাবু ইচ্ছা করেই এই সময়টা নিজের পুরোনো ঘরে একা কাটাচ্ছিলেন। সোমবার থেকে আর এ ঘরে বসবেন না ; যে ঘরে বসবেন, সে ঘর আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাঁর হৃদয়ের পীঠস্থান হয়ে বিরাজ করছিল। সোমবার থেকে সেই ঘর তাঁর হবে। তাঁর হুকুমমতো সে ঘরের সব ব্যবস্থা চলবে। ভাবা যায় না। কুড়ি বছর আগে, ঐ ঘরের দরজার বাইরে এখন খদ্দরের উর্দিপরা যে চাপরাশীটা বসে, সে না হলেও, সেরেস্তা সম্পর্কে তার কোনো পূর্বপুরুষ, কিশোরী হাজরা বলে আনাড়ি পাড়াগেঁয়ে ছেলেটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যদেবীর এমনি কারসাজি যে ঠিক সেই সময়, সেই প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা অতিমানবটি ঐখানে এসে উপস্থিত এবং চাপরাশীর মন্তব্যটি শুনে একেবারে অগ্নিশর্মা!

সেদিন থেকে কিশোরীলালকে আর ফিরে তাকাতে হয় নি। ফিরে তাকাতে হয় নি, তার একটা কারণ এক মুহূর্তের জন্যও যদি চোখ ফিরিয়েছেন তো সামনের পথ থেকে পা হড়কে যাবার সম্ভাবনা। চারদিকে হিংসুটে প্রতিদ্বন্দ্বী গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সম্মুখ পথে এক এক ইঞ্চি করে কামড়ে কামড়ে রাস্তা করে নিতে হয়েছিল। সে কামড় কচ্ছপের কামড় ; একবার ধরলে আর ছাড়ে না। রাজনীতির মহাসড়কের দু হাতের গলিঘুঁজি কিশোরীর নখদর্পণে চলে এসেছিল। দিনে বিশ্রাম ছিল না, রাতে ঘুম ছিল না, প্রাণে শান্তি ছিল না।

তা না থাকতে পারে, তবু এক পা দু পা করে এগিয়ে এসে লক্ষ্মীদেবীও যে গুটিগুটি তাঁর বাড়িতে ঢুকে আসন পেতে বসেছেন, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

কিশোরীবাবু একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোথাও একটুকরো কাগজ পড়ে নেই। থাকলে হেমের চাকরি থাকত না। পরবর্তীরা যাতে নিজেদের সুবিধা করে নিতে পারে এমন একটা সুতো কি একটা আলপিন হেম ফেলে রাখে নি। সব টানাগুলো বের করা, আলমারির দরজা হাট করে খোলা। সেরেস্তার বিশ্বস্ত কাগজপত্র নিজের চোখে শেষ একবার দেখে নিয়ে, কিশোরীবাবু নিজে চাবিবন্ধ করবেন। দেখা হয়ে গেছে, চাবি ঘোরানোটুকু বাকি।

ঘরের আলো-পাখা নতুন ; অনেক খ্যাচাখেঁচি করে আগে যা আদায় করতে হত, এখন অযাচিতভাবে অবাধ স্রোতে সে সমস্তই এসে পৌঁছয়। আরো অনেক জিনিস পৌঁছয়, যা সে সময় চিন্তা করবার সাহস ছিল না। প্রথম যখন নিজের টেবিল-চেয়ার হয়েছিল, বাড়ি গিয়ে সরলাকে বলতেই সে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল। এখন সরলা আপিসের কথা জিজ্ঞাসাও করে না। এই পদোন্নতি বহুদিন হয় নি, কেবলি খুঁৎখুঁৎ, মুখভার। হল যখন, ভাবখানা যেন এর মধ্যে তারি কৃতিত্ব বেশি! নতুন পাথর বসানো গয়না গড়াল সরলা, সোনা আজকাল সে পরে না। আগে একজোড়া লাল শাঁখা, একজোড়া সাদা শাঁখা, তিনখানা লোহা, আর মা'র হাতের সরু ফাঁপা বালাজোড়া পরেই সে খুশি ছিল।

মার হাতের ফাঁপা বালাজোড়ার কথা মনে হতেই, নখভাঙা শিলে ছ্যাঁচা পোড় খাওয়া মা'র হাতজোড়াও মনে পড়ল। আজকাল মাঝে মাঝে কিশোরীবাবুর বুকের বাঁদিকে

টিপ-টিপ করে ব্যথা করে। হেম, নাদু, এরা ছাড়বে কেন, টেনে শহরের সব চাইতে নাম-করা হৃদ্‌রোগ বিশারদের কাছে নিয়ে গেল। তা নেবে না? কিশোরী হাজরা যতই উঠবেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়-জঙ্গলও তো টেনে তুলবে। ডাক্তার বললেন, 'ও কিছু নয়, অতিরিক্ত স্ট্রেন, একটু বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। একটা লং সী ভয়েজ ইন্ডিকেটেড্, স্যার। —না, না, ওকি, আপনাকে দেখতে পারাই আমার সৌভাগ্য. আপনাদের মতো দেশসেবকদের কাছ থেকে নিলে পাপ হয়।'

পুপুকে সময়মতো ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় নি। ট্যাঁক তখন গড়ের মাঠ, দেবেন কোত্থেকে। পুপু চলে যাবার পর বহুদিন কিশোরীলালের সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করত না ; তাতে তাঁর কাজেরও অনেক উন্নতি হয়ে গেছিল। আর পুপুর পর দিনু, স্বিজু, সোনা, রুপো, অমরেশ সব ফাঁকটুকু ভরে দিয়েছিল। যাক্ মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছেন ; ছেলেদের যার যেখানে বসিয়ে দিয়েছেন। অবিশ্যি অমরেশকে খুশি করা শক্ত ; এ চাই ও চাই, এ নইলে চলে না, ও নইলে চলে না ; বৌয়ের নিত্য খাঁই, 'উঃফ্!' এই বলে টেবিলের ওপর একটা সজোরে কীল মারলেন কিশোরীবাবু। বেশ লাগল।

তারপর উঠে টানাগুলো ঠেলে দিলেন, আলমারির দরজায় চাবি দিলেন। চারদিক নিস্তব্ধ ; এত রাত পর্যন্ত এ বাড়িতে প্রায় কেউ কাজ করে না। আজকের কথা অবিশ্যি আলাদা। এরা কিশোরীবাবুকে আজ অভিনন্দন দিয়েছে, রুপোর চোঙায় সংবর্ধনাপত্র দিয়েছে, সবাই মিলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের আইন শিরোধার্য করে মুর্গির কাবাব, চিংড়ির কাটলেট, রাধাবল্লভি, আর আইসক্রীম খেয়ে বাড়ি গেছে। আছে কোথাও নিশ্চয় মুরারি : কিশোরীবাবুকে না বলে বাড়ি যাবে, তার ঘাড়ে ক'টা মাথা। আরে, ক্যালেন্ডারের পুরোনো পাতাটা ছেঁড়া হয় নি যে ; না দেখলে এদের কাজ খারাপ হয়ে যায়।

পাতাটা ছিঁড়ে ময়লা কাগজের টুকরিতে ফেলে ঘুরে দাঁড়াতেই, কিশোরীবাবু ছেলেটিকে দেখতে পেলেন। কখন দরজা দিয়ে ঢুকে, দু হাত দিয়ে টেবিলে ভর করে দাঁড়িয়েছে। প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেছিলেন কিশোরীবাবু। আজকাল খবরের কাগজ খুললেই একে ছোরা মারা, ওকে গুলী করার খবর পাওয়া যায়। আক্রান্তরা কেউ হেঁজি-পেঁজি নয় ; হেঁজিপেঁজি মেরে কার কি লাভ? কিন্তু একটু নজর করে দেখেই কিশোরীবাবুর মনে ভয় ঘুচে বিরক্তি স্থান পেল। আজকাল এ বাড়িতেও কেউ কিছু দেখে না নাকি? এসব আজেবাজে লোক ঢোকে কে করে?

কর্কশ কণ্ঠে কিশোরীবাবু বললেন—'কি চাও?' তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, নিচের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছে। দু দিন খেউরি হয় নি, খদ্দরের জামাকাপড় খুব পরিষ্কারও নয়, সদ্য বাড়িতে কাচা মনে হয়, জঘন্য একজোড়া চটি দোরগোড়ায় খুলে রেখে, খালি পায়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। পাঞ্জাবীটা সম্ভবত কারো কাছ থেকে চেয়ে আনা, হাতে ঝুলে বড়ই খাটো। তবু কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল।

চেয়ারে বসে পড়ে ক্লান্তভাবে কিশোরীবাবু বললেন, 'কপালে প্রার্থীর টিকিট লাগিয়ে এসেছ। বড় অভাব, না? বড্ড গরীব? এক্ষুনি কি বলবে আমার জানা আছে। বাবা নেই : আর কিছু না করুন গুটি চারেক অনাথ শিশু আর মুখ্যু বৌ রেখে অকালে স্বর্গে গেছেন, না? মা আধপেটা খেয়ে খেয়ে শয্যা নিয়েছেন, অর্থাভাবে বেশিদূর লেখা-পড়া শেখা হয় নি, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে ; হয় তোমাকে এক্ষুনি টাকা দিতে হবে, নয়তো চাকরি দিতে হবে, দুটো একসঙ্গে হলেই ভালো। ঠিক বলেছি কি না? কি, চুপ করে রইলে যে?"

ছেলেটার গলা শুকিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না বোঝা গেল ; কাঁপা কাঁপা, হাড় জিরজিরে,

কেঠো কেঠো হাত দিয়ে পকেট হাতড়াতে লাগল। এত চেনা মনে হচ্ছে কেন? কোথাও দেখেছেন কিশোরীবাবু এই মুখটাকে, কানের পাতার ওপরের আঁচিলটা ওঁর চেনা, চোখের কোণে ছোট্ট উঁচু জায়গাটাকেও আগে নিশ্চয় কোথাও দেখেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই পেয়ে বসবে, তখন ঝেড়ে ফেলা মুস্কিল হবে। আঃ, হেম, নাদুও তো বেশ লোক; 'একা থাকতে চাই' বলেছেন বলে বেমালুম হাওয়া! একটা বিপদআপদও তো হতে পারে, সে খেয়াল নেই। দেশের কর্মীদের রক্ষা করবে না তো কাকে করবে?

ছেলেটা পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে ধরতেই, রুষ্টস্বরে কিশোরীবাবু বললেন, 'কি ওটা? নিজের ফিরিস্তি নাকি? একেবারে ভিকিরি বনে গেছ দেখছি, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে!'—আরো কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল, ছেলেটা হঠাৎ নরম গলায় বলল, 'আজ্ঞে না, একটু লিখেছিলাম।' 'লিখেছিলে? কি লিখেছিলে?' 'বাংলা দেশের পাড়াগাঁর উন্নতি সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ।'

কিশোরীবাবু কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছাদফাটানো হাসি হাসলেন। 'বাঃ, খুব ভালো, আমরা এক আপিস এক্সপার্ট দিয়ে উন্নয়ন করতে পারছি না, আর তুমি আমাদের শিক্ষা দেবে, মুখ্যু ছোকরা! বেরোও এখান থেকে এক্ষুনি!' ছেলেটার মুখ সাদা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে বলল, 'সত্যিই বড্ড গরীব আমরা, মাকে দেখলে কষ্ট হয়, না খেয়ে খেয়ে—যদি একটু লেখাটেখার কাজ দিতেন, কত নোটিস, রিপোর্ট, বিজ্ঞাপন তো দরকার হয়—'

'ওঃ, সেসব তুমি লিখবে, না? বলি বি-এ পাস করেছ?' ছেলেটা মাথা নাড়ল, 'হায়ার সেকেন্ডারির পর আর পড়া হল না।'—'থাক, আর বলতে হবে না, ওসব জানা আছে। এখন মানে মানে কেটে পড় দিকি! আজ একটা বিশেষ দিন, তাই রাগমাগ করতে চাই না। যাও।'

ছেলেটা নিচু হয়ে মাটি থেকে কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে, এক পা দু পা করে পেছু হটতে লাগল। খোলা কাগজটাতে লেখা প্রথম লাইনটা কিশোরীবাবুর চোখে পড়ল, 'নিরবধি বাংলার খেত খাল নদী—' রোগা হাতটার ওপর চোখ পড়ল; কড়ে আঙুলে একটা রুপোর আংটি, তাতে একটা সিংহের মুখ, তার চোখ দুটি দুটো লাল পলা, কপালে একটা নীল ফিরোজা।

বুকের মধ্যে ধুক্ করে উঠল। ও লেখা কোথায় যেন পড়েছেন; টুকে আনে নি তো ব্যাটা? কিন্তু হাতের লেখাটাও বড় চেনা। আংটিটাও বড় চেনা। কিশোরীবাবুর মাথাটা কেমন করে উঠল, চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলেন। বড় চেনা হাতের লেখা, 'নিরবধি বাংলার খেত খাল নদী—' তারপরে আছে 'শ্যামল বনের সম্ভার কেহ যদি—' আর মনে পড়ছে না। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। ও কার আংটি? বালিখালের মাসিমার ঐ রকম আংটি ছিল না? সেদিন কলকাতায় আসার সময় কিশোরীকে দিয়েছিলেন, নাকি বড় পয়মন্ত আংটি। দু' হাতে কিশোরীবাবু মুখ ঢেকে মাথা ঘোরা বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিশোরীর কপাল সত্যি ফিরে গেছিল, কিন্তু বড় কষ্টে, বড় কষ্টে। ঐ লেখাটাও কত কষ্টে লেখা, চেয়ে আনা কাগজে, কেরোসিনের ডিবের আলোতে। অমনি ফেলে দিলেন!

চমকে উঠে দাঁড়ালেন কিশোরীবাবু। কে ফেলে দিল? যেন সম্বিৎ ফিরে এল তাঁর। উঠিপড়ি করে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন—'ও কিশোরী, দাঁড়াও; মা তাহলে এখনো আছেন?' কিন্তু সে ছেলেটা কখন চলে গেছে, কিশোরীবাবু বাইরের বারান্দা দিয়ে অনেকখানি দৌড়ে গিয়েও তাকে দেখতে পেলেন না। সিঁড়ি নিস্তব্ধ, লিফ্ট বন্ধ। অনভ্যস্ত গোলমাল শুনে কোথা থেকে মুরারি ছুটে এল, কিশোরীবাবুর উদ্‌ভ্রান্ত

চেহারা দেখে হাঁকডাক লাগাল। হেম এল, নাদু এল, বিশুবাবু, হীরেন, সবাই এল। কেউ তাহলে বাড়ি যায় নি।

'একটা খদ্দর পরা রোগা ছেলেকে এই দিক দিয়ে যেতে দেখেছ কেউ? দ্যাখ, দ্যাখ, তাকে আমার বড় দরকার।' মুহূর্তের মধ্যে চাপরাশী, পাহারাওয়ালা, সার্জেণ্ট, পুলিস, অত বড় বাড়ির আনাচেকানাচে তল্লাস শুরু করে দিল। অবিশ্যি কিশোরীবাবু জানতেন তাকে পাওয়া যাবে না। ওরা ফিরে এসে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আপনি চেনেন তাকে? কোনো ক্ষতি করতে আসে নি তো?' কিশোরীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না না, ভালোর জন্যই এসেছিল, আমিই শুনলাম না, তাড়িয়ে দিলাম।' 'চেনা লোক?—ওকি, এখানে বসুন, ও হেম, মাথায় একটু জলের ছিটে দাও। বাড়িতেও একটা খবর দিলে ভালো হয় না?'

কিশোরীবাবু কৌচে এলিয়ে পড়ে চোখ বুজলেন। চেনা নয়তো কি? বাবার ঐ পুরোনো জামা, ঐ ঘরে কাচা কাপড়, ঐ কানে তিল, ঐ চোখের কোণে উঁচু ঢিপলি, আয়নায় কত দেখেছেন: এখনো তিলটা রয়েছে, ঢিপলিটার অপারেশনের দাগ রয়েছে। উনি চিনবেন না তো কে চিনবে? এরা কিশোরীবাবুর বাড়িতে টেলিফোন করে এখন কাকেও পাবে না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে বালিখালের সরু গলির টালির ছাদের একতলা বাড়িতে, ঐ ছেলেটা যেই ঢুকবে, রান্নাঘর থেকে মা ডেকে বলবেন, 'কিশোরী, এলি? এই ভাতটা ফুটল বলে।' তারপর ময়লা শাড়ির আঁচলে মুখ মুছিয়ে, তাঁর নখভাঙা, শিলে ছ্যাঁচা, পোড়-খাওয়া হাতটা ওর গায়ে মাথায় বুলোবেন।

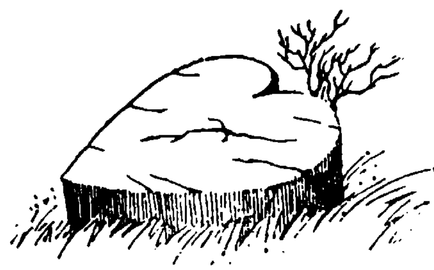

আলোছায়া

অপরাহ্নে বিজন পথে ঘোর ঘনঘটা করে বৃষ্টি নেমেছিল। দেখছিলাম সুনীল সুঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার অঙ্গ বেয়ে অবিরাম জলধারা নেমেছে। তারই অন্তরালে কতকালের পুরোনো চকমেলানো ছাই রঙের বাড়ি।

খিলানে তার মাধবীলতার সম্ভার; দেয়ালে অশ্বত্থ গাছের আলিঙ্গন। না আছে দরজা-জানলার কপাট, না আছে জনমানবের বাসের চিহ্ন।

তবু একটা আশ্রয় তো বটে। ঝড়ে-ঝাপটে পথিমধ্যে একাকিনী বিপন্ন নারীর পক্ষে আশার অতীত আশ্রয়।

প্রবেশপথের পুরোনো শ্বেতপাথরের সিঁড়ির মাঝখানটা কোন বিগত দিনের পাদ-স্পর্শে ক্ষয়ে গিয়েছে। প্রশস্ত আঙিনার ধারে কবে কে যেন পাথরের নারীমূর্তি সাজিয়েছিল। আঙিনার ওপারের শিশুগাছের পাতার নিরন্তর শিহরণ তার কানে-কানে কার নামের রোমাঞ্চকর মন্ত্র দিত কে জানে!

আমি সেই ঘন সবুজ পত্রগুচ্ছের উপর অবিরাম বারি-বিন্দুপাত দেখছিলাম।

আর কপাটভাঙা বিপুল হলঘরের ধূলিমলিন বিশাল ঝাড়লণ্ঠনের নীরব নিক্কণ ভেদ করে, কারা সব অদৃশ্য অশরীরীদের ক্ষীণতম সাড়াটুকুর জন্য, নিশ্বাস রোধ করে প্রতীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ঐ পদচিহ্নবিহীন ধূলিরাশির উপর বাইরের পৃথিবীর ঝোড়ো হাওয়ার স্পর্শটুকুও কোনো দিন লাগবে না।

বারান্দার কোণ ঘেঁষে নীলমণি ফুলের লতা। আমি ভাবছিলাম যাদের বাড়ির বুকের কাছে নীলমণি ফুলের ঝাড়, তারা কী করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়? তাদের পুঞ্জীকৃত অশান্ত নিশ্বাসের শেষ কম্পনটুকুও কী করে কালের অতলে বিলীন হয়?

সহসা দেখলাম বারান্দার ভাঙা রেলিং-এর উপর রাখা আমার শামলা রঙের হাতের পাশে দুখানি পদ্মফুলের মতো কোমল গৌর হাত। তার ঈষৎ রক্তিমাভাযুক্ত আঙুলে মরকত মণির আংটি শোভিত। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখলাম কোনো অশরীরী নারীর ছায়া-মূর্তি নয়, জীবন্ত মানুষ, তার দ্রুত ঘন নিশ্বাসে ত্রস্ত কালো চুল কম্পিত হচ্ছে।

চোখদুটি ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, কিন্তু শুকতারার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। বাঁকা ভুরুর নিচে টানা চোখ সুঘন পল্লবময়। গৌর মুখশ্রী। লাবণ্যময়ী, হাস্যমধুরা। তনুদেহ হয়তো পঞ্চবিংশতি বৎসর ধারণ করেছে, পীতবসনা, মণিবন্ধে মকরমুখী সোনার বালা, কণ্ঠে বেলফুলের গোড়ে মালা শোভা ও সৌরভ বিকিরণ করছে।

সে আমাকে বললে, 'আমার নাম কৃষ্ণকলি। কেমন নাম?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সুন্দর নাম। তুমিও সুন্দর।'

খুশিতে ঝলমল করে উঠে সে বললে, 'দেখ, আমার চুল কি রকম কোঁকড়া। দেখ, দেখ, কেমন হাঁটু ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমার মতো গায়ের রঙ কারো আছে এ দেশে? দেখ, কেমন সোনালীও নয়, গোলাপীও নয়।"

ছোট-ছোট পুষ্প-পেলব হাত দুখানি আমার চোখের সুমুখে নেড়ে বলল, 'চেয়ে দেখ, রাঙা কোকনদ কেন বলে! দেখ, আমার হাতের নখগুলি যেন ডালিমের কোয়া। সত্যি বল তো, আর কাউকে কখনো দেখেছ, যার মুখ দেখে মনে হয়েছে ইন্দু-নিভাননী?'

আমি অকপট চিত্তে বললাম, 'না, না, তোমার মতো সুন্দরী আমি এ জন্মে দেখিনি।'

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'শুধু এ জন্মে দেখনি? বল, হেলেনের ভুরু এরকম ধনুকের মতো ছিল? ক্লিওপেট্রার নাক এমন বাঁশির মতো ছিল? না, না, লোকে বলত আমি তিলোত্তমার মতো সুন্দরী। যেখানে যা কিছু সুন্দর আছে, সব জড়ো করে এনে আমাকে গড়েছিল। সোনা দিয়ে, মুক্তো দিয়ে, হীরে দিয়ে, ফুল দিয়ে, তমালগাছের মাধুরী দিয়ে, সূর্য দিয়ে, নীল আকাশের নীলা দিয়ে আমি তৈরি। সত্যি বল তো জন্মান্তরেও কি আমার চেয়ে সুন্দরী দেখবার আশা কর?'

তার কণ্ঠস্বরে আমারও শিহরণ জেগেছিল, আমি বারবার বলেছিলাম, 'সেরা সুন্দর কি আর জন্মে-জন্মে চোখে পড়ে? লক্ষ কোটি যুগে যদি একবার দেখা যায়, অনন্তকাল ধরে ধন্য হয়ে যেতে হয়।'

আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে আমাকে আলিঙ্গন করল। তার রেশমের মতো চুলের গন্ধ আমার চোখে-মুখে এসে পড়ল। মালা থেকে দু-একটি ফুল ঝরে পড়ল।

তখুনি আবার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল তার—সূর্যাস্তের বহুক্ষণ পরে দিগন্ত যেমন বিবর্ণ হয়। চোখ থেকে আলোর রশ্মি মুছে গেল। বিষণ্ণ কণ্ঠে সে আমাকে বললে, 'কিন্তু একটা খুঁত থেকে গিয়েছিল। যেখানে যা কিছু সুন্দর সব দিয়েছিল বিধি। শুধু—হৃদয় দিতে ভুলে গিয়েছিল। তার বদলে দিয়েছিল সাদা মসৃণ একটা পাথর। দেখ, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, হৃদয়ের স্পন্দন পাও কিনা!"

বাস্তবিক তার পাগলের মতো কথা শুনে আমারও মনে হতে লাগলো সত্যিই যেন তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করছি না।

সে বললে, 'পাথরের কি কখনো স্পন্দন হয়? পাথর দিয়ে কি কখনো ভালোবাসা যায়? জানো, ছোটবেলায় আমি কখনো বেড়ালবাচ্চা কোলে নিইনি। কখনো পাখীর ছানার পালকে হাত বুলোইনি। কাউকে ভালোবাসিনি, বাবাকে না, মাকে না।"

হয়তো আমার মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকবে। কারণ তখুনি সে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে আমার হাত ধরে বললে, 'না, না, তুমি যতটা ভাবছ, ততটা নয়। তাঁরা কিছুই জানতেন না। তাঁদের একমাত্র সন্তানের যে হৃদয় নেই এ কথা তাঁরা সন্দেহও করেননি। আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমার কর্তব্যবোধ ছিল।'

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, 'আমার মাসতুতো বোন মেঘমালার সঙ্গে শঙ্কর দেবের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আমাকে দেখে সে আর কিছুতেই মেঘমালাকে বিয়ে করল না। আশীর্বাদের দিন বলে কিনা বিয়ে করবে না। ভাবতে পারো, মেঘমালা কপালে চন্দন পরে, শামলা রঙ গোপন করে, বালুচরী শাড়ি গায়ে. অপেক্ষা করে রইল, আশীর্বাদই হল না।'

অবাক হয়ে আমি বললাম, 'তুমি তাকে বিয়ে করবে?'

বিস্ফারিত নয়নে কৃষ্ণকলি বললে, 'আমি কেন বিয়ে করব শঙ্কর দেবকে? কিবা তার রূপগুণ, কিবা তার ধনদৌলত! সে সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় যেন চলে গেল।'

'আর মেঘমালা?'

'মেঘমালা? সে নেই।'

একটু পরে সে আবার বললে, 'রাজারা আসত আমাকে বিয়ে করবার জন্যে। আমি লাল রেশমি শাড়ি পরে সবাইকে প্রত্যাখ্যান করতাম। কেউ বিদেশে চলে যেত, কেউ বিবাগী হত, কেউ আত্মহত্যা করত, কেউ রাগ করে কালো মেয়ে বিয়ে করত।

'তারা আমাকে হীরে-জহরত কিম্বা কিংখাব-মখমল উপহার দিত। আর দীপক নামের ছেলেটি গরীব ছিল, সে শুধু ফুল দিত। আর বলত—কি দেব তোমাকে? কিছু নেই যে আমার।—বিরক্ত লাগত এক কথা শুনে-শুনে। রসিকতা করে বলেছিলাম-—চুরি করেই যদি এনে দিতে না পারলে তবে আর কী ভালোবাসার গর্ব কর?—শেষটা সত্যি কোথা থেকে হীরে-মণি চুরি করে, ধরা পড়ে, জেলে গেল।'

আমি নীরব হয়ে রইলাম। কৃষ্ণকলি আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'কতদিন কাউকে মনের কথা বলিনি। আজ তোমাকে পেয়ে আমার কত আনন্দ হচ্ছে। তোমাকে কোথায় বসতে দিই বল তো? আমাদের সেই কারিকুরি-করা চৌকিগুলো যে কোথায় গেল মনে পড়ছে না।'

আমি বললাম, 'কৃষ্ণকলি, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বল কী বলবে।'

সে বললে, 'শোনো, শোনো, আমার প্রিয় বান্ধবী মালবিকার স্বামী আমার জন্য তাকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু আমি তাকে গ্রহণ করিনি। মালবিকা আগে আমাকে বলত রাক্ষসী, আবার শেষে বলত নিষ্ঠুর!

'আমার মতো যাদের রূপ থাকে, যুগে-যুগে তারা তো সংসার পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

'মনে আছে মা-বাবা কত ব্যথা পেতেন! তবে বেশিদিনের জন্যে নয়। যুগ-যুগান্তরের বাবা-মাদের সঙ্গে একে-একে তাঁরা অতীতের নীল জলে হারিয়ে গেলেন।

'আমি রইলাম রূপের ডালি আর রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে। এতদিনে আমার জীবনে

প্রথম রৌদ্রকরস্পর্শ লাগল। আমার যৌবনের কুঞ্জবনে পিককুল ডেকে উঠল, তরুলতা পত্রপুষ্পে মঞ্জরিত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের নিভৃত মহলে অমিতাভ এল। আমার বুকের পুরোনো পাথরখানা এক নিমেষে গলে জল হয়ে গেল।

অমিতাভর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। সাতদিন আমি স্বর্গে বাস করেছিলাম। অষ্টম দিন সকালে উঠে দেখি অমিতাভ আমার সমস্ত হীরে-জহরত সোনা-রুপো, আমার সিন্দুক-ভরা মোহর নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

'আর তাকে দেখিনি।

"তখন মেঘমালার জন্যে, শঙ্করদেবের জন্যে, দীপকের জন্যে, মালবিকার জন্যে আমার মন হাহাকার করে উঠল।'

কৃষ্ণকলি দোতলার ভাঙা খিলান নির্দেশ করে বললে, 'ঐখান থেকে আমি নিচে পড়ে গেলাম, যেখানে নীলমণিলতার ঝরা ফুল স্তূপ হয়ে জড়ো হয়েছিল।

'তুমি বল আমার রূপ একটুও ম্লান হয়নি। বল আমার মতো সুন্দরী কেউ নেই পৃথিবীতে। যুগে-যুগে, জন্মজন্মান্তরে, জলে স্থলে শূন্যে কোথাও এমন রূপ দেখেছ, বল আমাকে!'

আমি আবেগে অধীর হয়ে বললাম, 'কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণকলি, তুমি কে, তুমি কোথায়?'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মেঘ কেটে গিয়েছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের শেষ সোনালী রোদ আঙিনাতে এসে পড়ল। সে রোদে কৃষ্ণকলিকে আর দেখতে পেলাম না।

শুধু বাতাসে ভেসে এল আমার কানে-কানে 'দ্যুলোকে ভূলোকে আকাশে আলোকে কোথায় এমন রূপরাশি!'

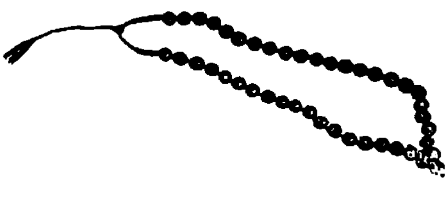

সোনালি-রুপালি

চিরদিন আমি এইরকম মোটাসোটা গিন্নিবান্নি ছিলাম না। ইয়ে-কি-বলে আমাকে বিয়ে করবার আগে আয়তলোচনা তন্বী তরুণী ছিলাম। আর এই যে আমার ইঁদুরের ল্যাজের মতন বিনুনিটা পাকিয়ে বড়ি খোঁপা করে রেখেছি, এ তখন ছিল কুণ্ডলিনী সর্পিণীর মতন, মিশ্‌কালো, চকচকে, মসৃণ। কিন্তু আমার সে শ্যামশ্রী সত্ত্বেও তখন আমার জীবনে কাব্য ঘনিয়ে ওঠেনি। স্পষ্ট মনে আছে আমার দিনের পর দিন বৃথা কেটে যেত ; রামধনুকের রঙ আর কিছুতেই লাগত না। আমি খেতুম না ভালো করে, বসতুম না আরাম করে, গলা ছেড়ে কথা বলতুম না, পাছে আয়েসী হয়ে গিয়ে লোমহর্ষণের দর্শন না পাই। মিছিমিছি সে সকল আত্মদাহ, আমার ঘটনাহীন যৌবনের দুর্লভ দিনগুলো টলটলে নদীর জলের মতন স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে চলল, শেষে হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি যৌবনের খাতার শেষ পাতা উলটে ফেলেছি।

সেদিন বিষম রেগেছিলুম ; এই যে মনে মনে এত কাব্যরচনা করলুম, এত অসম্ভব ঘটনাবলী কল্পনায় সৃষ্টি করলুম, একি সব মিছিমিছি নাকি? যে অপরূপ আমাকে চিরদিন হাতছানি দিয়ে ডেকে-ডেকে আড়ালে লুকোয়, শেষ অবধি সে কি সত্যি-সত্যি

আমাকে এড়িয়ে যাবে নাকি? বিষম রাগ হল। ইয়েকে খুব বকলুম, বললুম, 'তুমি ভারি ইয়ে; তোমার মুখখানাতে দিন-রাত্তির একগাল হাসি লেগে আছে; তোমার মাথার মাঝখানকার চুল পাতলা হয়ে গেছে; তুমি মোটা হয়েছ; রাত্তিরে নাক ডাকাও; তুমি আমাকে কখনও মক্ষিরাণী বলে ডাকো না; আমার জীবনটাই বৃথা!'

সে অবাক হয়ে আমার দিকে একবার চেয়ে আবার মন দিয়ে দাড়ি কামাতে লাগল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার এই হেলা-ফেলায় নষ্ট-করা জীবন কানায়-কানায় রসে-রহস্যে ভরে উঠল।

আমরা অনেকদিনের পুরোনো একটা বাড়িতে উঠে এলুম। সবাই সকালবেলা বাড়ি বদল করে, কিন্তু আমরা এলুম সন্ধ্যের আগে; সূর্য তখনো ডুবে যায়নি কিন্তু তার স্তিমিত আলো লালচে হয়ে এসেছে। সেই লালচে রোদ লেগেছে বাড়ির বাইরের ছাই রঙের দেয়ালে, বাড়ির চারপাশের বাগানের বিশাল-বিশাল আমগাছের বাতাবীলেবু-গাছের ঘনসবুজ ডালপালাতে, যাতে এক ঝাঁক পাখিই বাসা বেঁধেছে। সেই যে শুনেছিলুম মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নৈঃসঙ্গ্যের কথা, যা কোনো কিছুতে দূর করতে পারে না, আমার প্রাণের সেই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা এক নিমেষে যেন একটু কমে গেল।

প্রাচীন বাড়িটার কাঠের সিঁড়িতে গালচে দেওয়া নেই, কিন্তু গালচে পাতার দাগ আছে, ঝকঝকে পেতলের শিক দিয়ে আঁটা লাল পুরু গালচের দাগ ধাপে-ধাপে রয়েছে। একতলাটা সংস্কার করে আধুনিক বানিয়েছে, কিন্তু ঐ গালচে-বিহীন কাঠের সিঁড়ির উপরে দোতলাটা কোন বিগত যুগের। আমরা আসতে যারা দুদিনের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, আমরা চলে গেলে তারা কানায়-কানায় সব জুড়ে বসবে। বলতে সময় লাগল, কিন্তু বাড়িতে পা দেবার মুহূর্তেই এত কথা আমার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলে গিয়েছিল।

পুরোনো জিনিসের জাদু আছে এই বাড়িতে। একতলার সমস্ত আসবাব নতুন, কিন্তু দোতলাটাকে ধুয়ে-মুছে নিলে পরও সে তার পুরোনো ভাঙা সজ্জা নিয়ে দিনরাত আমাকে ইঙ্গিত করত। সত্যিকারের কিছু হয়তো ছিল না। নালন্দার ভাঙা বিদ্যালয়ে, বুদ্ধগয়ার জনহীন মন্দির দেখেও আমার এই রকম কেমন যেন চেনা-চেনা লেগেছিল, মনে হয়েছিল এদের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; একটু ভাবলেই হয়তো বিষম প্রয়োজনীয় কত কথা মনে পড়ে যাবে; কিন্তু হায়রে আমার মায়ের দেওয়া এ জন্মের মন, সেই বিশাল ইঙ্গিত তাকে এড়িয়ে গেল। আর এখানেও দোতলার সারি-সারি ভাঙা জানলাগুলো আমগাছ আর বাতাবিলেবুগাছের দিকে অপলকনেত্রে চেয়ে রইল, কী একটা তাদের প্রকাশ করা উচিত ছিল সে আর বলা হল না।

ছোটবেলায় হয়তো আমি মন্ত্রপড়া একটা কিছু ভুল করে খেয়ে ফেলেছিলুম, আর তার আমেজ এখনো আছে আমার চোখে আর রক্তের মধ্যে। মনে হত জীবনের অর্ধেকের বেশি কেটে গেল, তবু যেন সব থেকে যা প্রধান, যার কাছে দাঁড়ালে আর সব কিছু ছোট হয়ে যায়, সেটাই হল না। মনে হত যৌবনে কেন সারারাত্রি প্রত্যাশা করে থাকতুম সকালবেলা আমাকে কি আশ্চর্য জিনিস এনে দেবে; আর সারাদিন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে থাকতুম রাত্রি আমাকে অলৌকিকের খোঁজ দেবে? কেন গাছপালা আলো-অন্ধকার, চাঁদের কিরণ আর সূর্যরশ্মি সবাই রহস্য মেখে এসে আমাকে নেমন্তন্ন করত?

একদিন দুপুরে এই সব হতাশার কথা ভাবছিলুম। রান্নাঘর ধুয়ে চাকররা চলে গেছে, কোথায় বেশ ছায়া-ছায়া জায়গা দেখে বিড়ি খেতে। ছেলেরা গেছে স্কুলে, ইয়ে গেছে আপিসে। আমি একলা। সকালের সূর্য সরে গেছে, বারান্ডায় সারি-সারি সাজানো

জলপাই আর কাঁচালঙ্কার আচারের বোতলে আর রোদ লাগছে না। সেগুলোকে সরিয়ে দিলুম। শুকনো কাপড়গুলো, তুলে ফেললাম। কুকুরটাকে ছেড়ে দিলুম। তারপর দোতলায় গেলুম, যেখানে উত্তরের ঘরে ভাঙা ড্রেসিং-টেবিলের উপর পুরোনো মাসিকপত্রিকা গাদা করে রেখেছিলুম, প্রমথবাবুর এক পরমাশ্চর্য জুড়ির গল্প খুঁজবার জন্য।

অযত্নে রাখা পুরোনো মাসিকপত্রিকার মধ্যেও আছে পুরোনো জিনিসের জাদু। যা এক সময়ে অতি আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ছিল, এখন যাতে অনাদরের ধুলো জমছে, এমন সব কিছুতেই আছে। নিস্তব্ধ দুপুরে আমি সেই ধুলোর মন্ত্রে ডুবে গিয়েছিলাম, হঠাৎ সতর্ক হয়ে চোখ তুলে তাকে দেখতে পেলুম। তখুনি আমার চিন্তাশক্তি, আমার সম্ভব-অসম্ভব বিচার করবার শক্তি দূর হয়ে গেল, তাই আমি ভয় পেলুম না, শুধু বিস্মিত হয়ে অনিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইলুম। সে দরজার কাছে, ঘরের ভিতর মুখ করে ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল। আমার দুই কৃতার্থ চক্ষু তার সেই শান্ত লাবণ্য গ্রহণ করল। আমি প্রসন্ন হয়ে তার ফিকে হয়ে যাওয়া আলতাপরা, পদ্মফুলের মতন পা দুখানি থেকে তার কালোপাড় দিশী শাড়ি, সাদা জামা, অনতিদীর্ঘ কোঁকড়া খোলা চুল, তার নিখুঁত সুন্দর বিবর্ণ মুখখানি, বুকের কাছে জড়ো করা কেবলমাত্র দুগাছি কঙ্কণ-শোভিত হাত দুখানি, সমস্ত বারবার চেয়ে দেখলুম। দেখলুম তার একহাতে একটি নীলসবুজ মিনে করা ছোট পেতলের বাক্স, আর অন্য হাতে সবুজ পাথরের দীর্ঘ একছড়া মালা। অপূর্ব সুন্দর। বর্ষায় ঘন বনানীর সবুজ অন্তরালের মতন ; সেই বনানীর ছায়া-লাগা বর্ষার নিটোল ধারার মতন, বনানীর অন্তরালে ঘন বনের ছায়া-পড়া স্বচ্ছ সবুজ দীঘির মতন। চোখ-জুড়োনো সবুজ পাথরের এক ছড়া মালা দেখলুম, আর তার বড়-বড় পুঁতির সঙ্গে পুঁতির আঘাত লাগার একটুখানি নিক্কণ কানে শুনলুম।

সে আমাকে দেখেনি। তার দুই চোখ ঘরের ভিতর নিবিষ্ট ছিল। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরই করে আমিও ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলুম। শূন্য ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলুম কোথায় তার আগ্রহভরা চোখের লক্ষ্যস্থল, শূন্য ঘর থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার তার দিকে চাইলুম ; দেখলুম যে রঙ-ওঠা পাল্লাভাঙা দরজাটা রয়েছে, সে নেই। তখনই আমার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল, আমার বিগতযৌবন মধ্যবিত্ত জীবনে অপরূপের রঙ লাগল। আমি প্রমথবাবুর সেই পরমাশ্চর্য জুড়ির কথা ভুলে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে নিচে নেমে এলুম আর চোখ বুজলেই দেখতে পেলুম তার চম্পক আঙুলে দুলছে এক ছড়া ঘন সবুজ মালা।

কাউকে কিছু বলতে বাধছিল : আমার স্বাভাবিক মুখরতা ভুলে গিয়েছিলুম, এ সব কথা গোপন করেছিলুম। এরে মধ্যে অনেকদিন অনেক কাজে উপরে গেছি, প্রতীক্ষা করে থেকেছি, আর তাকে দেখিনি। ক্রমে তার ছায়া মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এল, মনে সন্দেহ হতে লাগল, সত্যি বোধহয় তাকে দেখিনি, স্বপ্ন দেখেছি। এমন সময় যখন মন থেকে তার বিন্দুমাত্র চিন্তাও লোপ পেয়েছে, তখন তাকে আবার দেখলুম। সেই নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে, হেমন্তকালে, বাইরে যখন ঝোড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতার মাতামাতি।

পুরোনো কাগজওয়ালাটা বহুদিন আসেনি, তাই আমি একমাসের জমানো খবরের কাগজের রাশি উপরে নিয়ে গেছি। সেগুলোকে ভাঙা ড্রেসিং টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তাকে দেখলাম, এত কাছে যে হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁতে পারি। যতবার দেখেছি, সহসা গোটা মানুষটাকেই দেখেছি, তাকে যেতে-আসতে দেখিনি, ক্রমশ তাকে রূপ নিতে দেখিনি, আমি তাকে দেখেছি পরিপূর্ণভাবে। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম তার সেই আলতা-ওঠা রাঙা পা দুখানি, কালোপাড় দিশী শাড়ি, তার খোলা

কোঁকড়া খয়েটো চুলগুলি, তার পাংশু সুন্দর মুখ, বুকের কাছে জড়ো-করা তার নয়নাভিরাম হাত দুখানি, তার হাতের মিনে করা বাক্স—আজ ভালো করে দেখলুম তাতে লাল চোখওয়ালা নীলসবুজ চীনে ড্র্যাগন চিত্র করা—আর তার বড়-বড় সবুজ পাথরের সুদীর্ঘ মালা, শ্যাওলা-জমা সবুজ পুকুরের স্থির জলের উপর ঘন সবুজ বাঁশপাতার ছায়ার মতন, উইলোগাছের আলম্বিত পাতার ছড়ার ছায়ার মতন।

অনিমেষলোচনে দেখলুম তার মুখের সেই ব্যাকুল অতৃপ্তির ব্যথা, কালিমাচ্ছন্ন চোখের তারা দুটি একদিকে নিবদ্ধ। তার দৃষ্টিপথ ধরে আজ দেখলুম সেই বহুদিনের শূন্য ঘরে দামী নীল গালচে পাতা, তার উপর অযত্নে ছড়ানো রাশি-রাশি ছবি, নিপুণ হাতে আঁকা সব তৈলচিত্র। আর দেখলুম জানলার কাছে ঈজেলে যে অসম্পূর্ণ ছবিখানা ঘর আলো করে রয়েছে তাতে সেই পরিচিত বিবর্ণ সুন্দর মুখ, সেই কালোপাড় দিশী শাড়ি, খোলা চুল। আর সবুজ পাথরের মালা। চিত্রকরকেও দেখলাম, কিন্তু অস্পষ্ট, কারণ আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল, অনভ্যস্ত আবেগে হাত-পা কাঁপছিল। আমি সেই ভাঙা ড্রেসিংটেবিলটাকে অবলম্বন করে, চিন্তাস্রোত রোধ করে আশ্চর্য হয়ে দেখছিলুম চিত্রকরের দীর্ঘ দেহ, অস্পষ্ট বসনভূষণ, গৌর মুখশ্রী, চাপা ঠোঁট, বাঁকা ভ্রূ, চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি। সবই দেখলুম, কিন্তু অস্পষ্ট ; যত না দেখলুম তার চেয়ে বেশি অনুমান করে নিলুম। মনে হল তার যৌবন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব শুরু হয়নি, আর তার চোখে-মুখে অদ্ভুত অনাসক্তি।

আমার চতুরিন্দ্রিয় লুপ্ত হয়ে ছিল, কেবলমাত্র দৃষ্টিশক্তি বেঁচে ছিল। লুব্ধ চোখে যা দেখছিলুম, মুগ্ধ চেতনা তাই নীরবে গ্রহণ করছিল, নির্বিচারে, নিঃসন্দেহে।

চিত্রকর তুলি হাতে অপেক্ষা করছিল, আর সে গিয়ে নীরবে আলোর দিকে মুখ করে তার সামনে দাঁড়াল। তাকে দরজা থেকে ঘরের ভিতর অবধি হেঁটে যেতে দেখলুম না ; এক মুহূর্ত আমার কাছে ছিল, এত কাছে যে তার চুলের মৃদু মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিলুম, তার স্পন্দমান হাতের মালার মৃদু শব্দ কানে আসছিল ; পর মুহূর্তেই তাকে ঘরের ভিতরে ঈজেলের সামনে দেখলুম। কোনো কথার আদানপ্রদান হল না ; তার তৃষিত চোখের দৃষ্টি চিত্রকরের মুখের উপর গভীর প্রত্যাশায় নিবদ্ধ ছিল আর চিত্রকরের দৃষ্টি উদাসীন ও নির্লিপ্ত। আমি যেন সেখানে নেই, তাদের কাছে আমি যেন অদৃশ্য, আমার এই বাস্তব শরীর, এই চঞ্চল চেতনা, এই কৌতূহলী দৃষ্টি যেন সৃষ্টিই হয়নি। দেখলুম সে নিপুণ হাতে তুলির রেখার উপর রেখা টেনে যাচ্ছে আশ্চর্য নিশ্চয়তার সঙ্গে, তার কর্মরত হাতের উপর আনত চোখের দৃষ্টি, আর অন্যজনের মুগ্ধচোখ তার মুখ থেকে ক্ষণেকের জন্য ভ্রষ্ট হচ্ছে না। সমস্ত ঘরটি জুড়ে গভীর নীরবতা বিরাজ করছে।

কতক্ষণ এই রকম ছিলুম জানি না, হঠাৎ চকিত হয়ে দেখলুম বেলা পড়ে গেছে, গাছের ছায়াগুলি লম্বা হয়ে আসছে। জানলার বাইরে এক মুহূর্তের জন্য চেয়েছি আর সেই মুহূর্তেই ঘরের সেই অপূর্ব সম্ভারও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুভব করলুম আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, একভাবে ড্রেসিংটেবিল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে আর দুই চোখ বিষম ক্লান্তিতে বুজে আসছে।

সমস্ত শীতকাল কেটে গেল তার চিরন্তন শিহরণ নিয়ে। আমি তাদের কথা কাউকে বলতে পারলুম না। এক দিকে আমার জীবন যেমন চিরকাল ভরা ছিল, আমার সংসার, আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে, আমার বন্ধুবান্ধব, আমার একশো রকমের ছোটখাট কর্তব্য দিয়ে, তেমনই রইল। কিন্তু আর যে দিকটা আজন্ম শূন্য ছিল অনির্বচনীয়ের প্রত্যাশায়, যে প্রত্যাশা ইদানিং প্রায় নৈরাশ্যে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গোপনে গুঞ্জরণ

শুরু হল, পত্রপুষ্পে ভরে উঠল। মনে হল এতদিনের যে দুঃখ আমার, আমার জীবনে অপরূপের আলো লাগল না—তাই সব ব্যর্থ হয়ে গেল, সে কিছু নয়। মনে হল আকাশ-বাতাসকে মুক্ত করে পৃথিবীর চারপাশের দিগ্বলয় খসে পড়েছে। মনে হল—সে যে কথায় প্রকাশ করা যায় না, কি করে বোঝাব কী আমার মনে হল!

তারপর শেষবার তাকে দেখলাম ফাল্গুন মাসের আরম্ভের দিকে। তখন আমের বোলের আর বাতাবিফুলের গন্ধে বাতাস মধুর হয়েছে, পাতায়-পাতায় বসন্তকালের হাওয়া লেগেছে, আর আমাদের ব্যবহার-না-করা দোতলার চুণ-বালি, দরজার রঙ শুকনো হাওয়াতে খসে-খসে পড়ছে। সন্ধ্যাবেলা মনে হল দোতলায় কেউ আলো জেলেছে। আস্তে-আস্তে গেলুম, মনে হ'তে লাগল আমার বুকের ভিতর কে লোহার হাতুড়ী পিটছে। দরজার কাছে গিয়ে মন্ত্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম, দেখলুম সে আমাদের ভাঙা ড্রেসিংটেবিলে ঠেস দিয়ে, এক হাতে মাটির প্রদীপ উঁচু করে ঘরের মধ্যে বিষণ্ণ-ভাবে চেয়ে রয়েছে। অন্য হাতে সবুজ পাথরের মালা ; প্রদীপালোকে তার স্নিগ্ধ রঙ আমার চোখকে মুগ্ধ করল।

শূন্য ঘরে নীল গালচে পাতা, শূন্য ঈজেল। অযত্নে ছড়ানো ছবিগুলি কে যেন যত্নে সংগ্রহ করে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে সারি-সারি দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সমস্ত ঘরে অব্যবহারের ছাপ।

আমি সমব্যথী হয়ে তার দিকে চেয়েছিলুম, সহসা সে আমার দিকে তাকাল। এবার সে আমাকে দেখতে পেল, আমি আর অদৃশ্য রইলুম না, আমি চকিত আনন্দের সঙ্গে বুঝলুম সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। মালাসুদ্ধ হাতখানা সে একটুখানি আমার দিকে এগিয়ে দিল, তার চোখের গভীর নৈরাশ্য আমার অসহ্য বোধ হল। তার চোখের দৃষ্টি যেন আমার চোখের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল, আমি অব্যক্ত স্নেহে দুই হাত প্রসারিত করে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলুম। মনে হল হিমশীতল জলে আমি আবক্ষ অবগাহন করছি, আমার চোখে-মুখে, মনের ভিতর সেই হিমশীতল ছোঁয়া লাগল, আর সে যেন আমার বাহুপাশের মধ্যে বাতাসে বিলীন হয়ে গেল ; কিন্তু বিদায়কালে স্পষ্ট অনুভব করলাম সবুজ মালাখানি আমার হাতে তুলে দিল। তার সবুজ পাথরের শীতল কঠিন স্পর্শ আমার হাতে লাগল। আমি জীবনে এই প্রথম ও শেষবারের মতন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলুম।

ওরা তখন খেলার মাঠ থেকে, আফিস থেকে, বন্ধুদের বাড়ি থেকে সব ফিরে এসেছে। আমায় দেখতে না পেয়ে, উপরে এসে ধরাধরি করে আমাকে নামিয়ে নিয়েছে, মাথায় জলের ঝাপটা দিয়েছে, হাওয়া করেছে, আমার চেতনা ফিরে এসেছে। আমি সমস্ত প্রশ্ন থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য বালিশে মুখ লুকিয়ে ক্লান্তির ভান করে রইলুম।

অনেক রাগে ইয়ে বললে, 'আজ তোমার জন্য একটা সুন্দর জিনিস এনেছি, আর আজই তুমি আমাদের এমন ভয় দেখালে!'

আমি নীরব রইলুম।

সে আবার বললে, 'দেখ, কোর্টের কাছে হলটাতে আজ অনেক পুরোনো জিনিস নিলেম হচ্ছিল, তোমার জন্য এই মালাটা কিনলুম। সঙ্গে একটা ড্রাগন-আঁকা মিনে-করা বাক্স ছিল কলেক্টার সাহেবের মেম অনেক দামে ডেকে নিল।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলুম, তার হাত থেকে ঝুলছে এক ছড়া বড়-বড় পুঁতির সবুজ পাথরের মালা, বাতাবিলেবুর গাছের মাঝে বর্ষাধারার মতন স্নিগ্ধ-শ্যামকান্তিময়।

পাঠশালা

শম্ভুর মেজদাদু পঞ্চাশ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে, ৭০ বছর বয়সে মেলা টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরলেন। যাদের উনি বিদেশ থেকে এটা-ওটা পাঠাতেন, তারা কত বারণ করেছিল—অমন কাজ-ও কর না, এটা খুব খারাপ জায়গা, নোংরা, গরম, বেকারে আর জোচ্চোরে ভরা, দেখতে দেখতে তোমার পয়সাকড়ি আর তোমাকে আলাদা করে দেবে। তাছাড়া অসুখবিসুখ লেগেই আছে, মুখ্যুর একশেষ, মাদুলীতে বিশ্বাস করে, ভূত মানে। দেশের পৈতৃক বাড়িতে শেষ পর্যন্ত নাকি কি সব—যাক্ গে, সেকথা দিয়ে আর কি হবে—মোট কথা, এসো না। ওখানেই আরো রোজগার করতে থাক।

এ সমস্ত শুনে, খুসী হয়ে, মেজদাদু তাঁর আসার দিন আরো এক মাস এগিয়ে দিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে উনি নাকি ঐ জিনিস-ই খুঁজে বেড়িয়েছেন, কিন্তু পাননি। এখন দেখছ কান্ড! নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় সমস্তই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তাছাড়া বাপের ভিটে তো বটে!

শম্ভুর বাবার ছোটপিসি বললেন, 'তাহলে বেহালার সে-বাড়িটা কিনলে না কেন? তখন কত কম দাম ছিল। বাপের ভিটেতে তো কেউ বাস করতে পারবে না—স্রেফ ভূতের বাড়ি!'

'কেন পারবে না? আমেরিকায় এ-রকম বাড়ি লাখ লাখ ডলারে বিক্রি হয়, তা জানিস? এই নিয়ে গবেষণা হয়। তাছাড়া পঞ্চাশ বছর বিদেশে থেকে, আমিও ঠিক মানুষ নেই। কিচ্ছু ভাবিসনে তোরা। আমার বন্ধু ছ্যাচড়কে মনে আছে? সেই-যে ছ্যাচড়, যে বাবার ল্যাজওয়ালা ঘড়ি সারাবে বলে নিয়ে গিয়ে স্রেফ্ হারিয়ে ফেলল?—আমি তাকে তার পুরনো ঠিকানায় চিঠি দিতেই, সে ফোন্ করে জানিয়েছে যে তার মেরামতির ব্যবসা উঠে গেলেও, আমার ঘড়িটে সারিয়ে নতুনের মতো করে দেবে। আমার দয়ার দেনার একটুখানি তাহলে শোধ হবে।'

ছোটপিসির মুখ হাঁড়ি হল, 'ও! তা সময় কাটাবে কি করে?' মেজদাদু বললেন, 'কেন, আমার "নবেল পাঠশালা"-টি এবার খুলব। আমার কত দিনের স্বপ্ন এবার সত্যি হবে।' মেজপিসি আঁতকে উঠলেন, 'এ্যাঁ! নবেল পড়াবার পাঠশালা খুলবে? তাহলেই হয়েছে! তোমার পাঠশালায় কেউ ছেলে-মেয়ে পাঠাবে না, দেখো।' মেজদাদু চটে গেলেন, 'না, পাঠাবে না!! মুখে মুখে ইতিহাস, ভূগোল, অংক, জীব-বিজ্ঞান শেখাব। লিখতে পড়তে শিখলেই প্রাইজ দোব। তাছাড়া এ সে নবেল নয়। নবেল মানে নয়া, নতুন নিয়মে পড়াব কিনা। তাতে পড়তে জানবার দরকার হবে না—' 'কি যে বাজে কথা বল মেজদা! পড়াবেটা কে শুনি? একা তো পারবে না।' 'কেন, তুই আর তোর বর। তুই ঘরকন্না দেখবি, সে পড়াবে। সকালে সব পোড়োরা মুড়ি, কলা, আখের গুড় খাবে। তারপর একঘণ্টা পড়া, একঘণ্টা গাছে চড়া, বাগান সাফ করার ক্লাস, তারপর পুকুরে চান, মাছ ধরা—যারা লিখতে পড়তে পারবে তারা নিজেদের মাছ বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে, তারপর—'

ছোটপিসি উঠে পড়লেন, 'তা, কবে থেকে পাঠশালা শুরু হবে? কবে যেতে হবে? বাড়িওলাকে তো নোটিস্ দিতে হবে।' মেজদাদু মহা খুশি হয়ে বললেন, 'ধরে নে ১লা বৈশাখ প্রতিষ্ঠা দিবস। ছ্যাঁচড়টাকে পঞ্চাশ বছর দেখিনি, কিন্তু, আগের ঠিকানায় চিঠি দিতেই, ফোনে কথাবার্তা হয়ে গেল। আগের মতই গলা, তবে নস্যি নিয়ে একটু খারাপ হয়ে গেছে।'

তাই হল শেষ পর্যন্ত। মেজদাদু এর মধ্যে প্রতি হপ্তায় অমর্তপুরে ঘুরে এলেন। একটা চেনা লোক দেখলেন না, সব হয় চলে গেছে, নয় বোধ হয় মরেটরে গেছে। পুরনো বন্ধু ছ্যাঁচড়ের সঙ্গেও দেখা হল না। তবে মিস্তিরিরা উদয়াস্ত খাটছে। ওদের দলের মালিক ৭ দিনের কাজের হিসাব দেয়, মালমশলা এত, মজুরি এত, চা জলখাবার এত। সঙ্গে সঙ্গে মেজদাদু খরচা মিটিয়ে দেবার কথা বলেন। ওস্তাদ হাত জোড় করে বলে, 'টাকাটা আমি ছোঁব না। মালিককে বলবেন।'

অচেনা হলেও গাঁয়ের লোকের মহা উৎসাহ। মিনি-মাগনার পাঠশালা, জলখাবার দেবে, নেকাপড়া শেখাবে, সারা সকাল এঁটকে রাখবে—এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে! তবে সুয্যি ডোবার পর এ-পাকে কেউ আসবে না, এ-কথাটা তারা পষ্টাপষ্টি বলে গেল। মিস্তিরিরাও সূর্য ওঠার সঙ্গে আসে, সূর্য ডোবার সঙ্গে যায়। তখন মেজদাদুও এক কিলোমিটার হেঁটে রেল-স্টেশনের ধাবায় রুটি কাবাব খেয়ে, সন্ধ্যের গাড়ি ধরে কলকাতায় ফিরতে লাগলেন।

এক মাসে বাগান সাফ ; একতলা ফিটফাট ; পেছনের উঠোনে ছোট ইঁদারা আর বাগানের বড় ইঁদারা ঝালাই শেষ ; পুরনো তক্তাপোষ, টেবিল, বেঞ্চি, টুল বাইরে এনে মেরামত শুরু। মেজদাদু এবার ঠিক করলেন এখানেই থেকে যাবেন। স্টেশনের পাশে পল্লীমঙ্গল ব্যাংকে টাকা রাখার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামের মোড়ল কিছু টাকার বদলে খুসি হয়ে দুটো হ্যাজাক্, কতকগুলো তেলের বাতি, মোমবাতি, বাসনপত্র কেনার ভার নিল। মেজদাদুর ভাগ্নে বগাকেও অতি সহজেই নিয়ে আসা গেল। কারণ বগা বেকার এবং প্রেত-তত্ত্ববিদ্। বগা যাচ্ছে শুনে ছোটপিসি আর পিসেমশাই চটে কাঁই। 'ঐ দেখ মেজদাকে ভালোমানুষ পেয়ে মন ভাঙিয়ে নিচ্ছে।'

শেষটা ফাল্গুন-মাসের গোড়ার দিকের একটা সকালে ট্রাক-বোঝাই স্যুটকেস্, গেরস্থালির জিনিস, বিছানা, ছবির বই, সেলেট, রঙীন খড়ি ইত্যাদির সঙ্গে ছোটপিসি, ছোট পিসে, আর বগা সহ হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স কোলে মেজদাদু এসে পৈতৃক ভিটেয় উঠলেন। এটাতে আর কারো ভাগ ছিল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাপের সম্পত্তি যখন ভাগ হয়েছিল, অমর্তকুটির বলে এই বাড়ি তাঁর ভাগে পড়েছিল। তখন ছিল কুড়ি বছরের অব্যবহারে স্রেফ একটি পোড়ো বাড়ি। চোররা পর্যন্ত রাতে ইদিকে পা দিত না।

ছোট পিসি ট্রাক্ থেকে নেমেই বললেন, 'বগা, সেই প্রেত-তাড়ানি পুজোটা দে। প্রসাদ খেয়ে উপোস ভাঙব। খিদেয় পেট জ্বলে গেল।' সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সদর দরজা দিয়ে কালো, রোগা কোঁকড়া-চুলওয়ালা একটা লোক ছুটে বেরিয়ে এসে মেজদাদুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। মেজদাদুও এক গাল হেসে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ও কি রে ছ্যাঁচড়, তোর ছিঁচকাঁদুনে স্বভাবটা এখনো গেল না! খুসি হলেই তুই ডুকরে কেঁদে উঠতিস্! তোকে আজ দেখব একবারও ভাবিনি। চেহারাটা তো বিশেষ বদলায়নি। তা কি মনে করে?'

ছ্যাঁচড় ওদের আদর করে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আছি এখানেই, কাজকর্মের শেষটুকু নিজের চোখে দেখব ভাবলাম। তা দিদিমণি, ঐ পুজোটুজোগুলো এখন করলে খারাপ দেখাবে। আগে কর্মগুলো শেষ হক। এখন চানটান করুন, বিশ্রাম

নিন, জল খান।'

মেজদাদুও বললেন, 'সেই ভালো রে বগা। অসম্পূর্ণ কাজের ওপর কখনো পুজো হওয়া উচিত বলে তো মনে হয় না। চল্‌ রে ছ্যাঁচড়, তুই-ও আমাদের সঙ্গে বসে যা।' ছ্যাঁচড় কিছুতেই রাজী নয়, তার অনেক কাজ বাকি। সে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। ছোটপিসি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হুঃ! কাজ না আরো কিছু! বলিনি এরা বড্ড গোঁড়া। আমেরিকায় যা-তা খেয়েছ তুমি, তা উনি তোমার সঙ্গে খাবেন কেন? তবে আমেরিকায় রোজগার করা টাকা নিতে কোনো আপত্তি হবে না।'

মেজদাদু দুঃখিত হয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'এক পয়সাও নেয়নি আজ পর্যন্ত। বাড়ি সারাবার মাল-মশলা, মজুরির জন্যেও নয়। বরং পারলে আমাকে কিছু দেয়।' বলার সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁচড় একটা মরচে ধরা ক্যাশ-বাক্স আর এক গাল হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'কই, খাওয়াদাওয়া চুকল? কাণ্ড দেখ ভাই, বড় ইঁদারা থেকে যে-সব রাবিশ উঠেছে, তার মধ্যে এটাকে পেলাম। মনে হচ্ছে তোমার পিসির বিয়েতে যে ক্যাশবাক্স ভরতি যৌতুকের মোহর উধাও হওয়ার গল্প শুনেছিলাম, সেটা সত্যি! চোর সেটিকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে ভেবেছিল পরে উদ্ধার করবে। তারপর আর হয়ে ওঠেনি।'

মেজদাদুও আকাশ থেকে পড়লেন, 'আরে তাই তো! এই তো ঠাকুরদার নাম খোদাই করা রয়েছে! ই—স্! এই জন্য বিয়েটা ভেঙ্গে গেছিল! তাম্পর তোর কাকা এসে পিঁড়িতে বসল, তবে পিসির বিয়ে হয়েছিল।' 'আছেন দুজনে স্বর্গে।' এই বলে এমনি ভক্তি ভরে ছ্যাঁচড় তাঁদের উদ্দেশে নমো করল যে মেজদাদুর বেজায় হাসি পেল।

সেদিন থেকে পাঠশালায় ভরতি হবার জন্যে গাঁয়ের সব ছেলেমেয়ে লাইন দিল। মেজদাদু সকাল থেকে বাইরের ঘরে বসে সবার নাম লিখলেন। বগা কিছুদিন হোমিও-প্যাথি পড়েছিল, তাকে দিয়ে ৫১টা ছেলেমেয়ের নাকের ও কানের ভেতর পরীক্ষা করালেন। গাঁয়ের লোক মহা খুসি। তার ওপর জলখাবার! একদিনে প্রায় সব সীট ভরে গেল। তাই বলে সীট মানে সত্যি বেঞ্চিটেঞ্চি নয়, ঐ খানিকটে বসার জায়গা।

পরদিন থেকে মহা হৈ চৈ করে পাঠশালা আরম্ভ হয়ে গেল। পোড়োরা হাঁ করে দত্যি-দানোর গল্প শুনল। তেঁতুল-বিচি দিয়ে বিশ-পঁচিশ বলে চমৎকার একটা খেলা শিখল। গাছে চড়ে পাখির বাসা দেখল। ডিমে হাত দেওয়া বারণ। বাগানের আগাছা তুলল। খেল-দেল। মাছধরার ছিপ তৈরি করল। তারপর দুপুরে সব বাড়ি গেল।

রাতে নতুন খাতায় মেজদাদু সব নাম তুলছেন, এমন সময় ফস্ করে ছ্যাঁচড় ঘরে ঢুকে বলল, 'হ্যাঁরে, দ্যাখ তো এঁকে চিনতে পারিস কি না?' মেজদাদু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, 'সে কি! পণ্ডিতমশাই! আমি ভেবেছিলাম ইয়ে'—পণ্ডিতমশাই বললেন, 'না রে বাবা, সে সব নয়। আমি এসেছি তোর পাঠশালায় ভরতি হতে।'

'এ্যাঁ! বলেন কি, পণ্ডিতমশাই!' 'হ্যাঁ, তাই, তোর ঐ তেঁতুল-বিচির খেলা দিয়ে গুণতে শেখাটা আমার না জানলেই নয়। মাঝে মাঝে ভারি অসুবিধায় পড়ি। সমস্কিতের মানুষ, আঁকটাঁক আমার মাথায় ঢোকে না। তোর ক্লাসের এক কোণে মাটিতে বসে থেকে সব দেখব-শুনব, তাতে তোর আপত্তিটে কি বল?'

মেজদাদু বললেন, 'না, না, সে তো সৌভাগ্যের কথা। তবে কি জানেন, দুটো পোড়ো এনে গার্জেন হয়ে ঢুকলে ভালো হ'ত।'

পণ্ডিতমশাই এক গাল হেসে উঠে পড়লেন। 'বেশ তাই হবে। আনব দুটোকে ধরে।'

আনলেন-ও তাই। পরদিন সবে মাত্র তেঁতুল-বিচি ভাগ করা হচ্ছে, দুটি ছাত্র নিয়ে পণ্ডিতমশাই এসে ঢুকলেন। তারপর আর দেখতে হল না। পোড়ো দুটি মহা ছটফটে,

মাঝে একবার উঠে নারকেল গাছে সড়সড় করে চড়ে বসল। পণ্ডিত-ও তেমনি। পেছন পেছন গাছে চড়ে, কান ধরে নামিয়ে আনলেন। ব্যাপার দেখে ক্লাসসুদ্ধ সব হাঁ! কিন্তু তেঁতুল-বিচি দিয়ে গুণতে শেখার সময় মেজদাদু আরো অবাক হলেন। দেখতে দেখতে ১, ২ থেকে একেবারে ভগ্নাংশ, দশমিক, তেঁতুল-বিচি দিয়ে কষে ফেলতে লাগল। তার মধ্যে বার দুই ঝপাং করে পুকুরে নামল, চ্যাঁচাল, হাসল, এ-ওকে নাকানিচুবানি খাইয়ে নিল। আবার ভালো মানুষের মতো এক পাশে এসে বসল।

ক্রমে মেজদাদু হাঁপিয়ে উঠলেন। যখন ছুটি হল, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতমশাই কি তাঁর ছাত্রদের টিকিটি দেখতে পেলেন না যে, ক্লাসের রীতিনীতি সম্বন্ধে কিছু শেখান। অথচ শুধু যে তরকারির বাগান সাফ করে দিয়ে গেছে তা নয়, কচি কচি চারাও লাগিয়ে দিয়ে গেছে! সেদিন সন্ধ্যায় বগা ঘটা করে ভূত-তাড়ানি পুজো দিল।

সেই যে অমর্ত পাঠশালার প্রতিষ্ঠা হল, আজ পর্যন্ত তার কি নাম-যশ! অথচ পণ্ডিতমশাই আর তাঁর ছাত্ররা, এমন কি ছ্যাঁচড়ও আর কোনো দিনও এল না। ছ্যাঁচড় টাকাকড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল না। তার মিস্তিরিরাও কাজ সেরে সেই যে বিদায় নিল, আর তাদের দেখা গেল না। মেজদাদু তাজ্জব বনে গেলেন।

শেষটা আর থাকতে না পেরে, একটা রবিবার কাউকে কিছু না বলে ছ্যাঁচড়ের পুরনো ঠিকানায় গিয়ে দেখেন, সেখানে অচেনা লোকের বাস। তারা ছ্যাঁচড়ের দাদার বংশধর। মেজদাদুকে প্রণাম করে, তারা বার বার বলতে লাগল, কাকা শেষ বয়সে ভারি ধার্মিক হয়ে গেছিলেন। বুড়ো পণ্ডিতমশায়ের শিষ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে চলে গেছিলেন। সে-ও বছর কুড়ি হয়ে গেল, আর তাঁদের কোনো পাত্তা নেই। সব সম্পত্তি ভাইপোদের দিয়ে গেছেন। তারা বলল, 'খালি একটা দুঃখ ছিল যে আপনার কাছ থেকে নাকি অন্যায় ভাবে কি সব নিয়েছিলেন, যেমন করেই হোক সেটি শোধ না করে ছাড়বেন না। কি আর বলব আমরা, আপনাকে প্রণাম করে মনে হচ্ছে কাকাকে বুঝি আবার ফিরে পেলাম।'

মেজদাদু বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এসেই বগাকে বললেন, 'আচ্ছা বগা, সেদিন তোর অত ঘটা করে ভূত-তাড়ানি পুজো দেবার কি দরকারটা ছিল শুনি? ও-সব হল গিয়ে —ইয়ে—কুসংস্কার, তাও জানিস্ না!'

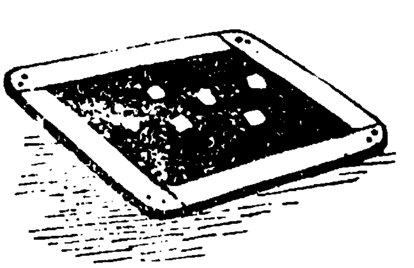

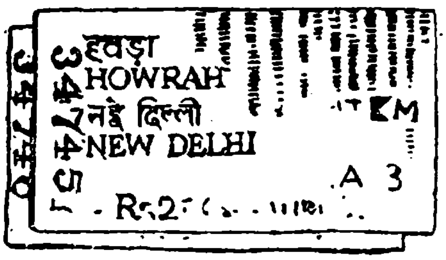

নাথু

আমার বন্ধু বটু নিজে কখনো নাথুকে দেখেনি। গল্প শুনেছে। ওর দাদুর বাড়িতে সে আসত। দাদু বলতেন, 'ওর ভালো নাম হল নাথিং, তার থেকেই ছোট করে হয়েছে নাথু। দেখিস্নি, কেমন কেউ-না হয়ে থাকে। ঘরে থাকলেও মালুম দেয় না। আগে নাকি কোন সার্কাসের ম্যাজিশিয়ানের চ্যালা ছিল। ম্যাজিশিয়ান ম'লে অর্ডার-সাপ্লায়ার হয়েছে।'

যা বলা যায় এনে দেয়। ইন্কম ট্যাক্সফ্যাক্স দেয় না নিশ্চয়। পারমিটেরো ধার ধারে না। কেউ কিছু বলেও না। কারো চোখে পড়লে তবে তো বলবে। ঘরে ঢুকলে একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে থাকত। পথে বেরোলে, ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যেত। বটুর দাদুর বাড়ির লোকরা ওকে এতকাল দেখেছে, তবু কেউ ওর নাক মুখ চোখ কান আলাদা করে মনে করতে পারে না। স্রেফ একটা বড় জনতার গড়পড়তা চেহারা নিয়ে, লোকটা সকলের চোখের সামনে নিখোঁজ হয়ে থাকে! রোগাও না, মোটাও না ; লম্বাও না, বেঁটেও না ; কালোও না, ধলাও না ; কাপড়চোপড় হল ভিড়ের অন্য প্রত্যেকটা লোকের মতো! কে চিনে রাখবে ওকে!

নাথুর পথ চেয়ে থাকত সবাই। আসত হয় ভোরে, পুরুষেরা কাজে বেরোবার আগে, নয়তো সন্ধ্যায় তারা ফিরলে পর। ধামু মাঝে মাঝে বলতেন, 'আহা, বড় উপকার করে আমাদের। যে-সব জিনিস বাজারে মোটে পাওয়া যায় না, কত কম দামে সে-সব জোগাড় করে আনে কোত্থেকে তাই ভাবি। আমার ডাইবিটিসের ওষুধটা ডাক্তারবাবু কোথাও পেলেন না, আর ও ঠিক এনে দিল!'

বড় জ্যেঠিরা কিছুদিন হল পুনে থেকে বদলি হয়ে এসেছিলেন। নাথুকে আগে দেখেননি। একটু কড়া গলায় বললেন, 'কিন্তু আনলে কি করে? কোম্পানি তো বন্ধ হয়ে আছে।' ধামু শুনে অবাক! 'তাহলে আনল কি করে?' 'কি করে আবার, নিশ্চয় ওর চোরাই কারবার। বে-আইনীভাবে সব হয়। কোন দিন না আমাদের সুদ্ধু হাতে হাত-কড়া পড়ে!'

বড় জ্যাঠা কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'তোমার যত বাজে কথা! চোরাই কারবার আবার কি? ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমাদের যখন যা দরকার হয়েছে, সব এনে দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চিনি চাল ময়দা তেল, সব এনে দিত। কেউ পেত না, আমরা পেতাম। দামও বেশি নিত না।'

বড়জ্যেঠিমা তেরিয়া হয়ে উঠলেন, 'কি এমন মন্দ বললাম? যা কেউ পায় না, তা ও পায় কোথায়? কালো-বাজারে ছাড়া আবার কোথায়? আমাদের উপকার হতে পারে, কিন্তু কাজটা বে-আইনী। ওকে পুলিসে দেওয়া উচিত। তোমাদের মায়া লাগে তো আমি দেব। দাদা স্পেশ্যাল পুলিসের বড় অফিসার। তাঁর কানে একবার কথাটা তুলে দিলেই হল। যাবেন বাছাধন শ্রীঘরে!'

ছোড়দাদু বেজায় চটে গেলেন, 'তা তো বটেই! তাহলে কবে কোন ঘোড়া জিতবে

কে খবর এনে দেবে শুনি ? ড্রাইভার ছাড়াতে গাড়ি বেচতে হবে ! বেশ তো ছিলে বাপু পুনেতে, আবার বদলি হয়ে আসবার কি দরকার ছিল ? যার যা পেশা। ওর ব্যাপারে তুমি নাক গলিও না।'

বড়জ্যাঠা আবার মুখ তুললেন, 'লোকের উপকার করা কিছু খারাপ কাজ নয়, বড়বৌ। চুরি-ডাকাতি নয়, কিছু না !'

'খারাপ কাজ কি না জানি না, তবে বে-আইনী কাজ।' এই বলে জ্যেঠি রাগ করে চলে গেলেন।

ছোড়দাদু এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন, 'সবই তো এনে দেয়। কিন্তু বুধবার আমাদের চারজনের জন্য দিল্লী যাবার চারটে থ্রি-টিয়ারের টিকিট যদি দিতে পারত, ক্রিকেট খেলাটা দেখে আসা যেত !'

বটুর বড়জ্যাঠার ছেলে নিখিলেশ ঐ বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করত। নাথুর সঙ্গে বেজায় ভাব ছিল। সে বলে বসল, 'মা যদি নাথুকে পুলিসে ধরিয়ে দেয়, আমি কিন্তু নিরুদ্দেশ হয়ে যাব। তোমরা কাগজে 'মাদার ইল্, কাম ব্যাক্ !' লিখলেও ফিরব না। অ্যানুয়েলের আগে তোমরা সবাই আমাকে কি না বলেছিলে, কিন্তু কেউ কোনো উপায় বাতলাওনি। শেষটা ওর কাছে দুঃখ জানাতে, পরদিন থলি থেকে একটা চিরকুট বের করে দিল, তাতে সব সাবজেক্টের ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন আর তার উত্তর লেখা ছিল। সেইটে পড়েই না তরে গেলাম।' এই বলে নিখিলেশ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বলেছিল আমার বাপ-ঠাকুরদার কাছে ঋণী। পয়সা নেয়নি !'

তাই শুনে সবাই ব্যস্ত হয়ে বলল, 'অ্যাই চুপ, চুপ ! তোর মা শুনতে পেলেই হয়ে গেল !' ঠিক সেই সময় নাথু এসে দেখা দিল। হাতে সেই নেই-রঙা ক্যাম্বিসের থলি, জিনিসপত্রে এমনি ঠাসা যে মাটিতে রাখতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কখন যে নিঃশব্দে দরজা খুলে ফুশ করে ঘরে ঢুকেছিল কেউ টের পায়নি। ঐরকম ওর যাওয়া আসা। বড় জ্যেঠি একদিন বলেছিলেন, 'দুষ্কৃতকারীদের সর্বদা পা টিপে টিপে চলতে হয়, নইলে ধরা পড়বে যে ! তোমাদের পেয়ারের নাথু যদি আপিং-কোকেন সরবরাহ করে, তাহলেও আশ্চর্য হব না !'

কথাটা কারো পছন্দ হয়নি। বড় জ্যেঠি তবু ছাড়েননি, 'উপকার করে আমাদের সকলকে পাপের ভাগী করে। নইলে আমাদের সঙ্গে ওর কি ! এত উপকার করে নাকি কোনো ভালোমানুষের বেটা ! হুঃ ! আমরা কি ওর বাপের পিতেমো !'

সেদিন বড় জ্যেঠি চলে গেলে দাদু বলেছিলেন, 'আমরাও যে একেবারে কখনোই ওর উপকার করিনি তা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোথায় যেন অনেক টাকা লোন্ নিয়ে শোধ করতে পারছিল না। মিলিটারি ব্যাপার। ওর নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল। আমি উকিল পাঠিয়ে ঐ লোন্ শোধ করে দিয়েছিলাম। তার আগে নাপতেনী সাজিয়ে আমাদের এই বাড়িতে ওকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের শখের থিয়েটার ছিল, তাই মেলা উৎকৃষ্ট দাড়ি গোঁপ পরচুলা থাকত আমার কাছে। তবে সে অনেক দিনের কথা ; নাথু না হয়ে, ওর বাবাও হতে পারে। তারো নাম নাথু ছিল।'

বড়পিসি রেগে গেলেন, 'কি যে বল বাবা, নাথু আবার একটি পদবী নাকি যে বাপও নাথু, ছেলেও নাথু।' 'তা হবে না কেন ? দেবনাথ যদি একটা পদবী হতে পারে, নাথু-লালই বা হবে না কেন ?'

সেদিনের কথা থাক। মোট কথা আজও নাথু এল, গলাভরা হাসি, থলি ভরা জিনিস। এসেই বলল, 'কিছু দরকার নাকি, স্যার ?' ছোড়দাদু রসিকতা করে বললেন, 'তা দরকার বৈ কি। বুধবারের জন্য চারটে দিল্লী যাবার থ্রি-টিয়ারের টিকিট দিতে

পারিস্ ?' নাথু বলল, 'পারি স্যার, আছে আমার কাছে।'

এই বলে থলি থেকে বের করে দিল। সবাই হাঁ! ছোড়দাদুর চোখ কপালে উঠল, 'কি করে পেলি, নাথু ?' নাথু মুচকি হাসল, 'সে এক খোদ্দের ফরমায়েস করেছিল স্যার, তা তার বাড়িতে ব্যামো। তাই নিল না। ১০% রিবেট আছে স্যার।' বলা বাহুল্য নগদ টাকা দিয়ে তখুনি ছোড়দাদু টিকিট নিতে প্রস্তুত। নাথু টাকা নিল না। 'থাক স্যার, তাহলে পুরনো ধারটা পুরোপুরি শোধ হয়ে যায়। বড়কর্তা তো জানেন সব।'

বড় জ্যাঠাও খুব হাসলেন, 'তুমি আমাদের এত উপকার কর নাথু, কিন্তু আমার গিন্নি তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। চেনেন না তো। মফঃস্বলের মেয়ে। ছিলাম পুনেতে। বলেন যে, তুমি আপিং-কোকেন সরবরাহ করলেও আশ্চর্য হবেন না। আছে নাকি তোমার কাছে ?'

নাথু লাফিয়ে উঠল, 'তা বলতে হয় স্যার। এই নিন।' এই বলে থলি থেকে দুটো খুদে শাদা প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরের দরজার পরদা সরিয়ে বড় জ্যেঠির স্পেশ্যাল পুলিস দাদা ঘরে ঢুকে কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'বাঃ, একে-বারে বমাল সমেত হাতে হাতে! না, নড়বে না! প্যাকেটসুদ্ধ দুহাত ওপরে তোল! টোপল, মগনলাল, হাতকড়া লাগাও, থলি তল্লাশ কর।'

বাকি সকলের চক্ষু চড়কগাছ। ই কি কাণ্ড! বড় জ্যাঠা চটে লাল, 'দেখ জ্যোতিষ, বাড়াবাড়ি ভালো না। নাথুকে আজন্ম চিনি, ওর মতো সৎ উপকারী লোক—সেদিকে কান না দিয়ে বড়জ্যেঠির দাদা আঁতকে উঠলেন, 'আরে, আরে, এ কি! এক মুহূর্তের জন্যে চোখ ফিরিয়েছি, এর মধ্যে লোকটা গেল কোথায়! মগনলাল, ক্যা হুয়া ?' টোপল আর মগনলাল হাতকড়া হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। 'এ কি তাজ্জব-কি ব্যাপার, স্যার ? সিরেফ দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল !!'

স্যার রেগে গেলেন, 'ক্যা দেখতা ? খানাতল্লাশি কর!' ওরা ছুটে বাড়িময় তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। স্যার নিজে থলিটা তুলে নিয়ে হাঁ! তাতে এক্কেবারে কিচ্ছু নেই!! ছুঁতেই প্যাত্ প্যাত্ করে কাত হয়ে পড়ল। কি করে অমন ঠাসা দেখাচ্ছিল কে জানে! বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু পাওয়া গেল না। না মানুষ, না জিনিস!

বড় জ্যেঠির দাদা অপ্রস্তুতের একশেষ। পারলে বড় জ্যাঠার পায়ে ধরেন। সম্পর্কে বড় হলেও, বয়সে ৫ বছরের ছোট। 'কিছু মনে কর না, বকুদা ; মিনু যে কি বাজে খবর দেয়, তার ঠিক নেই। ছোটবেলা থেকে ঐ সন্দেহবাতিক। যেন দুনিয়াসুদ্ধ ও ছাড়া সবাই দুষ্কৃতকারী! ভালো মানুষটাকে ভয় দেখিয়ে ভাগাল! আমার লোকগুলোরও বুদ্ধির বহর দেখলে ? নাকি দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল! তাই পারে কখনো জ্যান্ত মানুষে!!' জ্যেঠির দাদা চলে গেলে, কারো মুখে কথা নেই। খানিক বাদে ভয়ে ভয়ে পকেটে হাত দিয়ে ছোড়দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে! টিকিটগুলো তো ঠিকই আছে দেখছি!'

আর আসেনি নাথু। পরে ওর থলিটাকেও বটুরা খুঁজে পায়নি। ছোড়দাদুর কি দুঃখ, 'আশা করি ও ভাবেনি আমরাই ওর পেছনে পুলিস লেলিয়েছি!'

বড় জ্যাঠা মাথা নাড়লেন, 'না, তা ভাবে নি। পুরনো ধার শোধ হয়ে গেছে, তাই আর আসার দরকার নেই। তবে শেষবার এই খারাপ ব্যবহারটা পেল, এই যা দুঃখ। বড় জ্যাঠা জোরে জোরে নাক টানতে লাগলেন। এই হল বটুর গল্প।

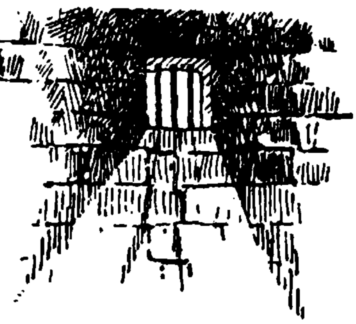

শেল্টার

জায়গাটার নাম বলা বারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেমন, এখনো ঠিক তেমনি সংকটময় অবস্থান। মালিক বদলায়, জায়গা বদলায় না। এইটুকু বলি যে ভারতের উত্তর-পূব কোণের নাকের ডগা। দুদিকে ভারত, একদিকে বাংলাদেশ, একদিকে বর্মা। চারদিকে পাহাড়। সেই সব পাহাড়ের চাইতে উঁচু এই পাহাড়। ঠিক যেন ঝান্ডা তুলে বলছে—এই দেখ, এইখানে আমি! কি করতে পার, কর!

চমৎকার জায়গা। যেমনি অবস্থান, তেমনি আবহাওয়া। মশা নেই, মাছি নেই, আরশুলো নেই। তবে হ্যাঁ, সাপ আছে, শুঁয়োপোকা আছে; গুবরেপোকা, মাকড়সা, মৌমাছি, বোলতা, বনের গহনে ছোট মেটে রঙের ভালুক, বুনো কুকুর যারা নেকড়ের মতো হিংস্র, প্রকান্ড বাদুড়, প্যাঁচা, অজস্র পাখি—এ সমস্তই আছে। প্রকৃতির লীলা-ভূমিতে এরা থাকবে না-ই বা কেন? মানুষই বরং পরে এসেছে।

বন-সম্পদের তুলনা হয় না। ঝাউ, সরল, তুঁতফল, বাঁশঝাড়। গাছের ডালে অর্কিড ঝোলে। সেকালে সায়েবরা বিলিতী ফলের গাছ পুঁতেছিল—আপেল, পীচ, এপ্রিকট, ন্যাসপাতি। আরো নিচে আনারস, বাতাবি। তাছাড়া বাজারে বিদেশী জিনিস উপচে পড়ছে, খোদ্দেরে গমগম করছে। বেআইনী ছাড়া আবার কি! বলিনি স্রেফ নন্দনকানন!

অসীমের বড় মামা হলেন বন-বিভাগের মাঝারি কর্তা। ঐখানে সর্বেসর্বা। তিনি লিখলেন, 'চলে আয়। স্বর্গের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। কখনো যাইনি অবিশ্যি সেখানে। আমার কোয়ার্টারটাও একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার, অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো স্বর্গীয় হয়ে যাবে। দেখতে চাস্ তো এই বেলা আয়। তাছাড়া চারদিকটা রহস্যে গজ্‌গজ্ করছে। নেহাৎ আমার সময় নেই। তোর শ্যামরতনদা এলে হাতে চাঁদ পাবেন। তাঁকেও আলাদা লিখছি। মোট কথা দুজনে চলে আয়। ইতি। বড় মামা। পুঃ—ছোড়দিকে বলে আমার জন্য আমসত্ত্ব আনিস্। ঐটে পাইনে।'

কাজেই চলে গেল অসীম। একাই গেল। প্রায় ষোল বছর বয়স, ইলেভেনে পড়ে, যাবে না-ই বা কেন? শ্যামরতনদাদের বাড়ি রং হচ্ছিল। বললেন পরে যাবেন। অসীমের যদি সত্যি ভূ-বিদ্যায় আগ্রহ থাকে তাহলে এমন সুযোগ ছাড়ে না যেন। নাকি প্লেনে গেলে সুবিধা হত। সুবিধার সঙ্গে অসীমের কী? সুবিধার বড্ড খরচ। খানিকটা রেলে, পাহাড়ি পথে বাসে, তাই বা মন্দ কি। বেশ দেশ দেখতে দেখতে যাওয়া গেল। পথটা খুব ভালো ছিল না, দেড় ঘণ্টা লেট হল। বড়মামা বাস আপিসে জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঐ বাসেই ওঁদের কিছু ওষুধপত্রও এল।

ঐ জীপে করে পাহাড়ের আরো খানিকটা ওঠা গেল। বন-বিভাগের ঘরবাড়িগুলো সুরক্ষিত বনের গা ঘেঁষে। সব কিছুর কেমন বিদেশী চেহারা। বড়মামা বিয়ে-থা করেননি। বিধবা বড় মাসিই বাড়ির গিন্নি। বেশ রেগে ছিলেন। বোধ হয় লেট্ দেখে ভাবনা হচ্ছিল। অসীম প্রণাম করতেই চুক্ করে একটু আদর করে বললেন, 'তাও

ভালো। ভাবলাম আরো দু'জন বুঝি নিখোঁজ হল।' অসীমের দু'কান খাড়া। বড়মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, দিদি! কি যে বাজে বক! ছেলেটা রেলেও বিশেষ খাবার-দাবার পায়নি।'

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে মাঝের ঘরের গোল টেবিলে ভুনি খিচুড়ি, আলু-মটরের চচ্চড়ি, বুনো হাঁস ভাজা আর শেষে বড় বাটি করে খোবানি দেওয়া ক্ষীর! বড়মাসি বললেন, 'এই মগের মুলুকের একটা সুবিধা হল সারা বচ্ছর শীতের তরকারি পাওয়া যায়।'

খেয়েদেয়ে উঠতেই পশ্চিমের পাহাড়ের পেছনে সূর্য নেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। বড়মামা চিঠিপত্র নিয়ে বসলেন। অসীম সোয়েটার গায়ে দিয়ে ঘুরঘুর করে বাংলোটা দেখতে লাগল। এ ধরনের বাড়ির কথা আগেও শুনেছিল। একতলাটা দোতলার সমান উঁচুতে, বড় বড় গাছের গুঁড়ির ওপর বসানো। এমনি পাকা কাঠ যেন শক্ত পাথর, সহজে পেরেক ঢোকে না। চারদিকে জালে ঘেরা চওড়া বারান্দা। নিচের থেকে মজবুত কাঠের সিঁড়ি ঐ বারান্দায় উঠে এসেছে। সেটাকে আবার কপি-কলের সাহায্যে ভাঁজ করে তুলে ফেলা যায়। ভারি ইন্টারেস্টিং। বারান্দায় পড়ার টেবিলে বসা বড়মামা শীতের চোটে উঠে পড়লেন। বললেন, 'সেকালে বুনো জানোয়ারের উপদ্রব ছিল তাই এই ব্যবস্থা। নিচে সায়েবদের টবের ফুলের সংগ্রহ দেখিস্ কাল সকালে। টবে স্ট্রবেরি করে-ছিল। মাশ্রুম করেছিল। এখনো হয়। যাই বলিস্ ব্যাটাদের গুণ ছিল। টিনের চালের তলা থেকে ঐ যে সারি সারি অর্কিড ঝুলছে, ওগুলোর বয়স কম করে পঞ্চাশ বছর! লং ডে হয়েছে তোর, এবার শুয়ে পড়া যাক্। জানলায় জাল লাগানো, কাজেই বাদুড় ঢুকবে না। তবু বালিশের নিচে টর্চ রাখিস্।'

ব্যাস্, এক ঘুমে রাত কাবার। চওড়া বারান্দায় পুবের রোদ। বড়মামা ব্রেক্ফাস্ট করতে বসেছেন। ভুট্টার পরিজ্, ঘন লালচে দুধ, বিচি-ওয়ালা মিষ্টি কলা, টোস্ট, মাখন, ডিম সিদ্ধ, মাসির হাতের জ্যাম। বড়মামা বললেন, 'বোস্, খা। সারা রাতের না-খাওয়ার পর, সকালে এই সব পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। সকালে খাটবি। দুপুরে বড়দির ঘন্ট চচ্চড়ি—সেগুলোও নট্ ব্যাড্, এই আমি বলে দিচ্ছি—বিকেলে স্রেফ্ এক পেয়ালা চা, রাতে আর্লি ডিনার। তাহলে ৪৭ বছর বয়সেও আমার মতো ইয়ং থাকবি!' এই বলে সত্যি সত্যি নিজের বুকে গুম্‌গুম্ করে দুটো কিল বসিয়ে দিলেন।

কাজে যাবার আগে বলে গেলেন, 'সকালে বাড়ির চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখিস্! লাঞ্চের পর সংরক্ষিত বনে নিয়ে যাব। আমার টোবি কুকুরটাকে সঙ্গে নিস্, পথ হারালে খুঁজে দেবে।' এই বলে একটা টাট্টু ঘোড়া চেপে পাহাড়ে পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দুজন লোক সঙ্গে গেল।

বড়মামা চোখের আড়াল হলেই, মাসি বললেন, 'তাই বলে শেল্টারের দিকে যাস্ না যেন।' অসীম অবাক হল, শেল্টার? সে আবার কি বড়মাসি? মামু তো কিছু বললেন না।'

'তা বলবে কেন শুনি? বললেই তো সেখানে ছুটবি। যার কথা অজানা তাকে তো আর কেউ দেখতে যায় না। চালাক কম নাকি ঐ ছেলে! কিন্তু আমিও বলি যাস্‌নে বাপু।'

'সব জিনিস দেখা ভালো। যাব না-ই বা কেন।'

'আরে সাপখোপ কত, আর তার চেয়েও খারাপ জিনিস আছে। তাছাড়া পথ-ও চিনিস্ না। কেউ যায়ও না ওদিকে। একা তো নয়ই।'

'একা তো যাচ্ছি না, টোবি সঙ্গে যাচ্ছে।' মাসি চটে গেলেন, 'পুরুষমানুষদের ভাল কথা বলা কেন! যা খুশি কর গে যা। তবে মোজা পায়ে দিস্ আর ঐ সেঁপো

লাঠিটা নিস্।'

সেঁপো-লাঠিটা কোনো মজবুত লতার শেকড় দিয়ে তৈরি মনে হল। মুন্ডুটা অবিকল সাপের মতো দেখতে। ওটা নেওয়া মন্দ হবে না। কাঠির সিঁড়ি দিয়ে নিচে আসতেই দেখি লালবেহারী চৌকিদার ঝাঁকড়াচুল লাসা টেরিয়ার টোবিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকেও বড়মাসি কিছু বলে থাকবেন।

টোবির বকলস থেকে চেন খুলে অসীমের হাতে দিয়ে লালবেহারী বলল, 'একতলায় টবের বাগান, অর্কিড, সামনের বাগানের বিলিতী ফুলগাছ দেখে যান—গোড়ায় সায়েবরা লাগিয়েছিল। বছরে বছরে তার বিচি থেকে মালি নতুন চারা তোলে। ঐ মালিকেও সায়েবরা ট্রেনিং দিয়ে গেছে। তখন গাছে জল দেনেওয়ালা ছোকরা ছিল। এখন গোঁফ পেকেছে। তবে ফুলবাগানে কারো ঘোরা পছন্দ করে না।'

বাস্তবিকই তাই। মাথায় সাড়ে চার ফুট, পাকা দড়ির মতো চেহারা মালির! বাগান থেকে অসীমকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ওরই মতো চেহারার আরেকটা লোকও ছিল। সে বলল, 'এখানে কেন? যাও না ওপরে শেল্টার দেখে এসো। জব্বর জিনিস। ঐখানে সায়েবরা শেষ ঘাঁটি করেছিল। সবাই বলত নেতাজি পল্টন নিয়ে এই এল বলে! বোমা পড়বে। সব তচ্‌নচ্ হবে। সায়েবরা তখন জিনিসপত্র নিয়ে ঐ শেল্টারে গিয়ে উঠল।'

অসীমের বেজায় কৌতূহল, 'গেছ নাকি তোমরাও ওখানে? বল না কি ব্যাপার!' বুড়ো তো তাই চায়। তড়বড় করে এগিয়ে এসে বলল, 'চল তোমায় এগিয়ে দিই। যাইনি আবার ওখানে! দিনে চল্লিশ বার যাওয়া-আসা করে জান বেরিয়ে যেত। ঘড়ি ঘড়ি বোতল লাও, সোডা লাও, মুরগি রোস্ট লাও। ক্লাস সিক্স অবধি পড়েছিলাম তো, ইংরিজি সরগড় ছিল। আমাকেই সব বলত। হরকু মালির পিঠে জিনিস চাপিয়ে নিয়ে আসতাম।'

'তুমি এখানে কি করতে? পল্টনে ছিলে নাকি?' মংলু লোকটার কি হাসি। 'আমি লিখতে পড়তে জানি, আমি পল্টনে যাব কেন? তাছাড়া ঐ গোলাগুলির মধ্যে যেতে লামা মানাও করেছিলেন। আমি এখানে রসদ জোগাতাম। নিচে বাবার দোকান ছিল। হিসাবও রাখতাম। এখনো পেনশন পাই মিলিংটারি থেকে। নিচে দোকানদারিও করি। কিন্তু কথা বলবার লোক পাই না, তাই ওপরে আসি। আরো উঠবে নাকি?'

অসীম অবাক হল। 'সে কি! শেল্টারে যাব না আমরা?' বুড়ো থমকে দাঁড়াল, 'ও বাবা! আমি যাচ্ছিনে, আমার পায়ে গুপো আছে। শেল্টারে দেখবার আছেই বা কি? পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা। তার ধারে ধারে পাথর কেটে তাক করা। লোহার কড়ি-বর্গা দিয়ে ছাদে ঠেকা দেওয়া। এই যে খুদে নালাটা দেখছ, ওটাও ঐখান থেকে উঠেছে। ঝোপেঝাড়ে গুহার মুখ এমনি আড়াল করা যে উড়ো জাহাজ থেকেও কিচ্ছু মালুম দেয় না।

সবার কি ভয়! ঐ নেতাজি আসছে! লক্ষ লক্ষ জাপানী আর বন্দুক বোমা নিয়ে। ওপরে উড়োজাহাজ, ডাঙায় সেপাই আর স্নাইপার। ওরা জাদু জানত তা জান? বনের মধ্যে একবার ঢুকলে বেমালুম নিখোঁজ হয়ে যেত। এখানকার গ্রামবাসীরা সবাই ওদের দলে ছিল। নানা ভাবে সংকেত দিত।'

অসীম বলল, 'কি করে? দাঁড়াও একটু টুকে নিই।'

মংলু বিগড়ে গেল, 'কিছু টুকেছ তো এই আমি চললাম। ও-সব চালাকি আমার জানা আছে। আমি কিছু সায়েবদের মিলিংটারি গোপন কথা বলিনি, বাবু।' অসীম বলল, 'অত ভয় কিসের? ও-সব ১৯৪৭ সালে চুকেবুকে গেছে। এখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের নিজেদের মিলিটারি, নেতাজির নামে পথঘাট হয়েছে, ওঁর মূর্তি আছে

নানা জায়গায়—এখন সায়েবদের সে মিলিংটারি আর নেই।'

মংলু বলল, 'শুনেছি। হতেও পারে তাই। সায়েবরা তো আর আসে না এদিকে। জিনিসপত্রের দামও বড্ড বেশি। মোট কথা আমি আর ওপরে যাচ্ছি না। তুমিও যেও না। কেউ যায় না। জায়গাটা খারাপ!' এই বলে দে-দৌড়!

খারাপ! এমন ভালো জায়গায় কেউ যায় না! এখান থেকে বাইনকুলার লাগালে একশো কিলোমিটার দেখা যাবে। এইখান থেকে বন শুরু। এটা বড়মামার সংরক্ষিত বন নয়। সেটা অনেক নিচে। আসবার সময় জীপে তার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর। নানা জন্তু দেখা যায়। দেখেনি ওরা কিছু অবিশ্যি।

তবে কি যাবে না একা একা? একা মোটেই নয়। টোবি ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। অগত্যা অসীমও চলল। গাছে ছাওয়া পথ, নিচের মাটি স্যাঁৎসেঁতে। গাছের গায়ে বুড়োদের দাড়ির মতো লাইকেন। এক-হাত চওড়া আধখানা থালার মতো ব্যাঙের ছাতা। আড়ালে খুদে ঝরণা লাফিয়ে নামছে, সব সময় কানে আসছে একটা ঝরঝর শব্দ। দেখা যাচ্ছে না।

পায়ে চলা পথে আগাছা হয়েছে। কেউ যায় নি এ পথে হয়তো ৪০ বছরের বেশি। খোলাখুলি না বললেও, মনে হয় এদের সব অশরীরীদের ভয়, স্রেফ্ ভূতের ভয়। তা এখানে কেন? এখানে তো আর ঝাঁকে ঝাঁকে নির্দোষ লোকদের কেউ মারেনি যে ছায়া হয়ে ফিরে আসবে! কিন্তু টোবিও একটু রোদ দেখে শুয়ে পড়ল।

শ্যামরতনদা এ রকম কথা শুনলে চটে যান; বলেন, 'তাই যদি বল, কোন জায়গাটাতে ভূত নেই শুনি? ভূত অর্থাৎ মরা মানুষের আত্মা। তাদের শরীরগুলো তো পঞ্চভূতে মিশে যায়, তা সে পোড়াও আর পোঁত আর যাই কর। জান নিশ্চয়, বস্তুর এক কণাও নষ্ট হয় না। আগেও যতখানি ছিল পরেও ততখানিই থাকে। বরং বাড়ে বলতে পার, কারণ মহাকাশ থেকে সারাক্ষণ ঝুরঝুর করে মিহি বস্তুর গুঁড়ো অদৃশ্যভাবে পড়ছে তো পড়ছেই। শরীরের ধ্বংসাবশেষ নষ্ট হয় না আর শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখত যে শক্তি···তাকে আত্মাই বল কি যাই বল—সে ফুরিয়ে যায়!! এ কি একটা কথা হল? থাকবেই তো। চারদিকে গিজগিজ করে থাকবে। হয়তো মিলে গিয়ে একটাই বিরাট আত্মা হয়ে থাকবে। তাই বলে তাকে ভয় পাবি? তুই তাকে না ঘাঁটালে সে কিছু বলেও না, করেও না। তোর সহযোগিতা ছাড়া কিছু হয় না। খনিজ সম্পদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি, এর বেশি জানি না।'

অসীমেরও তাই মনে হয়। এবার সে শেল্টারের ছায়ায় ঢাকা পথ ধরল। থাক পড়ে টোবি। ভূতের ভয় না আরো কিছু! স্রেফ কুঁড়েমি। সাবধানে উঠতে হচ্ছিল। পথের ওপর গোল গোল নুড়ি ছড়ানো। পা হড়কাবার ভয়। হয়তো কোনো কালে ছোট ঝরণাটা এই খাতে বইত, তারি নুড়ি। নয়তো মিলিটারি সায়েবরা ইচ্ছা করে ছড়িয়েছিল। যাতে কেউ এলে জানান দেয়। শত্রুরা যদি সত্যিই পাহাড় ভেদ করে বর্মা থেকে এসে হাজির হয়, এই শেল্টারটি হবে সায়েবদের শেষ আশ্রয়। কে জানে এর মুখটা বন্ধ করার কোনো উপায় থাকাও অসম্ভব নয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে কখন পথের শেষে পৌঁছে গেছে অসীম, নিজেই টের পায়নি। সামনে একটা স্বাভাবিক পাথরের দেয়াল। সেইখানেই পথ শেষ। তা হলে শেল্টারটা কোথায় গেল? উচিত ছিল পাথরের দেয়ালের আড়ালে, একটু উঁচুতে ঢুকবার রাস্তা করা। পাথরের খাঁজে দূরে দেখবার জন্য লুক্-আউট্ রাখা। এই কথা ভাবতে ভাবতে ক্যাম্বিসের জুতোপরা পা পাথরের খাঁচে খাঁচে রেখে অসীম উঠে পড়ল। বেঁচে থাক অযোধ্যা পাহাড়ের ট্রেনিং।

ঐ উঁচু পাহাড়টা একটা স্বাভাবিক দেয়ালের মতো, ঠিক যা অসীম মনে করেছিল। ওতে ছোট ছোট ফাঁক আছে, অনেক দূরে চোখ যায়। বন্দুকের নলও যায়। ওপরে লতাগাছ একটা ছাদ তৈরি করে রেখেছে। জংগুলে ছাদ। প্রায় চল্লিশ বছরে যতটা হয়। পাথরের আড়ালে শেল্টারের মুখ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ সত্যিই তাই। তবে তার ওপর যে কারিগরি করা রয়েছে, ভেতরে ঢুকতেই সেটা বোঝা গেল। শক্ত পাথর কংক্রিটের থাম্বা দিয়ে ছাদ ঠেকানো। মেঝেটা পাথরের চ্যাপ্টা চাঁই দিয়ে বাঁধানো, দেয়ালের কাছে জল বেরোবার নালি। ভেতর থেকে বাইরের দিকে ঢালু। বোমা ঠেকাবার ব্যবস্থা, তাই বলা বাহুল্য জানলা নেই। ঢুকবার দরজাতেও লোহার পাতের গেট বসানো। এখন অবিশ্যি খোলা। সব খালি ভোঁ—ভাঁ করছে।

ভেতর দিকে দরজার মাথায় পাথরের মাচার মতো। ব্যাল্‌কনিও বলা যায়। তাতে দুটি জানলা কাটা। তার লোহার পাল্লা খোলা। আলো আসছে। অসীম পাথরের গায়ে কাটা সিঁড়ি দিয়ে ব্যাল্‌কনিতে উঠে, জানলার কাছে গেল। পাথরে কাটা বসবার জায়গা। পাথরের তাক, পাথরের টেবিলের মতো।

জানলা বেশি উঁচু না। খুব চওড়া। দাঁড়ালে অসীমের মুণ্ডুটা তার ওপরে থাকে, কিচ্ছু দেখতে পায় না। পাথরের সীটে বসলে, গুহার সামনের পাথরের দেয়ালের ওপর দিয়ে দূর দিগন্ত অবধি চোখে পড়ে। বাইরে মাথার ওপরের পাথর একটু ঝুঁকে পড়েছে, তাই জানলাটা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।

এমন চমৎকার কারিগরি দেখে অসীম মুগ্ধ। সাধে কি আর ইংরেজরা অর্ধেক পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করেছে। কি রকম কার্যকরী মাথা ওদের।

হঠাৎ নাকে একটা চেনা সুগন্ধ এল। অসীম চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল। অন্য জানলার সীটে খাকি শার্ট প্যান্ট পরা কাঁচা-পাকা চুলওয়ালা একটা গোরা! বছর ৬৫ বয়স হবে, পাকানো দড়ির মতো মজবুত শরীর। পাটকিলে চোখ, ঠোঁটে মৃদু হাসি। এখানে লোকের আনাগোনা আছে তাহলে। বন-বিভাগের এলাকা ছাড়াও অন্য পথ আছে নিশ্চয়। বেশ লাগল মানুষটিকে। বললেন, 'সমস্ত সমতলটা একটা মস্ত খাতার খোলা পাতার মতো। ঐখানে গাঁয়ের লোকরা সুভাষের জাপানী উড়োজাহাজের ঝাঁককে পথের নিশানা দিত।'

'কেমন করে দিত?'

'সে এক মজা। চারদিকে মিলিটারি গিজগিজ করছে। তারি মধ্যিখানে কাপড় কেচে ধোপারা একটা তীরের আকারে কাচা কাপড় শুকোতে দিত। যেদিকে ব্রিটিশ সৈন্য আছে, সেদিকে তীরের ফলা। তবে এই শেল্টারের কথা কেউ জানত না, এ বড় গুহ্য ব্যাপার ছিল। ছাদ অবধি বোমা বারুদ. গোলাগুলি জমা করা থাকত, এ আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

অসীম অবাক হল। তবে হতেও পারে। লোকটির হয়তো তখন ২৫ বছর বয়স ছিল। পাইপে দু-চারটে টান দিয়ে, ভক্‌ভক্‌ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অবিশ্যি এ-ভাবে পারেনি সুভাষ। অন্যভাবে জিতেছিল। ব্রিটিশরাজ পাততাড়ি গুটিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। আমাকেও গা-ঢাকা দিতে হয়েছে, সেই ইস্তক।'

অসীম বলল, 'কেন?' লোকটি হাসলেন, 'ওদের নুন খেয়েছি, বিশ্বাসঘাতকতা করতে তো আর পারা যায় না। খবর সরবরাহ করতাম। সবাই জানত খ্যাপা বিশুবাবু ওষুধ বিক্রি করে। লোকের মন ভাঙাবার জন্য মেলা টাকা দিয়েছিলেন স্টিল্‌ ওয়েল। তাঁর নাম শুনেছ বোধহয়? বীরত্বের আদর্শ ছিলেন। এ-কথা একশোবার বলব। অকালে মরেও গেলেন। বীররা বাঁচে না বেশি দিন। আমারও মাজা ভেঙে গেল। লড়াই শেষ হলে দেখি

লক্ষ লক্ষ টাকা আমার হাতে রয়েছে।'

অসীম তো হাঁ! টাকা? কোথায়?'

ঐ তো তোমার মাথার ওপর, পাথরের ঐ কুলঙ্গিটার একেবারে ভিতরে। কেউ ওর খোঁজ পায়নি।'

'আপনি নিয়ে নিলেন না কেন? ওর তো দরকার ছিল না।'

মানুষটি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'যুদ্ধে যে জয়ী হয়, এসব তার প্রাপ্য। দেশের প্রাপ্য। আমাকে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলতে পার, কিন্তু একটু আদর্শবাদী আছি। খোলাখুলি মুখ দেখাবার উপায় নেই আমার। তুমিই এই কাজটি করে দাও। আছ কোথায়?'

অসীম বড়মামার কথা বলতেই তিনি খুশি হয়ে গেলেন, 'তবে তো ভালো কথা। খ্যাপা বিশুদা বললেই সে আমাকে চিনতে পারবে। বলবে তো?'

অসীম বলল, 'নিশ্চয়।' ভারি ভালো ভদ্রলোক। কোথায় থাকেন, কি খান কিছু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হল। কথা দেওয়াতে ভারি নিশ্চিন্ত হলেন। সঙ্গে নিয়ে সমস্ত শেল্টারটা ঘুরিয়ে দেখালেন। কোথায় রসদ থাকত, বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়, ওষুধ, অস্ত্র, সব দেখালেন। শূন্য খাঁ খাঁ করছে। যুদ্ধ থামতেই যত রাজ্যের লুটেরা এসে চেঁচেপুঁছে সব নিয়ে গেছে। কুলুঙ্গির অন্ধকার মুখটা পাথর দিয়ে বন্ধ থাকাতে কারো চোখে পড়েনি। টাকাগুলো বেঁচে গেছে।

ততক্ষণে বেলা বেড়েছে, অসীমকে যেতে হয়। ওকে গুহার মুখ অবধি এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। এবার অসীম বলেই ফেলল, 'চলুন আমার সঙ্গে নিচে। মাসিমার রান্না খেলে খুশি হবেন।' মাথা নাড়লেন। 'সেই ইস্তক আগলাচ্ছি ওগুলো। ওর একটা বিহিত না করে আমার ছুটি নেই।' খাকি রুমাল নেড়ে বাই-বাই করে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেমে এল অসীম। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই যেমনি অবাক, তেমনি খুশি। শ্যামরতনদা বেতের চেয়ারে বসে বড়মামার সঙ্গে গল্প করছেন! তাড়া খেয়ে চানের ঘরে গিয়ে গায়ে মাথায় দু-মগ গরম জল ঢেলে, খাবার টেবিলে অন্যদের সঙ্গে জমায়েৎ হল।

বড়মামার আপিসের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাই বুদ্ধি করে খাবার টেবিলে কিছু বলেনি অসীম। লোকটি এতকাল পালিয়ে বেড়িয়েছেন, এখন তাঁর অনিষ্ট করা অসীমের পক্ষে সম্ভব নয়। বড় ভালো লেগেছিল; তা হতে পারেন স্টিল্‌ওয়েলের ভক্ত। কিন্তু খাবার পর, বড়মাসি যখন কাজ সেরে নিজে খাওয়াদাওয়া করতে চলে গেলেন, অসীম মুখে একটু ভাজা-মশলা ফেলে বলল, 'খ্যাপা-বিশুদা বলে একজনের সঙ্গে দেখা হল।' বড়মামার হাত থেকে পান পড়ে গেল।

'কি যা-তা বলছিস্! কোথায় দেখা হল?' তখন অসীম সব কথা খুলে বলল। একটা পিন্ পড়লে শোনা যায়। অসীম আরো বলল, 'উনি চান ঐ টাকা এনে দেশের কোনো কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হোক। নইলে ওঁর ছুটি নেই।'

বড়মামার মুখে কিছুক্ষণ কথা নেই। 'কিন্তু—কিন্তু উনি তো যুদ্ধের পর থেকেই নিখোঁজ! 'চিনতে তাহলে?' কাষ্ঠ হাসলেন বড়মামা, 'বাঃ, বিশুদাদাকে চিনব না? বাবার নিজের কাকা, যদিও সমবয়সী। সায়েবদের সঙ্গে ভিড়লেন। দেশের লোক ছি-ছি করত, এ আমার স্পষ্ট মনে আছে, যদিও তখন নিচের ক্লাসে পড়তাম। আছেন তাহলে এখনো! কি করা যায় বলুন দিকি শ্যামরতনদা?'

শ্যামরতনদা মুচকি হাসলেন, 'করবে আবার কি? চল, দুপুরে কাজকর্ম নেই, এই সময়ে টাকাগুলো নিয়ে আসি। ঐ খ্যাপা বিশুর সঙ্গে আলাপ করলে নিশ্চয় অনেক

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী পাওয়া যাবে।'

গেলেন ওঁরা দুজন আর অসীম। বারণ সত্ত্বেও ওখানে গেছিল বলে কেউ অসীমকে বকলেন না। কিন্তু খ্যাপা বিশুর সঙ্গে দেখা হল না। কেউ ছিল না ওখানে। তবে অসীম ছোট একটা সাবল নিয়ে গেছিল। জানলার ওপরে যেখানটা ভদ্রলোক দেখিয়েছিলেন, সেখানে জোরসে দুটো খোঁচা দিতেই, ঝুরঝুর করে একরাশ নুড়ি, পাথরের কুচি, ভাঙা সিমেন্ট বেরিয়ে এল। তার পেছনের কুলুঙ্গিতে হাত গলাতেই একটা ভারি ওয়াটারপ্রুফ থলি বেরোল। সোনার মোহরে ঠাসা। ঐ সময় ঘুস নিতে হলে নাকি কাগজের টাকা কেউ ছুঁত না! শ্যামরতনদা বললেন।

আর বেরোল বাঁকা একটা বিলিতী পাইপ। পাইপটার মুখের কাছে একটা শাদা দাগ। সকালেও অসীম সেটা লক্ষ করেছিল। আস্তে আস্তে সে পাথরের সীটে বসে পড়ল। পা কাঁপছিল।

অনেকক্ষণ পরে বড়মামা বললেন, 'তাই বলি ১৯৪৩ সালে বিশুদাদার ৬৫ বছর বয়স ছিল। পাকা দড়ির মতো শরীর, খাকি শার্ট পেন্টেলুন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গুপ্তচর বলে কেউ সন্দেহও করত না। ছোটবেলায় দেখেছি।'

তারপর অসীমের দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে এখন তাঁর বয়স কত হয়? ১১২ না?'

অসীমের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামরতনদার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ওর পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, 'কি হল?' অসীম বলল, 'তবে কি উনি সত্যি নন? শুধু ছায়া? স্পষ্ট দেখলাম, থুতনিতে কাটার দাগ, আইডিন লাগানো! আর এই টাকাগুলো, ঐ পাইপ, এ-সব তো বাস্তব।'

শ্যামরতনদা হাসলেন, 'কাকে ছায়া আর কাকে বাস্তব বলবি জানিনে। বালিগঞ্জে আমাদের বাড়িতে সারি সারি কাচের জানলা। তার ভেতর দিয়ে মাঠের ওপারের সত্যিকার নতুন বাড়ি দেখা যায়, তৈরি শেষ হয়নি, খালি, রাতে ভুষো অন্ধকার। ঐ জানলার কাচেই দেখতে পাই দূরে মোড়ের মাথার আলোজ্বালা লোক-গমগম বাড়ির ছায়া। ভুষো অন্ধকারময় খালি বাড়ি আর লোকজন-ভরতি আলোজ্বালা বাড়ি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কোনটা সত্যি কোনটা ছায়া চিনতে পারি না। কাচের জানলা খুলে তবে বুঝতে পারি কোনটা কি। এবার ওঠ্, ওঠ শিবু, উনি যা যা বলেছেন সেই মতো কাজটা তো করে ফেল!' হঠাৎ অসীমের মনটা ভালো হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলা যাক, মাসি দুধপুলি করেছে।'

মোটেল

বটুকদা যখন হঠাৎ জুয়ো খেলা ছেড়ে দিয়ে, শ্বশুরের কাঠগুদামের ব্যবসায় দস্তুরমতো পয়সা দিয়ে মোটা শেয়ার কিনে, সভ্যভব্য হয়ে কাজকর্ম নিয়ে দিন কাটাতে শুরু করলেন, তখন ওঁর বুড়ি মা, বৌ আর আত্মীয়স্বজনরা যত খুশি হলেন, বন্ধুরা ততটা হননি। এ আমার ছোটমামার নিজের মুখে শোনা। আগে তিনিই ছিলেন বটুকদার যাকে বলে বুজুম ফ্রেন্ড। এখন বটুকদা তাঁকে একরকম ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাতে খুব ক্ষতিও হয়নি, কারণ আগেকার সেই কথায় কথায় বাজি-ধরা আমুদে বটুকদা আর নেই। ছোটমামার কাছে যেমন শুনলাম, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। নাকি স্বয়ং বটুকদাকে জেরা করে তিলে তিলে সংগ্রহ করা। সেই কথাই বলি।

বছর দুই আগে জাত-জুয়াড়ি বটুকদা জুয়ো খেলে খেলে দেউলে হয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন। তাই বলে কোপ্‌নি পরে ছাই মেখে সাধু সেজে পথ নেননি। ওসব বটুকদা ঘৃণা করতেন। নিউম্যাটিক স্লীপিং ব্যাগ, টর্চ, ওয়াটার বট্‌ল, খুদে হ্যাভারস্যাকে যা-নইলে-চলে-না এমনি কয়েকটা জিনিস আর যৎসামান্য পথ-খরচা নিয়ে, হাইকার সেজে নৈনিতালের কাছে কাঠগুদামে শ্বশুরের বাংলো থেকে গোপনে বেরিয়ে পড়লেন। লাখ খানেক টাকা জমিয়ে তবে এদের মুখ দেখবে এই প্রতিজ্ঞা।

সারা সকাল হাঁটলেন। দুপুরে ট্যুরিস্ট বিভাগের একটা আস্তানা থেকে একটা আঞ্চলিক ম্যাপ আর রুটি মাখন তাজা চীজ্ আর ডিম সিদ্ধ কিনে, বোতলে জল ভরে আরো ঘন্টাখানেক হাঁটবার পর, পায়ের গুলি যখন পাকিয়ে উঠল আর পেট কামড়াতে লাগল তখন দেখলেন একটা ঘন বনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। অগত্যা একটা বড় বড় পাতাওয়ালা গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে পায়ের গুলি দুটোকে কিঞ্চিৎ ম্যাসাজ করতে বাধ্য হলেন। ভারি আরাম লাগল।

পেট ব্যথাটাও কিছু নয়, স্রেফ খিদের জন্যে। তাছাড়া কালীঘাটের পেটব্যথার মাদুলীও ছিল। তাতেই পেটব্যথা কিছুটা কমল। বাকিটা চলে গেল পেটে কিছু পড়তেই। গাছতলায় পাকা ন্যাসপাতি পড়েছিল। সে যে কি মিষ্টি আর রসাল। এক দিকে একটু বাদুড়ে খুবলানো, সেটুকু পুরনো পেন-নাইফ্ দিয়ে কেটে ফেললেই হল। খাবার পর হ্যাভারস্যাক মাথায় দিয়ে একটু বিশ্রাম। পায়ে মিষ্টি রোদ লাগছিল।

বিশ্রাম মানেই ঘুম। সে ঘুম যখন ভাঙল, তখন গাছের ছায়া লম্বা হয়ে এসেছে। রোদটা আর গরম নেই। জলের বোতল থেকে রুমালে একটু জল ঢেলে চোখেমুখে লাগিয়ে, গা ঝেড়ে চাঙা হয় উঠে, বটুকদা আবার হাঁটা দিয়েছিলেন। এর আগেই কখন যে পথটা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছিল তা টের পাওয়া যায়নি। এখন নিচে তাকিয়ে বোঝা গেল। অতক্ষণ ঘুমনো ঠিক হয়নি।

এ পথে গাড়ি যায়, অন্ততঃ জীপ যায়। চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাস্তাটা পিচ্-ঢালা নয়। হয়তো হিমালয়ে যাবার কোনো বিকল্প পথটথ হবে। কিম্বা সামরিক

কিছু। তাহলে এ-পথে কোনো মোটেল বা হোটেল, বা ট্যুরিস্ট হস্টেল থাকার সম্ভাবনা নেই। মনটা একটু দমে গেল। পথে একটা লোক দেখা যাচ্ছিল না ; একটা কুঁড়েঘর পর্যন্ত নেই ; নেড়ি-কুত্তার ডাক নেই ; গরুর হাম্বা নেই ; সবজি-বাগান বা মকাই-ক্ষেত নেই! এদিকে আলো কমে আসছে, রাত কাটাবার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। ট্যুরিস্ট ক্যান্টিনে এক বুড়ো সায়েব তার কাঁটাওয়ালা বুট সাফ করছিল, সেও বলেছিল এটা পুরনো মিলিটারি পথ। যত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়া যায়, ততই ভালো। আরো ওপরে গেলে একটা 'হিন্দু পিল্‌গ্রিম-প্লেস্‌' আছে। সেখানে প্রায় বিনা খরচায় থাকা-খাওয়া মেলে। কিন্তু ম্যাপে পথটাকে চিনতে পারা গেল না।

পাহাড় চড়বার সময় এক কিলোমিটারকে চার কিলোমিটার মনে হয়। কাজেই কতখানি হাঁটা হল বোঝা গেল না। কিন্তু এটুকু বোঝা গেল যে বটুকদা আর হাঁটতে পারছেন না। পথের ধারে একটা পাথরে বসে ভাবলেন, বাকি খাবারটুকু শেষ করে, তলানি জলটুকু গলায় ঢালা যাক, তারপর যা থাকে কপালে। বেশি খিদে পেলে মনে কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসে যায়, এ কথা ভ্রমণকারী মাত্রেই জানে। বটুদারও তাই হল।

খাবারটা একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে ছিল। সেটা বের করতেই, পাশের ঝোপটা একটু নড়ে উঠল। একটা লোমশ কালো কুচকুচে হাত বেরিয়ে এসে টুপ করে বাক্সটি তুলে নিয়ে আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। ঝোপ থেকে বিশ্রী একটা কচরমচর শব্দ হতে লাগল। বটুকদা আর বসলেন না।

আগে যদি মনে আশা থাকে, তাহলে সেটা হারালে তবে নিরাশা আসে। বটুকদার সে-সব জিনিস ছিল না। কিন্তু ভয় ছিল, সায়েব বলেছিল বুনো জানোয়ার থেকে সাবধান। ক্লান্তি, খিদে, তেষ্টা, ঘুম—এসবও ছিল। চারদিকের একটানা ঘন বন কোথাও একটু পাতলা হয়ে এসেছে—সেইরকম একটা জায়গায় পৌঁছে, বাঁক ঘুরেই বটুকদা থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই একটা বাজপড়া মরা ঝাউ গাছ। আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, লাল টিনের ছাদের একটা দোতলা মোটেল! সারি সারি আলোকিত জানলা দেখে বটুকদা বুকে বল পেলেন। শুধু আলো নয়, লোকজনের হেঁড়ে গলায় হাঁকডাকও কানে এল। এসব জায়গায় হাইকাররাই ওঠে। তাদের গলার স্বর খুব মিষ্টি হয় না।

সদর দরজার ওপর একটা ফুলন্ত লতাগাছ। তার নিচে একটা চারকোণা লন্ঠন প্যাটার্নের তেলের বাতি ঝুলছিল। ওপরে হয়তো একটা নামও লেখা ছিল, তবে পড়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া বটুকদার মাথা বোঁ বোঁ করছিল, পড়বার ক্ষমতাই ছিল না। খোলা জানালা দিয়ে কানে এল মানুষের গলা, নাকে এল রান্নার সুগন্ধ। দরজাটা ভেজানো।

কোনোমতে ধুঁকতে ধুঁকতে, হোঁচট খেতে খেতে, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই বটুকদা মুচ্ছো যান আর কি! এমন সময় কানে এল, 'দশটা রুপোর টাকা বাজি, এক মিনিটের মধ্যে লোকটা ভির্মি যাবে! কে বাজি ধরবে?' 'ডান্‌ (DONE)!' বলে বটুকদা মুণ্ডু ঝেড়ে কান-বোঁ বোঁ সারিয়ে, হাত পাতলেন। সব কথাই যে ইংরিজিতে হচ্ছে খেয়াল করলেন না।

'ও মাই গড্‌!' বলে লোকটা পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে তাঁর হাতে দিয়ে দিল। অন্যরাও টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে, চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। বটুকদা পেছনের কাঠের বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। পায়ে জোর পাচ্ছিলেন না।

লোকগুলো সব বিদেশী হিপি। কারো মুখে বড় চুরুট, কারো বাঁকা পাইপ। লম্বা চুল ঘন জুলপি তার চেয়েও বেশি গোঁপ, কারো কারো দাড়ি। রংচং-এ ওয়েস্টকোট, শার্টের হাত গুটোনো। চিমনিতে কাঠের আগুন জ্বলছিল, কেমন একটা ধুনো ধুনো গন্ধ বেরুচ্ছিল। টেবিলে চাদর নেই, কাঠের ওপর এলুমিনিয়ম মগে মোদো গন্ধওয়ালা

কিছু আর জোড়া জোড়া তাস, বড় বড় সাদা রঙের ডাইস্।

মনটা আনচান্ করে উঠল। মা-কালী তাহলে ঠিক জায়গাতেই এনে ফেলেছেন! জুয়াড়ির জুয়াড়ি চিনতে দেরি হয় না! হিপিরা ওঁর পিঠ চাপড়ে, হাঁকডাক করতে লাগল, কোই হ্যায়! খানা লাও!' দেখতে দেখতে খানাও এসে গেল। চাকলা চাকলা মাংস রোস্ট, আলু, গোল গোল পাঁউরুটি, তাল তাল মাখন। পুডিং। পানীয়। হিপিরা খাওদায় ভালো। বটুকদা আগেও শুনেছিলেন ওদের অবস্থা ভালো, ব্যবহার ভদ্র। অন্ততঃ বন্ধুলোকের সঙ্গে। এখন তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলেন। খাওয়াদাওয়ার পর বটুকদা সরু মনিব্যাগ বের করে দাম দিতে গেলেন। দলের পান্ডা ওঁর হাত সরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে এক মুঠো মোহর বের করে চ্যাপ্টামুখ মালিকের হাতে গুঁজে দিল। এ কথা কেউ বিশ্বাস না করলে আর কি করা যায়! চকচকে সোনার মোহর, বটুকদা স্বচক্ষে দেখলেন। সোনা-বাঁধানো দাঁতওয়ালা আধা-চীনে মালিক, পকেট থেকে চামড়ার বটুয়া বের করে ভরল। বটুকদার চোখ থেকে রাজ্যের ঘুম বিদায় নিল। মনের মতো সঙ্গী পেলে অমনি হয়। তিনি ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, সরাইয়ের মালিক ঐ আধা-চীনে হতে পারে না। এখানে রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দেয়ালে চমৎকার সব বিলিতী ছবির রঙীন প্রিন্ট—পাখি মারার, মাছ ধরার, ঘোড়ায় চড়ার। মেলা খরচ করে এগুলো বিলেত থেকে আনাতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

শিরার রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটতে লাগল। বটুকদা হাঁক পাড়লেন, 'আপেলের ছবির নিচেকার শাদা টিক্‌টিকি আরো পিছু হটবে, এই আমি বলে দিলাম।' লাল-চুল বাঁকা-পাইপ গর্জে উঠল, 'কালোর কাছে শাদা হটবে! নেভার! একশো রুপোর টাকা বাজি, সব কালের মতো এ কালোও আগে হটবে!'

ঠিক যেন ওর কথা শুনতে পেয়ে শাদা টিকটিকি পিছু ফিরে সুড়সুড় করে ছবির পেছনে লুকোল। বটুকদা হাসি চাপলেন। ঘরে কোনো শব্দ নেই! তারপরেই টেবিল চাপড়ে লাল-চুল বলল, 'ভাগ্যদেবীকে হাত করেছ দেখছি!' বটুকদার হ্যাভারস্যাকে একশো টাকা উঠল।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল পাকা-চুল আধ-বুড়ো। এবার সে বলল, 'বড় জানলার কাচে দু-ফোঁটা জল। একশো টাকা বাজি, ডাইনেরটা আগে গড়াবে।' বটুকদা বলে বসলেন, 'বাঁ দিকেরটা আগে গড়াবে।' সঙ্গে সঙ্গে হলও তাই! আরো একশো টাকা জমল। এবার সায়েবগুলো একটু বেপরোয়া হয়ে উঠল। যা-তা বাজি ধরতে লাগল আর প্রত্যেকবার বটুকদা জিতলেন।

ঘরের আবহাওয়া আর ওদের মেজাজ ক্রমে গরম হয়ে উঠতে লাগল। সব জাত-জুয়াড়ি। পয়সাকড়িও আছে। টাকা খোয়াবার চেয়ে হেরে যাবার লজ্জা বেশি। সঙ্গে সঙ্গে টাকা শোধ করে দেয়। শেষকালে লাল-চুল বলল, 'শুধু চান্সে এমন হয় না! কিছু জাদুকর্ম করেছ নিশ্চয়!' বটুকদা তখনো অবস্থাটা বোঝেননি। হেসে বলেছিলেন, 'জাদু-টাদু নয় বন্ধু, মা-কালী আমাকে জিতিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কে পারবে!'

শুনে ওদের চুল-দাড়ি খাড়া। 'হোয়াট্! ওকে কেউ সাহায্য করছে! তাই বলি শুধু চান্সে একটা নেটিভ্ কখনো এত জিততে পারে! ওকে তল্লাসী করা হোক। ওর কাছে কোনো শয়তানের কল আছে কি না দেখা যাক! হরিড্ আগলি ফেলো! যা-তা খায়!'

ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সব। বোতাম ছিঁড়ে, পকেট ফেড়ে চুলচেরা তল্লাসি! কিচ্ছু পেল না। রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে শার্ট টেনে বের করেই পৈতে চোখে পড়ল। তাতে একটা চাবি আর মা-কালীর পেটব্যথার মাদুলী বাঁধা। 'ও-ও-ওঃ! যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই! ঐ দেখ! ডেভিলের কারচুপি! এরি সাহায্যে এতক্ষণ জিতেছে!

ছুঁয়ো না! পুড়িয়ে ফেল! মারো ব্যাটাকে।'

অত কষ্টে জোগাড় করা মাদুলীটা আগুনে দেয় আর কি! বটুকদার শরীরে অমানুষিক বল এল। মাদুলী গেলে পেট-ব্যথা কে সারাবে শুনি! হেঁচকা টানে পৈতে ছাড়িয়ে, চাবি আর মাদুলী হাতে চেপে ধরে, সেই শীতের রাতে জিনিসপত্র ফেলে টেনে দৌড়!

পেছনে একটা হৈ-হৈ-রৈ-রৈ, তারপর সব চুপ। নিজের বুকের হাপরের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা গেল না। হাঁপাতে হাঁপাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাত বারোটায় যখন পাহাড়-চুড়োর মঠে গিয়ে পেঁছলেন, তখন সেখানে জনমানুষের সাড়া নেই। মন্দিরের দরজা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। পাথরের মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলে। তারি সিঁড়িতে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। আবছা মনে হল মন্দির থেকে দু-চার জন কম্বলমুড়ি দেওয়া বুড়ো মানুষ 'ই ক্যারে!' বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হল পরদিন সকালে, সূর্য ওঠার অনেক পর। দেখলেন কে তাঁর জুতো ছাড়িয়ে, কোট ছাড়িয়ে, লেপ-কম্বল চাপা দিয়ে দিয়েছে। সব কষ্ট দূর হয়েছে।

বটুকদাকে উঠে বসতে দেখে একজন সাধু এসে তাঁকে বড় এক গেলাস মিষ্টি দুধ খাইয়ে, হাসিমুখে বললেন, 'ভালো বোধ করছ তো, বাবা?' ধড়মড় করে বটুকদা পৈতে হাতড়ালেন, নাঃ, চাবি আর মাদুলী ঠিকই আছে।

খুব আদর যত্ন করলেন সাধুরা। এখানে তীর্থযাত্রী কম আসে। লোকে ভয় পায়। এখানকার শিব নাকি যার ওপর চটেন তাকে নাকাল করেন ; যার ওপর খুশি হন তাকে অজস্র দেন। সবই হল, কিন্তু কাল রাতের কথা ওঁরা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, 'বেশি ক্লান্ত হলে মানুষ ভুল দেখে। খাওয়াদাওয়ার পর চল জায়গাটা দেখেই আসা যাক। তোমার ভুলও ঘুচবে আর জিনিসপত্রও উদ্ধার হবে।'

সে বিষয়ে বটুকদার যথেষ্ট ভয় ছিল। গেলেন সবাই। বাজপড়া ঝাউগাছ চিনতে খুব অসুবিধা হল না। তার পেছনে শ্যাওলা ধরা পুরনো বাড়ির ভাঙা ভিতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। খানিকটা আগাছায় ভরা সমান জায়গা। তার ওপর দিয়ে একটা ফুলন্ত লতা গাছ। বাড়িটাড়ির চিহ্ন নেই।

এতক্ষণ পরে বটুকদার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আগাছার মধ্যিখানে বটুকদার নিউম্যাটিক বেডিং-ব্যাগ আর হ্যাভারস্যাক পাশাপাশি রাখা আছে।

বড় সাধু হেসে বললেন, 'যা বলেছিলাম, এই অবধি এসে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলে। মনও ভালো ছিল না। বাকি সব স্বপ্ন দেখেছ। এবার চল, ক'দিন আমাদের কাছে কাটিয়ে যাও। তারপর কি করবে দেখা যাবে।'

জিনিসগুলো বড্ড ভারি মনে হচ্ছিল, শরীরটা তখনো ধাতস্থ হয়নি। হ্যাভার-স্যাকটা সাধুদের একজন তুলে নিলেন।

মঠে পেঁছে হ্যাভারস্যাক খুলে বটুকদার চক্ষুস্থির! তার মধ্যে রাশি রাশি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ-দেওয়া বড় বড় রুপোর টাকা! বড় সাধু বললেন, 'বলিনি আমাদের দেবতা যার ওপর খুশি হন, তাকে কোল ভরে দেন। কাল রাতে ঘুমের ঘোরে ঘরের কথা অনেক বলেছিলে বাবা।' 'কিন্তু—কিন্তু এ ত পুরনো টাকা!' 'তাতে কি! দেবতাদের ট্যাঁকশালের তারিখ থাকে না।'

পনেরো দিন ছিলেন ওখানে বটুকদা। তারপর কাঠগুদামে ফিরে গেলেন। তার আগে মঠের দরিদ্র ভাণ্ডারে একশো রুপোর টাকা দিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো পাহাড়-তলীর জহুরী পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। তিনিও মঠের ভক্ত। বাকি টাকা-গুলোও তিনি নিলেন। বটুকদাও নিশ্চিন্ত হয়ে, কাঠগুদামে শ্বশুরের ব্যবসায় শেয়ার

কিনে, কাজকর্মে মন দিলেন। জুয়োখেলাও চিরকালের মতো ছেড়ে দিলেন। প্রতি বছর পুজোর সময় ওঁরা পায়ে হেঁটে মঠে যান। আমার ছোটমামাও নাকি এবার সংগে যাবে।

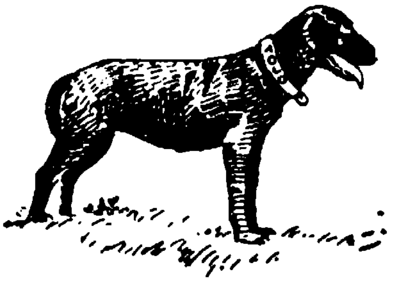

তোজো

নবুর বড় ভয়। বেজায় গরীব এখানকার লোকরা ; খেতে পায় না, পরতে পায় না, মাটি দিয়ে, উলু-ঘাস দিয়ে উল্টোনো ঝুড়ির মতো কি-সব বানায়, অনেকে তাকেই বলে ঘর। যাদের কুঁড়ে-ঘর আছে, তারা তো বড়লোক, গ্রামের মাতব্বর। হবে না গরীব? শুকনো খরা মাটি, কত কষ্টে ফসল ফলাতে হয়। তার ওপর একেক বছর বৃষ্টি হয় না ; সব রোদে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে এদিকে খরা, কিন্তু পুন্নি নদীর উৎস যেখানে পাহাড়ের ওপরে, সেখানে মেঘ জমে বৃষ্টি পড়ে ; নদীতে ঢল নামে। মানুষ গরু ভেসে যায়। এখানকার লোকে ভালো হবে কি করে? দিন-রাত রামুদা এই কথা বলে। যারা রাতে দরজা বন্ধ করে শোয়, নবুর ফুটবল-মাঠের বন্ধুরা তাদের ওপর হাড়ে চটা। বলে, "টাকার গরম দেখাচ্ছ বুঝি? আমাদের কিছু নেই, তাই দরজা খুলে শুতেও ভয় নেই। তোমরা কবাট দাও, হুড়কো আঁটো, চেষ্টা করেও কেউ ঢুকতে পারে না।—তাই রাতে পথের মধ্যে একা পেলেই ধরে। খেলার মাঠ থেকে কক্ষনো একলা ফিরো না। আমাদের চাচা-মামারা জানতে পারলে—" এই বলে তারা মুখ বন্ধ করে। নবু ভয়েই আধ-মরা। সব দিন সংগী কোথায় পাবে? কলকাতার বাড়িতে যারা কাজ করত, তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে। বাবার অসুখ করেছে, কাজ করতে পারে না, খালি খালি শুয়ে-বসে থাকে। মা রান্না করে। দাদুর বুড়ো চাকর বিশুকাকা এখানকার বাড়ি আগলায়। সে গ্রামের হাটে গিয়ে কেনাকাটা করে দেয় আর বুড়ো হাড় নিয়ে টিলার ওপর ওঠা-নামা করতে হয় বলে গজর-গজর করে। বনের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে থাকে শিবু, সে কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল তুলে দেয় আর রান্নার কাঠ জোগায়। ওরা কাঠুরে। ওর ছেলে নটে মাঝে মাঝে নবুর সংগে খেলার মাঠ থেকে ফেরে। ওর নবুর সমান বয়স, কিন্তু কি সাহস!

শিবু বলে, "আমাদের আবার কিসের ভয়, দাদা? ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। খেতে পায় না লোকে, দুটো পয়সার আশায় চুরি-ডাকাতি করে। আমাদের কাঁচকলাটাও নেই, তাই ভয়টাও নেই।"

যারা টিলার ওপর থাকে, তাদের খেলার মাঠ থেকে ফিরতে একটু দেরি হবেই। কলকাতায় সারারাত আলো জ্বলত, লোকে কথা বলত, গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জানান দিত, সেখানে ভয়টা কিসের? বুনো জন্তুটন্তু নেই। এখানে হুতোম প্যাঁচা ডাকে, বড় বড় বাদুড় ওড়ে, চামচিকে কিচ-কিচ্ করে, ওরা ছোট ছেলেদের চোখ খুবলে নেয়। তাছাড়া চোর-বাটপাড় ডাকাত আছেই, বনের মধ্যে কাপালিক আছে—তারা ছোট

ছেলে বলি দেয়—নবুর ভয়ের আর শেষ নেই। ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয়। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ঘোর অন্ধকার। পথে আলো নেই; পথ-ই নেই বলতে গেলে। গ্রামে আলো জ্বলে না। সেখানকার লোক বড় গরীব, তেল কেনার পয়সা নেই। আলো থাকতে থাকতে, মাঠ ঘাট থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে, যে যার শুয়ে পড়ে। মেয়েরা সব দিন রাঁধাবাড়াও করে না, অত চাল কোথায় পাবে? বুনো শাক-কন্দ সেদ্ধ দিয়ে আমড়া পাতা, তেঁতুল পাতা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে খায়। বলে, রান্না ভাত খায় স্বর্গের লোকরা। তবে বুনো খরগোস মারে, পাখি মারে, মাছ ধরে। কোনো রকমে বেঁচে থাকে। আনন্দও করে।

তাই বলে কি ওদেরও ভয় নেই? হায়না হুন্ডারের ভয় আছে; বড় বড় খ্যাঁক-শেয়াল আসে। রাতে খ্যাক্-খ্যাক্ খ্যাক্-খ্যাক্ করে দল বেঁধে এসে হাঁস, মুরগি, শুওর-ছানা নিয়ে পালায়। ছোট ছেলেমেয়ে পেলে, তাও নাকি বাদ দেয় না। ওরা কুঁড়ে বাঁধে ভেতর দিকে মুখ করে, বাইরে দিকে যাওয়া আসার জন্য ছোট ছোট ঘুলঘুলি রাখে। গোল করে পর পর ঘর বানায়, মধ্যিখানের খোলা জায়গায় সারারাত ধুনি জ্বালে; পালা করে পাহারা দেয়: সবাই মিলে শুকনো কাঠ জোগায়। তবে আজকাল বুনো জানোয়ারের উপদ্রব কমে গেছে, কিন্তু তার চেয়েও শতগুণে ভয়ঙ্কর মানুষরা আছে। নবু সব্বাইকে ভয় করে।

খেলার মাঠের ছেলেরা নবুকে কাপ্তেন করে দিল। ওর বাবা ওদের একটা পুরনো কিন্তু ভালো ফুটবল দিয়েছিলেন, তাই। বাবা নমকরা প্লেয়ার ছিলেন। ভয়ঙ্কর সাহস ছিল। তারপর পেটে বল লেগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এখন দু-বছর কোনো কাজ করতে পারেন না। কলকাতার বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তাই দিয়ে ওদের চলে। টিলার ওপরে, সবচেয়ে উঁচুতে এই বাড়িটা, দাদু বানিয়েছিলেন। এখানকার শুক্‌নো বিশুদ্ধ হাওয়ায় নাকি ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া লাগে, জ্যাঠামশায় বলেছেন।

ঐ কাপ্তেন হওয়াই ওর কাল হয়েছে। ওর বন্ধু শম্ভু থাকে টিলা যেখানে উঠতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেইখানে। সেখানে অনেকগুলো বাড়ি। স্কুলের হেডমাস্টারের, ডাক্তারবাবুর, শম্ভুদের। সেখানে কোনো ভয় নেই। কিন্তু তার পরেই এঁকেবেঁকে পথ উঠে গেছে। তবে দু-ধারে ঘন বন। টিলার পেছনে হাতিয়া পাহাড়। টিলার ওপর দিয়ে হাতিয়া পাহাড়ে যাবার রাস্তা আছে। সে বড় ভয়ানক জায়গা।

শম্ভুদের চাকর রামুদা বলে, "খরার সময় বড় খারাপ নবুদাদা, চাঁদার পয়সাগুলো পকেটে নিয়ে চললে ঝিন্-ঝিন্ করে বাজে, সবাই টের পায়। খেতে না পেলে মানুষরাও নেকড়ে-বাঘের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া খরার সময় হাতিয়ার বন খালি করে হরিণরা দলে দলে নিচে নেমে আসে, গ্রামের লোকদের শস্যের ক্ষেত নষ্ট করতে। সবাই আসে টিলার পথ দিয়ে। তাই লোভে লোভে হায়না হুন্ডারও নেমে আসে। খুব সাবধানে পথ চল, দাদা, দুয়ের মধ্যে মানুষরাই বেশি হিংস্র।"

ভয়ে নবুর হাত-পা ঠান্ডা হয়। কিন্তু কি আর করা। শম্ভু বলে, "তুমি আমাদের বাড়িতে বসে পড়াশুনো করতে তো পার। রাতে রামুদা কাজ সেরে তোমাকে পেঁছে দেবে।" রামুদা ফোঁস্ করে ওঠে, "রাতে ঐ গলায়-দড়েদের বনের পাশ দিয়ে একা ফিরতে আমি পারব না। জীবনবাবু তো অর্ধেক বাড়ি ভাড়া দিতে চায়, তোমার মা-বাবাকে নেমে আসতে বল না।"

নবু আস্তে আস্তে বলল, "টিলার ওপরে পরিষ্কার শুকনো হাওয়ায় থাকলে বাবার শরীর ভালো হবে। ঠিক আছে, এইটুকু তো পথ, আমি একলাই চলে যাব।"

রামুদা বলল, "তা যেতে পার। তবে মাঝপথের ঐ বড় অশ্বত্থ গাছে কিছু দেখলে

ফিরে এস।" নবু দু হাতে দু কান চেপে ধরে ছুটে রওনা দিচ্ছিল, শম্ভু ওর হাত ধরে টেনে বলল, "কোনো ভয় নেই রে। একবার 'তোজো' বলে ডাক দিস্, কোনো ভূত কিম্বা মানুষ তোর কিচ্ছু করতে পারবে না।"

নবু বেজায় অবাক্ হয়ে বলল, "তোজো ? তোজো কে ?"

শম্ভু বলল, "বড়দের বলা বারণ, শেষটা যদি ধরিয়ে দেয়। তোজো একটা কুকুর। বাছুরের মতো বড়, ভীষণ হিংস্র, একেবারে বুনো হয়ে গেছে, বাঘের মতো ভয়ংকর।"

নবুর হতভম্ব মুখ দেখে শম্ভু ব্যস্ত হয়ে উঠল, "ভয় কিসের ? ও ছোটদের কিচ্ছু করে না, ভয়ংকর ভালোবাসে। দাদা বলে যে, বনের মধ্যে নিশ্চয় ওর মালিক লুকিয়ে আছে। হয়তো পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে দেখেনি। হাত-পা ভেঙে পঙ্গু হয়েও থাকতে পারে। তুই আবার যেন কারো কাছে বলিস্‌নে। তাহলে ওকে পাগলা কুকুর বলে গুলি করে মেরে ফেলে দেবে আর মালিককে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে। কে জানে হয়তো সে মরেই গেছে।"

নবু বলল, "তোজো যদি তেড়ে আসে ?"

শম্ভু হাসতে লাগল, "না, না, তোর যত ভয় ! ডাকলেই বন থেকে বেরিয়ে এসে, হাতের তেলোয় মুখ গুঁজে, মুখের দিকে চেয়ে, ল্যাজ নাড়ে। কিন্তু বড়দের দেখলে গলার মধ্যে মেঘের মতো গুড়-গুড় করে। বড় কেউ বোধ হয় ওর মালিকের খুব ক্ষতি করেছিল। তাই বড়দের দেখতে পারে না। তোর কোনো ভয় নেই।"

"ওর নাম জানলে কি করে ?"

"গলায় একটা কলার আছে, তাতে লেখা আছে। 'তোজো' বলে ডাকলেই আসে। টিলার সব ছেলেমেয়েরা ওকে চেনে।"

নবুর বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। ও কুকুর ভালোবাসে। বাবার বল লাগবার আগে কলকাতায় ওদের মস্ত কুকুর ছিল। ল্যাব্রাডর। তার নাম টাইগার। জ্যাঠা বাবার গাড়িটা আর টাইগারকে নাকি বেচে দেবেন। কলকাতার বাড়ি ভাড়া দিয়ে, ওরা এখানে চলে এসেছে। নবু এখানকার মিশনারী স্কুলে ভরতি হয়েছে। সবাই সেখানে পড়ে। স্কুল ছুটি হলে স্কুলের কাছে খেলার মাঠে খেলে। মাসে দশ পয়সা ক্লাবের চাঁদা। গরীবদের দিতে হয় না। বন্ধুরা সবাই নিচে থাকে। টিলার ওপর নবুরা একা।

এ-বাড়িটা দাদুর বাবা করেছিলেন। বাগানের এক কোণে তাঁর সমাধি আছে। তাতে মরা মানুষ নেই। খালি একটা ছোট্ট শ্বেত-পাথরের কৌটোয় এক মুঠো ছাই। এত বড় মরা মানুষটাকে পুড়িয়ে ফেললে সে একমুঠো ছাই হয়ে যায়।

টাইগার নবুর খাটের পাশে মাটিতে শুত। কিন্তু মা-বাবা শুতে গেলে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওর খাটে এসে উঠত। বেড়াল দেখলে নবুর গা শিরশির করে, কিন্তু কুকুর বড় ভালোবাসে। তোজোর মুনিব যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে তোজো নবুদের বাড়িতে থাকবে না কেন ? বেশ পাহারা দেবে। নবু নিজে তার যত্ন করবে, স্নান করাবে। বুকটা ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল।

শম্ভুকে নবু জিজ্ঞাসা করল, "সব ছেলেপুলেই ওকে দেখতে পায় ? কই, আমি তো দেখিনি।"

"না ডাকলে আসে না। মিছিমিছি ডাকলেও আসে না। ভয় পেয়ে ডাকলে তবে আসে।"

নবু তো হাঁ। ও তো সব সময়ই ভয় পায়। এমন কি রাতের অন্ধকারে তালগাছের পাতা খসার সময় যে একটা বিশ্রী প্যাঁ-শ্ করে শব্দ হয়, তাতেও ওর ভয় করে। তোজো সঙ্গে থাকলে আর করবে না। কিন্তু তোজোর কলারটা যদি ছিঁড়ে পড়ে যায়, তাহলে

কি হবে? এখানে তো প্রত্যেক মঙ্গলবার কলার ছাড়া কুকুরদের রাস্তায় দেখলে মেরে ফেলা হয়। তাদের মধ্যে যদি পাগলা কুকুর থাকে, তাই। তোজোকে নতুন কলার কিনে দেবার পয়সা কোথায় পাবে? অবিশ্যি টাইগারের পুরনো কলারটা নবু লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। সেটা নিশ্চয় তোজোর গলায় হবে।

তার পর থেকে নবু রোজ স্কুলে যাবার সময়, বনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিত, যদি তোজোকে দেখতে পায়। ডাকেনি কখনো ; সে-রকম ভয় তো পায়নি, মিছিমিছি ডাকবে কেন? বনে ঢুকতে সাহস হ'ত না। বড্ড নির্জন। গাছের তলা দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ, বাতাস বইলে গাছের পাতার মধ্যে ঝরঝর শব্দ, যেন উঁচু থেকে জল পড়ছে। কেমন ছায়ার মধ্যে কুচি-কুচি রোদ। সব মিলে যেন ডাকে "এসো, এসো, এসো।" যায়নি কখনো। স্কুলের দেরিও হয়ে যাবে, আবার কেমন গা শিরশির করে। সে কি ভয়, না ফুর্তি, নিজেই ভেবে পেত না।

ফেরার সময় একেবারে অন্য রকম। বাপরে কি অন্ধকার বন! ঝিন্-ঝিন্ করে কি সব ডাকে। অনেক দূরে যেন কুচি-কুচি কিসের আলো নড়েচড়ে। জোনাকির চেয়ে বড়। সেদিকে তাকাতে ভয় করত। বিশুকাকার বৌ বলে পরীদের দিকে দেখতে নেই। অমনি ভুলিয়ে নে যাবে আর ফিরতে পারবে না। সারাজীবন খালি বনের মধ্যে ঘুরবে, বেরুবার পথ পাবে না, ফিরে ফিরে এক-ই জায়গায় এসে পড়বে আর বাড়ির লোকদের মুখ দেখতে পাবে না। আজকাল তত ভয় লাগে না। তোজো যদি ঐ বনে থাকে, ডাকলেই কাছে আসে, তবে আর ভয় কিসের? কুকুররা মানুষদের বন্ধু। প্রাণ দিয়ে তাদের রক্ষা করে। টাইগার একবার—নাঃ, টাইগারের কথা ভাবলেই গলায় ব্যথা করে।

সেদিন বড্ড সন্ধ্যে হয়ে গেছিল। বিশুকাকা স্টেশন থেকে ক'টা মাগুর মাছ কিনে দিল, বাবার জন্য। ওকে ওষুধ আনতে যেতে হবে, দেরি হবে। একটা ছোট্ট চুপড়িতে মাছ নিয়ে নবু টিলায় চড়তে লাগল। টিলার নিচে শম্ভুদের গেটের কাছে বিদায় নেবার সময় রামুদাদা একবার বলল, "হ্যাঁ দাদা, মাছ নিয়ে সন্ধ্যেবেলা একা গাছ-তলা দিয়ে যাবে, সেটা কি ঠিক হবে? মাছটা বরং রেখে দাও. ভোরে দিয়ে আসব।"

নবু বলল, "না, বাবা রাতে মাগুর-মাছের স্টু খাবে। তাতে গায়ে জোর হয়। আমিও একটু খাই। মা খায় না, মেয়েমানুষ কি না। ওদের জোর দিয়ে কি দরকার?" জোর করে হাসল নবু। ভেতরে ভেতরে ভয় করছিল। ভয় করলে ওর গা-বমি করত, পেট কামড়াত।

আরো কি বলতে যাচ্ছিল রামুদা, শম্ভু চটে গেল, "ভিতরে যাও তো, রামুদা, তুমি ভারি ইয়ে। এক দৌড়ে চলে যা রে নবু, কিচ্ছু হবে না।"

তাই করল নবু। তাড়াতাড়ি টিলায় উঠতে লাগল। মুখ বন্ধ করে, নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে হয় আর নিশ্বাসের তালে তালে পা ফেলতে হয়। তাহলে হাঁপ ধরে না।

ঝপ্ করে অন্ধকার। দু-পাশে বন আর মাথার ওপর ঘন কালো মেঘ। নিচে থেকে এতটা বোঝেনি নবু। পা চালিয়ে চলল। হঠাৎ সামনে কিসের ছায়া। সামনের দিকটা উঁচু, পেছনটা নিচু। মস্ত বড় হায়না নাকি? মাছের গন্ধ পেয়েছে বোধ হয়। গলা থেকে একটা চাপা খ্যাক্-খ্যাক্ শব্দ করতে করতে একটু করে এগিয়ে আসছে!

নবু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তোজো, তোজো, তোজো। অমনি বাঁ হাতের তেলোর মধ্যে নরম ঠান্ডা এ কার নাক? টাইগার আসবে কোত্থেকে? তাকে তো জ্যাঠা বেচে দিয়েছে এতদিনে। নবুর কান্না এল। তোজো, তোজো. তুই সত্যি এসেছিস্? সামনের জানোয়ারটাও থমকে দাঁড়াল। কোথা থেকে মেঘের চাপা গর্জনের মতো শব্দ হতেই এক লাফে বনের মধ্যে হাওয়া। কখন হাতের তেলো থেকে ঠাণ্ডা নাকটা সরে গেল কিচ্ছু টের পায়নি নবু। ওই কি তোজো? নাকি নবু এমনি ভেবেছিল?

মা মাছ নিয়ে বলল, 'অত হাঁপাচ্ছিস কেন? কিছু হয়েছে?"

"হ্যাঁ। না, কিছু হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে এসেছি কি না।"

সেদিন থেকে ভয় ভেঙে গেল নবুর। রোজ ছুটতে ছুটতে ওপরে চলে আসত। কোনো দিকে তাকাত না। জানত বনের মধ্যে তোজো আছে। ডাকলেই আসবে।

এমনি করে দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। বাবা তখন অনেক ভালো। বারান্দায় এসে আরাম-চেয়ারে বসে বই পড়ে। নবুকে পড়ার কথা, খেলার কথা জিজ্ঞাসা করে। মাঝে মাঝে হাসে। ওখানেও চাঁদা তুলে পুজো হত। ক্লাবের ছেলেরা যে যা পারে সংগ্রহ করে কাপ্তেনের কাছে দিল। নবু এত পয়সা নিয়ে কি করবে ভেবে পেল না। শম্ভু বলল, "আজ রাতটা তোর কাছে রাখ্, কাল সতীশবাবুর কাছে জমা দিয়ে দিস্। উনিই তো পুজো কমিটির সেক্রেটারি।"

সঙ্গে সঙ্গে রামুদা বলল, "সাবধানে যেও বাপু। কালু মাস্টারের ডাকাতের দল ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু কালু নিজে দুজন স্যাঙাৎ নিয়ে ঐ বনে লুকিয়ে আছে।"

শম্ভু বলল, "চোপ্।"

রামুদা চটে গেল, "চোপ্ তো কচ্ছি। কিন্তু গাঁয়ে ঐ রকম গুজব। ওর মামার বাড়ি তো এখেনে। লুকিয়ে খাবার দিচ্ছে তারা। কিন্তু থাকার জায়গা কোথায় পাবে? নবুর আবার পকেটে পয়সা ঝিন্-ঝিন্ কচ্ছে!" নবু কিছু না বলে, পকেটে হাত দিয়ে পয়সার ঝিন্‌ঝিন্ বন্ধ করে রওনা দিল।

তিন ভাগ পৌঁছে গেছিল নিরাপদে। তারপর যেখানে বন সবচেয়ে ঘন, সেখানে তিনটে লোক বেরিয়ে এসে পথ আগ্‌লালো। একজনের কপালে ফেট্টি বাঁধা, তাতে রক্তের দাগ। সকলে কি রকম রোগা, কালো ঘেমো, চকচকে চোখ। দেখেই ভয় করে। ঠোঁট নেই, শুধু একটা লাইনের মতো। যার মাথায় ফেট্টি বাঁধা, অন্য দু'জন তাকে ধরে রেখেছিল।

"এ্যাই দাঁড়া!"

নবু দাঁড়িয়ে গেল।

"কোথায় যাচ্ছিস?"

"বাড়িতে।"

"কোথায় বাড়ি?"

"টিলার মাথায়।"

"কে আছে সেখানে?"

"মা-বাবা।"

"চাকরটা নেই?"

"না, সে ওষুধ আনতে গেছে।"

"তবে আর কি! তোকে বাড়ি যেতে হবে না। এখানে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখব। আমরা যাব তোর বদলে।"

নবুর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, "তাহলে আমার বাবা তোমাদের..."

"তোর বাবা!" বলে সে যে কি বিশ্রী করে হাসল ওরা, শুনে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। "তোর বাবা তো ঘাটের মড়া! ভালোয় ভালোয় থাকতে দেয় তো ভালো। তা না হলে—"

নবু হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, "তোজো!" গলাটা কি রকম বিশ্রী ভাঙা ভাঙা শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে বনের মধ্যে একটা হুড়মুড় শব্দ আর তারার আলোয় নবু দেখল, এই প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছুটে এসে সেই লোকটার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেও তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কপালে ফেট্টি-বাঁধা লোকটা আর অন্য লোকটা বিকট চিৎকার করতে করতে টিলার পথ ধরে দুদ্দাড় দৌড় দিয়ে একেবারে থানার দরজায় আছড়ে পড়েছিল।

নবু চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। ঐ লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর সে একা ; হাতে মাছের চুপড়ি। তোজো কখন চলে গেছে। কিন্তু তারার আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখেছিল নবু—বড়, কিন্তু অবিকল টাইগারের মতো দেখতে।

বাড়িতে গিয়ে জ্বর হয়েছিল নবুর। তারপর যখন ভালো হয়ে উঠল, দেখল জ্যাঠা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ও কি টাইগার নাকি? নবু ভুলে তাকে তোজো! তোজো! বলে ডেকে, গলা জড়িয়ে কেঁদে ফেলল। টাইগারকে জ্যাঠা বেচে দেননি। বাবা নাকি ভালো হয়ে গেছেন। অ্যানুয়েল পরীক্ষার পর সবাই কলকাতায় ফিরে যাবে। নবুর মুখে তোজো শুনে জ্যাঠা বেজায় অবাক হয়ে বাবাকে বললেন, "শুনলি বটু, 'তোজো' বলে ডাকছে! আরে, তোজো যে আমার বাবার কুকুর ছিল। এই টিলার ওপরেই ঠ্যাঙাড়ের হাত থেকে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল।—ও কি হল?"

নবু গায়ের জোরে টাইগারকে জাপ্টে ধরে বলল, "না, না, এই তোজো! তোজো ছাড়া কেউ নয়।"

জ্যাঠা হেসে বললেন, "মনে আছে রে বটু, বাবা বলতেন তোজো বড়দের দেখতে পারত না, আর সব ছোটরা ওকে কি অসম্ভব রকম ভালোবাসত। ও মরে গেলে নাকি গাঁ সুদ্ধু ছেলেমেয়েরা সাত দিন কেঁদেছিল। ভাত খায়নি।"

নবু টাইগারের নাকে নাক লাগিয়ে ডাকল "তোজো!" আর টাইগার ওর হাতের তেলোয় নাকটা গুঁজে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

ভূ—ভূত !

আমাদের পাড়ায় একটা পুরনো বাড়ি আছে, তার বয়স হয়তো দু-শো বছরের বেশি হবে। সেখানে কেউ থাকতে চায় না। তাই বলে যেন কেউ ভেবে না বসেন যে বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মোটেই তা নয়। তবে রাতে কেউ সামনের বারান্দাটাতে যায় না। সবাই বলে সেখানে নাকি লম্বা কালো কোট পরা এক রোগা সায়েব পাইচারি করে। তার সমস্ত শরীরটা স্পষ্ট দেখা যায়, বাদে পায়ের পাতা দুটো। কি অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে যেন সে সেখানে পাইচারি করে। বিকট দেখায়। কিন্তু সে কাউকে কিছু বলে না। তবু কিছুদিন ঐ রকম দেখার পর, ভাড়াটেরা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আবার নতুন ভাড়াটে আসে।

আমাদের পাড়ার এক ফিরিঙ্গি বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম যে ওর ঠাকুরদা অনেক দিন ঐ বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন। ঠাকুরদার ছোটবেলাতেও রোগা সায়েব ঐ বারান্দায়

পাইচারি করত। কিন্তু তখন তার জ্বতোট্বতো সব দেখা যেত। তারপর দেখা গেল বেশি ব্ৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল দাঁড়ায়। সেই জল ক্রমে বারান্দার ওপর উঠতে আরম্ভ করল। অগত্যা এক প্রস্থ ইঁট বসিয়ে বারান্দাটাকে উঁচ্ব করা হল। রোগা সায়েব বোধ হয় অতটা টের পায়নি, তাই সে অভ্যাসমতো প্ব্রনো মেঝেটার ওপরেই হাঁটে। কাজেই জ্বতো দেখা যায় না।...

কলকাতার পথেঘাটে ট্রামে-বাসে যে এত অসম্ভব বেশি লোক, তাদের সকলেই সত্যিকার মান্ব্য কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ট্রামে বাসে যেখানে ধরে ঝ্বলবার মতো-ও এক ইঞ্চি জায়গা নেই, সেখানেও কি করে অনেকে লট্‌কে থাকতে পারে, এ আমার বোঝার বাইরে। শ্বনেছি একবার নাকি এক পণ্ডিতমশাই অনেক কষ্টে ছাতার বাঁটটি বাসের জানলার শিকে আটকিয়ে কোনো রকমে ঝ্বলে আছেন, এমন সময় টের পেলেন কে যেন তাঁর মেরজাইয়ের পকেটে হাতড়াচ্ছে!

ফিরে দেখে কালো কুচ্‌কুচে, রোগা টিং-টিঙে এক ছোকরা, কিছ্ব না ধরে শ্বন্যে ঝ্বলে আছে। পণ্ডিতমশাই এমনি আঁতকে উঠলেন যে ছাতার বাঁট থেকে হাত ফস্‌কে, আরেকট্ব হলেই বিতিকিচ্ছিরি এক কাণ্ড করে বসতেন, কিন্তু শ্বন্যে-ঝোলা ছোকরা খপ্‌ করে তাঁর হাত ধরে, আবার ছাতার বাঁটে লট্‌কে দিল।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মন তোমার এত ভালো, তব্ব লোকের পকেট হাতড়াও কেন?' ছেলেটা ফিক্‌ করে হেসে বলল, 'কি করব, অব্বেস!' এই বলে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আরেক ভদ্রলোক, ঝমঝম বিষ্টি মাথায় নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বড়বাজারের এক গলি দিয়ে চলেছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, তাঁর সামনে একটা লোক একপাল ছাগল-ভেড়া নিয়ে যাচ্ছে। সবাই ভিজে চ্বপ্‌চ্বড়, এমন সময় একটা পড়ো বাড়ি দেখা গেল। ভদ্রলোক শ্বনেছিলেন যে এই রকম বাড়িই বর্ষাকালে লোকের ঘাড়ে ভেঙে পড়ে, তাই একট্ব ঘাবড়াচ্ছিলেন।

তারপর যখন দেখলেন সেই লোকটা ছাগল-ভেড়া স্বদ্ধ্ব দিব্যি স্বন্দর পড়ো বাড়ির দাওয়ায় উঠে পড়ল, উনিও সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। উঠে, গা থেকে জল ঝেড়ে, একটা বিড়ি ধরালেন। তাই দেখে লোকটির চোখ চকচক করে ওঠাতে, তাকেও একটা বিড়ি দিলেন। দ্বজনে একট্বক্ষণ আরামে বিড়ি টানবার পর, ভদ্রলোক বললেন, 'এ জায়গাটা নাকি ভালো নয়।'

লোকটি বলল, 'ভালো তো নয়ই। এ পাড়ার কেউ এখানে পা দেয় না। বিষ্টির জলে ভেসে গেলেও না। ভারি বদনাম এ বাড়ির।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি ভ্বতট্বতে বিশ্বাস করি না।' লোকটির বিড়ি খাওয়া হয়ে গেছিল, মাথাট্বকু ফেলে দিয়ে বলল, 'তা আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি।' এই বলে ছাগল-ভেড়ার পাল স্বদ্ধ্ব অদ্শ্য হয়ে গেল! ভদ্রলোকও জল-ঝড়ে বেরিয়ে পড়ে ছ্বটতে লাগলেন।...

ভবানীপ্বরে একটা প্ব্রনো বাড়ি ছিল, ভাগে ভাগে ভাড়া দেওয়া। বাড়ির গিন্নির ছেলেপ্বলে ছিল না; স্বামীর সঙ্গে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি লেগেই থাকত। ঝগড়া হলেই স্বামী দ্বম-দাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন আর সে রাতে ফিরতেন না। ভয়ে ভাবনায় গিন্নির প্রাণ যায় আর কি! তখন তিনি তিনতলায় রান্নাঘরের পাশে এক ট্বকরো খোলা ছাদে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, দেবতাকে ডাকতেন।

হঠাৎ দেখতেন পাশের ভাড়াটেদের ছোট্ট ছাদে তিন-চারটে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দ্বপ্বর রাতে মহা হ্বল্লোড় লাগিয়েছে। সঙ্গে আবার কতকগ্বলো কুকুর-বেড়াল। দেখে

দেখে তাঁর মন ভালো হয়ে যেত। ছেলে-মেয়েগুলো টপাটপ মধ্যিখানের পাঁচিল টপ্‌কে এদিকে এসে, তাঁর কোলে-পিঠে চাপত আর হিন্দিতে ইংরিজিতে মিশিয়ে কি যে না বলত, তার ঠিক নেই। কোথায় নাকি চমৎকার ফল-বাগান আছে, ঝরণা আছে, আন্টিকে সেখানে নিয়ে যাবে। ছিঃ, আর কেঁদো না, ডিয়ারি।

তারপর ওঁর স্বামী বদলি হয়ে গেলেন, ওঁরাও ও-বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমে চলে গেলেন। তারপর প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর কেটে গেল। ততদিনে স্বামীর মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, গিন্নিও অনেক বেশি সুখী। একটি অনাথ মেয়েকে মানুষ করে, বিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় এসে হঠাৎ মনে হল, সেই বাড়িটা একবার দেখে আসি। গিয়ে দেখেন ঘর-দোর আরো জীর্ণ, রং-ওঠা। মনে হয় এই বাইশ বছরে কোথাও এক পোঁছ পালিশ পড়েনি।

গেলেন ওঁদের সেই তিনতলার পুরনো ফ্ল্যাটে। এখন সেখানে এক বুড়ি থাকেন। তিনি বললেন, 'তাঁর স্বামী বছর দশেক গত হয়েছেন, ছেলে-বৌ বোম্বাইতে চলে গেছে, বড়ই একা পড়েছেন। তবে পাশের বাড়ির এক গাদা ছেলে-মেয়ে, কুকুর-বেড়াল রাতে ভারি মজা করে।'

এবার গিন্নি আর কৌতূহল রাখতে না পেরে, একটা টুল টেনে নিয়ে পাশের ছোট ছাদটিতে গিয়ে নামলেন। তারপর উল্টো দিকের পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলেন, ছেলেমেয়েগুলো কোত্থেকে আসে। দেখলেন পাঁচিলের ওপাশে খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। ওদিকে কোনো ঘরের চিহ্ন নেই, জায়গাও নেই। পাশ দিয়ে একটা গলি চলে গেছে।

ভাগ্যদেবী গ্রাণ্ড হোটেল

নগার বাবার আম্রাপিসি 'কাশীর গলি-জীবন' বলে একটা বই লিখে জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। সে নাকি অতি অভাবনীয় সব তথ্যে ভরা। একশো বছর আগেকার কাশীর সাধারণ একটা সরু গলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক রকম বলা যেতে পারে হুবহু আলোকচিত্র। এমন কী, জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্থাও নাকি এর জন্য প্রথম পুরস্কার দিতে চাইছিলেন, নেহাত বিচারকরা চাক্ষুষ ভাবে ছবি না দেখে পুরস্কার দিতে রাজি নন বলে এখনকার মতো হল না। ছবি যদি হয়, তখন আর ভাবতে হবে না।

বলা বাহুল্য এ-সমস্তই নগার ছোড়দাদুর দিল্লির বাড়িতে স্বয়ং আম্রাপিসির মুখে শোনা। পুজোর ছুটিতে সেখানে নগা শটু, বেঁড়ে, উটকো, এরা সব ঐ সময়ে

গেছিল।

পিসির বয়স নব্বুই তো হবেই, কিছু বেশিও হতে পারে। খুনখুনে রোগা শরীর, ফরসা রং, চকচকে চোখ, মাথাভরা ছোট করে কাটা শাঁখের মতো সাদা কোঁকড়া চুল। খুরখুর করে সিঁড়ি ভাঙেন, থান পরেন, নিরামিষ খান, আর কোনো মানামানি নেই।

পিসি বললেন, "শীতকালে কাশী গিয়ে আমার ভাগ্যদেবী রাণ্ড হোটেলে উঠিস। চারজনে একটা ঘরে থাকলে খাওয়া-দাওয়ার পয়সা লাগবে না। ঘাটের ওপর দোতলা বাড়ি। একশো বছরের পুরনো। ৭৫ বছর আগে যখন প্রথম কাশী গেলাম, তখন আমার নিজের বলতে কিছু ছিল না। আমার বড়জেঠি কাশীবাসী হবেন, তাঁর একটা দেখাশুনো রান্নাবান্না করবার আর মুখঝামটা খাবার লোকের দরকার ছিল। আমি একটা পনেরো বছরের ফালতু বিধবা মেয়ে, সবাই মিলে আমাকে ঠেলে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। হাপ-ঝি, হাপ-পাপোশ বলতে পারিস। এখন জেঠির সেই পোড়ো বাড়িই আমার ভাগ্যদেবী রাণ্ড হোটেল! যদি কিছু ভাল জরদা এনে দিস তো সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী বলি।"

নগা তক্ষুনি উঠে গিয়ে ছোড়দিদিমার জরদার কৌটো থেকে অর্ধেকটা ঢেলে এনে দিল। তাই নিয়ে পরে ঝামেলা। দাঁতের পেছনে একটু জরদা গুঁজে আন্নাপিসি বললেন, "কাশীতে মলে সব্বাই সঙ্গে যায়, ভালরাও যায়, খারাপরাও যায়। কাশীতে সব পাওয়া যায়, টাকা-কড়ি, সুখ-সৌভাগ্য, নাম-খ্যাতি, সব। কিন্তু খুঁজতে জানা চাই। পেয়েও যদি চিনতে না পেরে দূরে ফেলে দিস, তবেই তো হয়ে গেল!

"বছর ত্রিশ আগে ঘাটের মাথায় যে কথকঠাকুর বসতেন, তিনি একদিন এইসব বললেন। আসলে হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলছিলেন, তারই মধ্যিখানে বললেন যে, সব্বাই নাকি একদিন না একদিন সৌভাগ্যের মুখ দেখে। কিন্তু নিজেরা যদি সেটা টের না পায়, তাহলে অন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাগ্যদেবী নাকি সকলকেই সমান সুযোগ পাইয়ে দেন।"

ঐ অবধি শুনেই আন্নাপিসি তেরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "যা নয় তাই বললেই তো আর সত্যি হয়ে যায় না ঠাকুর। আমার উনষাট বছর বয়স হল, আজ পর্যন্ত ভাগ্যদেবী আমাকে পেট ভরে খাবার মতো কাঁচকলাও দেননি, এ আমি একশোবার বলব।"

কথকঠাকুর তো এত কথা শুনে একেবারে থ। সেই ফাঁকে রেগেমেগে আন্নাপিসি বাড়ি চলে এসেছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র বেচারা শেষ অবধি রাজ্য ফিরে পেল কি না, তা পর্যন্ত শোনা হল না। ঘণ্টাখানেক বাদে দূর-সম্পর্কের ভাইঝি উমাদিদি ফিরতেই পিসি বললেন, "রাজ্য ফিরে পেল আশা করি? দেবতাদের দিয়ে বিশ্বাস নেই।"

উমাদিদি বলল, "পেল বই কী। তা তুমি হঠাৎ চটেমটে গেলে কেন? মন্দ কথা তো বলেনি কথকঠাকুর। সত্যিই তো ভাগ্যদেবী সব্বাইকে দেন। আমার মতো আধামুখ্যু অনাথাকেই কেমন কর্পোরেশন ইস্কুলে মোটা মাইনার চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। মোটা মাইনাই বলব, দুশো টাকা কিছু ফেলনা নয়। তারপর 'কোথায় থাকি' 'কোথায় থাকি' কচ্ছি যখন, তোমার বাড়িতে জায়গা করে দিলেন। ভাগ্যদেবী ছাড়া কে দিয়েছে এসব বলো? কত লোকে তো তা-ও পায় না।"

আন্নাপিসি রাগের চোটে উঠে বসেছিলেন। "তাই বা তাদের দেন না কেন শুনি? তোকেই না হয় দিয়েছেন কিছু খুদকুড়ো, কই, আমাকে তো কিছু দেননি?"

উমাদিদি পিসির পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "দিয়েছেন বই কী। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার কাছে। যাতে তুমি যদ্দিন বাঁচো, তোমার যত্ন করতে পারি। জেঠির এই বাড়িটা আর ভাইপোর কাছ থেকে ত্রিশ টাকা মাসোয়ারা, তাও তো তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন। দেন সবাইকে, আমরাই চিনতে পারি না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি—নাও, এখন ওঠো, হাতমুখ ধোও। বামুনের দোকান থেকে গরম হাতরুটি, নরম চানা আর গুড়ের হালুয়া এনেছি। পরশু আমরা দলের সঙ্গে গঙ্গোত্রী যাচ্ছি, এখন শরীর খারাপ করলে চলবে কী করে?"

এ-কথা শুনে পিসির রাগ পড়ে গেলেও মেজাজটা খিঁচড়ে রইল। সন্ধ্যা-আহ্নিক আগেই সেরেছিলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর উমাদিদি খাতা নিয়ে বসল আর পিসি বাড়ির সামনে গঙ্গা-ঘাটের সিঁড়িতে বসে মনে-মনে বলতে লাগলেন, 'বেশ, এখন থেকে তাই হবে। ভাগ্যদেবী যা দেবেন, তাই আঁকড়ে ধরব। দেন তো ছাই, দিলে কি আর চোখে পড়ত না! এবার থেকে আজেবাজে নোংরা-খ্যাংরা যা দেবেন মাথা পেতে নেব। ঠাকরুনের একটা পরীক্ষা হয়ে যাক—'

ঝপ করে একটা শব্দ হতেই তারার আলোয় চেয়ে দেখেন একটা টিকিওলা ন্যাড়া-মাথা ঢ্যাঙা লোক কতকগুলো কী সব ফালতু জিনিস গঙ্গায় ফেলে দিয়ে একরকম ছুটে চলে গেল। কিছু ডুবে গেল, কিছু ভেসে গেল, একটা পেতলের হাঁড়ি ঘাটের শেষ ধাপে এসে লাগল। কে জানে কার এঁটো-ছোঁয়া অশুদ্ধ জিনিস। পিসি উঠেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ভাগ্যদেবীর কথা মনে পড়াতে, ক'-ধাপ নেমে হাঁড়িটাকে তুলে আনলেন।

ঐ অবধি বলে আন্নাপিসি একটু থেমে ওদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে-ছিলেন। নগা, বেঁড়ে, বটু ইত্যাদি এত কাছে ঘেঁষে বসেছিল যে, পিসির পিঠে হাঁটুর খোঁচা লাগছিল। পিসি তাকাতেই ওরা আধ ইঞ্চি করে সরে বসে বলল, "হ্যাঁ, তারপর?"

"তারপর আবার কী? উমাকে হাঁড়ির কথা বলিনি। বেশ পরিষ্কার-ঝরিস্কার টুপটুপ করছে একটা আধসেরি পেতলের হাঁড়ি, পোড়-খাওয়া, টোল-খাওয়া, দেখলেই বোঝা যায় অনেক ব্যবহার দেখেছে। তীর্থে যাবার সময় সেটিকে ছেঁড়া গামছায় জড়িয়ে সঙ্গে নিলাম। বোঁচকাবুঁচকির মধ্যখানে এতটুকু মালুম দিল না।

"এখন শুনি বাসে চেপে বদরীনাথ যায়। ছো ছো, আমরা পায়ে হেঁটে গঙ্গোত্রী গেলাম। সঙ্গে শক্ত শুকনো অখাদ্য সব জিনিস গেল। তাই চিবিয়ে পথ চলি। পান্ডা লোকটা ভাল হলেও, ঘটে বুদ্ধি ছিল না। মোট কথা ফেরার পথে ঝড় উঠল, ধস নামল, পথ হারাল। প্রাণও যে হারায়নি সেটা ভাগ্যদেবীর দয়া।

"ধুঁকতে ধুঁকতে একেবারে আঘাটায় একটা পরিত্যক্ত গুহায় গিয়ে উঠলাম, আমরা সাতজন তীর্থযাত্রী। গুহাটা পাহাড়ের গা কেটে তৈরি। ঘরের কোণে কিছু শুকনো কাঠকুটো, কবেকার কোন্ তীর্থযাত্রীরা রেখে গেছে। ব্যস, আর কিছু না। পাথরের দেয়াল দিয়ে গুহাটা দু-ভাগ করা। উমা, আমি আর দুজন আধবুড়ি বিধবা, তিন দিন প্রায় উপোস করা শরীরগুলোকে কোনোমতে টেনে নিয়ে ভিতরের গুহায় ঢুকে পুঁটলি মাথায় দিয়ে হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর কিছু মনে নেই।

"ওরা পাশের গুহায় আগুন জেলে থাকবে। তার মিষ্টি গরমে ঘুম ভেঙে দেখি খিদের চোটে পেটের এদিক-ওদিক একসঙ্গে সেঁটে গেছে। পুঁটলি খুলে হাতড়াতে লাগলাম, যদি এক-আধটা নারকোল-নাড়ু পাই। হাঁড়িটাতে হাত পড়ল। এই বুঝি ভাগ্যদেবীর দান, ছ্যা ছ্যা! তাও যদি ক্ষীরের নাড়ু আর মুড়কি ভড়া থাকত। বলতে বলতে কী বলব ভাই তোদের, খুদে হাঁড়ি ভারী হয়ে উঠল। অন্ধকারে গামছাটার ওপর উপুড় করে ধরলাম, ঝরঝর করে নাড়ু, মুড়কি পড়তে লাগল। হাঁড়ি সোজা

করতেই থামল। গামছার ওপর নাড়ু, মুড়কির ঢিপির দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় উমাকে ডাকলাম, 'ওরে, তোদের খিদে পায়নি?' হাঁড়িটাকে তাড়াতাড়ি ঝুলিতে পুরলাম।

"খাবার দেখে সবাই হাঁ! 'ও ঠাকুমা! এত খাবার সঙ্গে ছিল, তবু কিছু বলেননি! কেমনধারা মানুষ আপনি!" উমা ছাড়া কাউকে হাঁড়ির কথা বলিনি। আড়ালে রেখে, তীর্থের যোগ্য নানারকম শুকনো খাবার বের করে সবাইকে খাইয়েছিলাম।

"তিন দিন পর আবার পথ খুঁজে পেয়ে, নিরাপদে কাশী ফিরে এলাম। আর আমাকে ফিরে দেখতে হয়নি। ঘাটের ওপর ঐ পুরনো বাড়িতে প্রথমে মোয়া, মুড়কি, তালের সন্দেশ, সুজির নাড়ু, তিলের নাড়ু, এইসবের দোকান দিলাম। তারপর বাড়িঘর মেরামত করে পরোটা, আলুর দম, কালাকান্দ, মালাই। তারপর দো-তলা হল। হোটেল হল। ভাগ্যদেবী ব্রাণ্ড হোটেল, ষাস তোরা শীতকালে। তোদের উমাদিদি ম্যানেজারি করে। চারজনে একঘরে থাকবি, আমার খরচায় খাবি। কী বলিস নগা? তোর বাপ তো আমার কাছ থেকে খরচা নিচ্ছে না। তা চমৎকার হিসেব রাখে উমা, এক পয়সা ইদিক-উদিক হয় না। তা না হলে চলত কী করে, আমি তো আর লিখতে-পড়তে জানি না— এই রে!" এই বলে জিব কেটে আন্নাপিসি চুপ করলেন।

ওরা সবাই রহস্যের গন্ধ পেয়ে বুড়িকে ছেঁকে ধরল, "তা হবে না, দিদিমণি, বলতেই হবে, লিখতে পড়তে জানো না তো কাশীর গলি-জীবন লিখে লাখ টাকার সর্বভারতীয় পুরস্কার পেলে কী করে?"

আন্নাপিসি একটু ঝাঁঝালো সুরে বললেন, "কী করে আবার পাব? ভাগ্যদেবী পাইয়ে দিলেন। যেমন করে হাঁড়ি পাইয়ে দিয়েছিলেন। তোদেরও নিশ্চয় কত কী দেন, চিনতে পারিস না বলে ফেলে দিস।"

নগা রেগে গেল, "অন্য কথা পাড়লে হবে না দিদিমণি, বলে রাখলাম। বাবাকে বলেটলে একাকার করব।"

পিসি বললেন, "ওরে, না রে! বলেছি কি বলব না? তা হাঁড়িটা খোয়া গেলেও হোটেল ভালই চলতে লাগল। কিছু ঠাকুর-বামনী রাখতে হল, এই যা। কী হল?"

"হাঁড়ি খোয়া গেল মানে? খোয়া গেল আবার কী? চুরি গেল? নাকি ভেঙে গেল? আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

"না, না, ওরকম কিছু নয়। হল কী, দিনে-দিনে ছোকরা খদ্দেরদের খাঁই বাড়তে লাগল, চাঁপ চাই, কাটলিস চাই, মুরগি রোস চাই, পুটিন চাই, হেনা-তেনা সাত-সতেরো! শেষটা উমা বলল, 'চেয়েই দ্যাখো না পিসি, কী হয়।' হল আমার মাথা আর মুণ্ডু। হাঁড়িটা হাত থেকে ছিটকে সটাং গঙ্গার গর্ভে গেল। ডুবুরি লাগিয়েও তোলা গেল না! উমা কেঁদে কেঁদে চোখ জবা ফুল বানাল।

"মনটন খুব খারাপ, ভাগ্যদেবীর দেওয়া অমন জিনিস পেয়েও হারালাম। বারবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, মা, আর দয়া-টয়া করে কাজ নেই। উমা সব ভণ্ডুল করে দেবে। বুদ্ধি করে যদি আমাকে লিখতে-পড়তে শেখাতে, তাহলে আর আমার কিছু বলবার ছিল না। এইরকম আজেবাজে কথা বলতে লাগলাম, দুঃখী লোকে যেমন বলে থাকে।

"হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হল। চমকে চেয়ে দেখি একটা টিকিওলা ন্যাড়ামাথা ঢ্যাঙা লোক, ঝুড়ি থেকে কতকগুলো হাবিজাবি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে, খড়ম পায়ে খটখট শব্দ তুলে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এমনি দৌড় দিল যে, সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"সিঁড়ির শেষ ধাপের দিকে তাকিয়ে দেখি ভাঙা ঝাঁটা ঝুড়ি ইত্যাদি। ভেসে চলেছে

আর কাগজের পুঁথি-পত্তরের মতো কী একটা ঘাটে এসে লেগেছে। আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না, ছোঁ মেরে সেটি তুলে বুকে করে ঘরে নিয়ে এলাম। জলে ভিজে চুপ্পুড়ে এক গোছা কাগজ, তার জল চুঁয়ে আমার কাপড়-চোপড়ও ভিজে গেল। তা যাক গে ভিজে, মা গঙ্গার জল তো কিছু খারাপ জিনিস নয়।

“ঘরে এসে উমাকে বললাম, 'দ্যাখ্ তো এবার ভাগ্যদেবী কী দিলেন!' উমা পুঁথিটা গামছা দিয়ে মুছে, কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'আরে, এ যে একটা পুরনো ডাইরি, না হিসাব খাতা, না কী যেন।'

“তারপর পুঁথিটা উমা আর ছাড়তে চায় না! বললাম 'তা পড়গে, পরে আমাকে বলিস।' সন্ধ্যাবেলায় উমা বলল, 'ও মাসি, প্রথম পাতাটা জলে ধুয়ে গেছে, নাম ঠিকানা তারিখ কিছু পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু তারপর যে পাড়াসুদ্ধ সকলের হাঁড়ির খবর লিখে রেখেছে বুড়ো। খুব পুরনো হবে, ভাষাটা যেন কেমনধারা। কার বাড়িতে কে কী করছে না করছে, কত আয় কত ব্যয়, কী রান্না হয়, কত খরচ পড়ে, কে কী বলেছে না বলেছে, এইসব দিয়ে ঠাসা। এমন মজার জিনিস জন্মে দেখিনি।' আমি বললাম, 'কী করে দেখবে! স্বয়ং ভাগ্যদেবীর বাড়ির গলির গল্প। হয়তো ওঁর কেরানিবাবু নকল করে দিয়ে থাকবে। এটাকে কপি করে দে দিকিনি। খবরদার কারো কাছে গল্প করবি না।' তা উমার সঙ্গে সকলের ঝগড়া, এই একটা সুবিধা।

“কপি হয়ে গেলে মৌলিক-মাস্টারকে দিয়ে পড়ালাম। উনি আমাদের বাঙালী বিদ্যালয়ের তখনকার হেডমাস্টার। বললাম, 'ভাগ্যদেবীর আশীর্বাদে লেখা হয়েছে, পড়ে দেখুন।' পড়ে মৌলিক মুচ্ছো যায় আর কী! সঙ্গে-সঙ্গে 'কাশী-কথা'য় ধারাবাহিক ছাপার ব্যবস্থা করল। প্রকাশকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তারপর একদিন পুরস্কারটাও ঘোষণা হল। ভাগ্যদেবী যখন দেন, মাচ্ছ ভেঙেই দেন। তোদেরও দেন নিশ্চয়, তোরা ছেঁড়া কাগজ মনে করে তাই দিয়ে ঘুড়িতে তাপ্পি লাগাস!”

নগারা বলতে লাগল, “কিন্তু তুমি তো লেখনি, তুমি কেন লাখ টাকার পুরস্কার পাবে? জগু রাত জেগে কত বই লেখে, কেউ ছাপেও না! তুমি লেখাপড়া পর্যন্ত জানো না!”

আন্নাপিসি বলল, “আহা, একেবারেই কি আর জানি না? চার ক্লাস অবধি পড়েছি তো! ঐ তো কেমন কাশীর গলি-জীবন, লেখিকা আন্নাকালী দেবী পেরাইজ পেয়ে গেল। তাছাড়া লেখাপড়া জানার কিছু দরকার নেই। লিখতে না পারলেও কিছু এসে যায় না। ভাগ্যদেবীর সুনজরে পড়লেই হল।”

নগা বলল, “দেখাও না একবার পুঁথিটা!”

আন্নাপিসি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, “ওমা! বলিনি বুঝি? নকল দেখে যেমন বইটা ছাপা হতে লাগল, আমার সিন্দুকে রাখা আসল বইয়ের লেখাগুলোও উপে যেতে লাগল! শেষটা কাগজগুলোও আর খুঁজেই পেলাম না!”

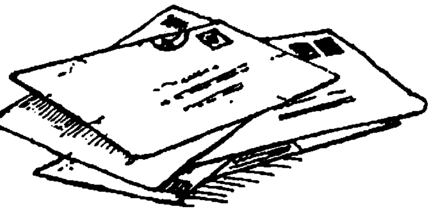

হরু হরকরার একগুঁয়েমি

কলকাতায় গেঁড়িদির বিয়ে হল। তার নিমন্ত্রণ-পত্র বিয়ের সাত সপ্তাহ পরেও যখন বোলপুরের ভুবনডাঙায় বড়দাদুর কাছে পৌঁছল না, তিনি চটে কাঁই। নাকি লোকের অভাবে বাইরের চিঠি সব ডাকে দেওয়া হয়েছিল। বড়দাদু তাতে আরো চটে গেলেন, 'ডাকে চিঠি! বলি, ডাকের চিঠি, কারো কাছে কখনো সঠিক পেঁছয় যে বলছিস্ ডাকে দিয়েছিলি?'

গেঁড়িদির বাবা অম্বিকাজ্যাঠা হলেন গিয়ে মেজদাদুর ছেলে। অবিশ্যি ছেলে ঠিক নয়, বেশ বুড়ো। বজ্জ ভালোমানুষ। বাড়িসুদ্ধু সক্কলের জন্যে নতুন কাপড়, কাঁচাগোল্লা, কালাকান্দ, ল্যাংড়া আম সঙ্গে নিয়ে, কি ব্যাপার দেখতে এসেছিলেন। কেউ গেল না কেন বিয়েতে? সবাই খুশি হল, এক বড়দাদু ছাড়া।

বড়দাদু আবার বললেন, 'চিঠি পাইনি, যাইনি, ব্যাস!' অবিশ্যি চিঠি পেলেও যেতেন না। দোতলা থেকে নামতেই পারেন না, ৮৮ বছর বয়স। রান্নাঘরের ছাদে পাইচারি করে করে বনপথের মতো দুটো চওড়া লাইন ক্ষয়ে ফেলেছেন। অম্বিকাজ্যাঠা কিছু বলছেন না দেখে বড়দাদু ঈজিচেয়ারের হাতল চাপড়ে আরো বললেন, 'হয় রেলের ডাকের থলিতে অন্য জিনিস আসে, বুঝলি? নয়তো পাঠাসনি। তা না হলে দেরি করে হলেও, এর মধ্যে এসে পেঁছত। আসলে রেলের ডাকে চিঠিপত্র আসে না আজকাল। আর শুধু আজকাল কেন, আগেও অনেক সময় আসত না। আমার দাদামশায়ের মরার আগে রেজিস্টার ডাকে পাঠানো হীরেগুলো মা-র কাছে এসে পেঁছল না কেন? তার রসিদ-ও ছিল। দাদামশায়ের ছেঁড়া গীতায় গোঁজা। তা সেটিকে বড়মামা সর্দারি করে চিতেয় তুলে দেছলেন! ব্যস্ হয়ে গেল! সে তো আমার জন্যেই পাঠানো হয়েছিল। আমিই মায়ের একমাত্র সন্তান। যদিও তখনো জন্মাইনি, তবু তাতে আমার উত্তরাধিকারের দাবি তো আর উপে যায় না?—'

হেনাতেনা কত কি বলতে লাগলেন বড়দাদু। জোড়া-শিং গুবরেকে চান করাতে করাতে আধখানা কান দিয়ে সব শুনছিল বড়দাদুর একমাত্র সন্তানের একমাত্র সন্তান উট্‌কো। গুব্‌রেটা যেমনি বদ তেমনি নোংরা, কিছুতেই চান করবে না! ঠ্যাং-এ সুতো বাঁধা সত্ত্বেও ইদিক-উদিক পালাবার চেষ্টা করে। সমস্তক্ষণ কড়া নজর রাখতে হয়। তাই গোড়ার দিকটা তত শোনা হয়নি। কিন্তু হীরের কথা কানে যেতেই কান খাড়া। দু-শিং বদ গুবরেটা সেই সুযোগে দরজার পরদা বেয়ে প্রায় ছাদ অবধি উঠতেই সুতোয় টান পড়ল। থপ্ করে মাটিতে পড়ে উল্টো হয়ে শূন্যে ঠ্যাং ছুঁড়তে লাগল। তা জোড়া শিং ভাঙুক আর না-ই ভাঙুক, উট্‌কোর খেয়াল নেই।

কাঁথা সেলাই করতে করতে বড়ঠাকুমা বললেন, 'তা বললে তো চলবে না। মাসে মাসে আমি আমকপালিতে বাপের বাড়ি চিঠি পাঠাই, পরের মাসে তার ঠিক ঠিক জবাবও পাই। আমার বাপু কোনো অসুবিধা হয় না।'

শুনে অম্বিকাজ্যাঠা পর্যন্ত অবাক! 'সে কি! রেলের ডাকে চিঠি যায়, উত্তর আসে?'

বড়ঠাকুমা কাঁথা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'অতশত জানিনে, বাপু। উট্‌কো

চিঠি ফেলে, উত্তর আসে। তাই না রে উট্‌কো?'

গুবরেকে সোজা করতে করতে উট্‌কো বলল, 'হুঃ।' জ্যাঠা বললেন, 'ডাকঘরের বাইরের ডোরাকাটা বাক্সে ফেলিস্‌ আর ডাকঘরের পেছনের খুদে জানলা দিয়ে উত্তর আনিস্‌?'

গুবরেকে বড় জালের বাক্সে ভরতে ভরতে উট্‌কো বলল, 'ঠিক তা নয় অবিশ্যি।' 'তবে? তবে?' 'ডাকে দিলে যদি না যায়, তাহলে ঠামু আমাকে ঘুড়ির পয়সা, গুলির পয়সা দেবে না। তা—' উট্‌কো থামতেই সবাই ওকে ছেঁকে ধরল, "তাই কি বল্‌, আহা থামলি কেন? তোর যদি কোনো প্রাইভেট বন্দোবস্ত থাকে তো বল্‌, আমরাও তার পৃষ্ঠপোষকতা করব—।'

উট্‌কো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বন্দোবস্ত ঠিক নয়। হয়েছে কি, হরু হরকরা যার-তার চিঠি বিলোবার ভার নেয় না।'

বড়দাদু ভারি বিরক্ত, 'বিলোবার ভার আবার কি? ডাকের থলিতে রেলে করে যায় না?'

'না। তাহলে হয়তো পেঁছবে না।'

অম্বিকাজ্যাঠা খবরের কাগজে বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখেন। তিনি বললেন, 'তবে কি চিঠি হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যায়? বুড়ো নিশ্চয়? খোঁড়াও হয়তো?'

উট্‌কো বড়দের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলত না। সে খালি বলল, 'হুঃ।' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল। ঠামু বললেন, 'সেইখানে দুটো পোস্টকার্ট রেখেছি, তাকে দিয়ে দিস্‌।' সঙ্গে সঙ্গে উট্‌কো হাওয়া।

বড়দাদু তো হাঁ! বুলিপিসি বললেন, 'আমিও তাহলে দুটো চিঠি দেব। এমনিতে তো অর্ধেক পেঁছয় না।' অম্বিকাজ্যাঠা বললেন, 'তোরা কি খেপেছিস? হরকরারা আর আছে নাকি? রেলের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও-সব উঠে গেছে। চার ঘণ্টায় রেল যায়, হরকরাদের লাগত পাঁচদিন, তা জানিস্‌?'

পিসি বললেন, "তবু তো পেঁছয় শুনেছি। একটা পরীক্ষা হয়েই যাক না।'

ততক্ষণে বিকেলের জলখাবারের সময় হয়ে গেছিল। চিড়েভাজা, ডালমুট, কুচো নিমকি মাখা, জ্যাঠার আনা সন্দেশ। বলা বাহুল্য উট্‌কো এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী। সঙ্গে আবার পাশের বাড়ির লংকাকে জুটিয়ে এনেছে। দুজনারি বারো বছর বয়স, ভয়ানক ভাব।

জলখাবারের পর ঘুড়ি নিয়ে উট্‌কো আর লংকা যেই বেরোতে যাবে, বুলিপিসি দুটো কলকাতার চিঠি দিয়ে বললেন, 'হরকরাকে দিস। দাঁড়া, ঐ টিকিটেই চলবে তো? নাকি বুড়োকে বাড়তি পয়সা দিতে হবে।' উট্‌কো বলল, 'না'। বাড়তি পয়সাকড়ি কিছু নেয় না হরু হরকরা। সে বলে—'আমরা সরকারের লোক। সরকার যা দেন সেই যথেষ্ট। চিঠি বিলি আমাদের ডিউটি, ওতে টিকিট থাকলেই হল। আজকাল ছাপ-টাপও কেউ দেখে না।' এ-সব কথা অবিশ্যি বলেনি উট্‌কো।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ঘুড়ি লাটাই সিঁড়ির নিচে রেখে গেছিল। লংকা বলেছিল, 'এগুলো দিয়ে কি হবে? আমিও হরু হরকরার কাছে যাই চল্‌।'

পেছন থেকে বড়দাদুর খাসবেয়ারা সীতেশ এক গাল হাসতে হাসতে ডেকে বলল, 'বড়বাবু বলছিলেন, হরকরাকে জিজ্ঞেস করিস্‌ হীরেগুলোর কি করল? রেজিস্ট্রি করা প্যাকেট তো হারাবার কথা নয়।'

ভারি রাগ হল উট্‌কোর। বেশ, তাই জিজ্ঞেস করবে। হরু হরকরা চোর নয়। কি ভালো ভালো গপ্প বলে মহারানীর বিষয়ে। ইন্দিরা গান্ধীই বলতে চায় বোধ

হয়, তা ঐ রকম বলে। দেশের সকলের জন্য কত ভাবেন। ডাক টিকিটের দাম কত কমিয়ে দেছেন। অথচ বড়দাদুদের কথায় উল্টো মনে হয়। কি বাজে বকে বুড়োরা, মানে হরু হরকরা ছাড়া। আর ঠামু ছাড়া। উট্‌কো যা বলে ঠামু সব বিশ্বাস করে।

লংকা বলল, 'ও কি! ঐ বাঁশতলায় যাচ্ছিস্ ঠিক সন্ধ্যার আগে? জায়গাটা খারাপ।' উট্‌কো চটে গেল, 'ধেৎ! আমি তো প্রায়ই যাই। বাঁশতলার চায়ের দোকানে হরু হরকরা আমার জন্য অপেক্ষা করে। ওকে আমি দুটো করে গোলাপী বিড়ি দিই, সীতেশদার ঘর থেকে নিয়ে। না বলে নিই। নইলে দেবে না।'

লংকা বলল, 'তোদের চিঠিপত্র নিরাপদে পেঁছে দেয় আর তুই মোটে দুটো বিড়ি দিস্? ছিঃ!' তার বেশি দেয়ই বা কি করে? হরু বলে—যাবার পথে একটা, ফেরার পথে একটা। তার বেশির কি দরকার যে নেব? কিচ্ছু জমাতে হয় না বুঝলি বাপ্, সব ছেড়েছুড়ে যেতে হয়। আমাকে দেখতে পাচ্ছিস্ তো!'

আশু পণ্ডিতের চায়ের দোকান। পণ্ডিত ওর পদবী। তবে সমস্কিতও নাকি জানে। গুড় দিয়ে আর শুকনো শালপাতা দিয়ে কি ভালো চা বানায়। হরু খাইয়েছে। আশুর চিঠি পেঁছে দেয়, আশু ওকে আর ওর বন্ধু যদি কেউ সঙ্গে থাকে, সবাইকে বিনি পয়সায় চা খাওয়ায়। পয়সাকাড়ির ধার ধারে না এরা।

হরু হরকরা বোধ হয় একটু ব্যস্ত হচ্ছিল, 'এত দেরি করলে চলে, বাপ্? চাঁদ ডোবার আগে সিকি পথ কাবার করতে হয়।' উট্‌কো বলল, 'তা দেরি হবে না, হরুদা? যেখানে যাবে চা খাবে, একটু বসবে, তামাক খাবে, বিড়ি খাবে, শালপাতার চা খাবে, গাল-গপ্প করবে, চিঠি দেবে, চিঠি নেবে—দেরি তো হবেই।'

ভাঁড়ে করে চা দিতে দিতে আশু পণ্ডিত বলল, 'তা হরুদা একটু না বসলে আমরা কি করে রাজ্যের খবরাখবর পাব? কলকাতার পোস্টকার্ট হরুদা পড়ে শোনাবে বলে আমরা সারা হপ্তা পথ চেয়ে থাকি, কি বল ভাইসব?'

চায়ের দোকানে মশার জ্বালায় চাদর-মোড়া অন্য লোকও ছিল, ওরা এতক্ষণ খেয়াল করেনি। তারা বলল, 'লিশ্চয় লিশ্চয়।' সীতেশদাদা বলে যে, বেশি 'লস্যি লিলে সব ল হয়ে যায়।'

উট্‌কো বলল, 'ঠামুর পোস্টকার্টও পড়ে শোনাও নাকি?' হরু ভারি বিরক্ত, 'এত দেরি করে এলে তা কি করে শোনাব? দুঃখ কর না, ভাইসব, আসছে হপ্তায় হবে। এখন রওনা না দিলেই নয়।' উট্‌কো আর লংকা ওর সঙ্গে চলল।

রোগা শুঁটকো মানুষটা, রোদে জলে চিঠি বিলি করে খেজুরের মতো গায়ের রং, পালকের মতো হাল্কা শরীর, বাতাসের মুখে ছুটে চলে। তা ওরা ওর সঙ্গে পারবে কেন? গোলাপি বিড়ি দুটো নিয়ে সে পা বাড়াতেই, উট্‌কো বলল, 'একটু সাহায্যের দরকার ছিল।'

ততক্ষণে বাঁশবাগান ছাড়িয়ে ঘোষদের আমবাগানে পেঁছেছে ওরা। ঝড়ে একটা আমগাছ পড়ে গেছিল। টপ্ করে হরু তার ওপর বসে পড়ে বলল, 'বল।' লংকা চাঁদের আলোয় ওকে ভালো করে দেখতে লাগল। বাঁশবনটা কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া, চেহারাটা ভালো করে মালুম দিচ্ছিল না। এখন দেখল কালচে মতো ইজের কুর্তা পরা, হাতে একটা তেলচুকচুকে বাঁশের লাঠি, কাঁধে ঝোলানো থলি। লংকা বলল, 'লাঠিতে ঘণ্টি বাঁধা থাকে, ছবিতে দেখেছি।' হরু কাষ্ঠ হাসল। 'সে আমি খুলে রেখেছি। এই সব বনে বাঘ নেই কিন্তু ডাকাতদের জানান দেবার কি দরকার? কই বাপ্, বললে না কি সাহায্য?'

উট্‌কো হরুর গা ঘেঁষে বসে বলল, 'তোমার গায়ে ধুপধুনোর গন্ধ পাই, হরুদা।

দাদু আজ যা-তা বলেছে।'

'কি যা-তা—বলবি তো?'

'নাকি রেজিস্টার ডাকে পাঠানো এক প্যাকেট হীরে হারিয়েছে। ডাকের সবাই নাকি চোর!'

চাঁদের আলোয় হরুর মুখ গম্ভীর হল, 'কে পাঠিয়েছিল? কাকে পাঠিয়েছিল? কোথা থেকে কোথায় পাঠিয়েছিল? কবে পাঠিয়েছিল?'

'দাদুর দাদামশাই মরার আগে তাঁর একমাত্র সন্তান দাদুর মা-কে পাঠিয়েছিল। আমাদের এই ভুবনডাঙার বাড়িতে, কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিল। কবে তা জানি না। দাদু তখন জন্মায়নি।'

শুনে লংকার কি হাসি! কিন্তু হরু বেজায় রেগে গেল, 'তার মানে আমাদের এই লাইনে রেজিস্টার প্যাকেট হারিয়েছিল? ডাকগাড়িতে আসছিল, না কি হরকরা আনছিল? আগে হরকরা আনত, পরে ঘোড়ার ডাক হলে, যন্দুর গাড়ির রাস্তা, তার পর থেকে হরকরায় আনত। আমি বলছি কারো কোনো হীরের প্যাকেট হারাতে পারে না। রসিদ আছে?'

'নাকি দাদামশাই ম'লে মামা সরদারি করে তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেঁড়া গীতা পুড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে রসিদ ছিল। মোট কথা আজ পর্যন্ত হীরে পেঁছয়নি। নির্ঘাৎ চুরি গেছে, দাদু বলে।' হরু চিড়বিড়িয়ে উঠল, 'নিশ্চয় ঠিকানা ভুল ছিল।' 'দাদু বলে তাহলে মরা চিঠির দপ্তর থেকে, যে পাঠিয়েছিল তার কাছে ফেরত যেত।'

হরু বলল, 'হুঁঃ! তুমি তো সব জান!! আমরা অত সহজে ছাড়ি না, বুঝলে? বছরের পর বছর ঠিক মালিককে খুঁজে বেড়াই। আমার কাছেই একটা আলাদা পুঁটলি আছে, এদিককার যত সব পথ-হারা চিঠি, পার্সেলের। তাদের ঠিকানা পাওয়া যায় না। এই দেখ—!'

কাঁধের ঝুলি নামিয়ে হরু বলল, 'একবার অজয় নদীর বানের জলে ডাকের থলি পড়েছিল। বহু চিঠি প্যাকিটের নাম ঠিকানা ধুয়ে গেছিল। কিন্তু হারায়নি। চুরিও যায়নি। বুঝলে বাপ্? আমি পিরতিজ্ঞে করেছি সবগুলো বিলি না করে ছুটি নেব না, হ্যাঁ। এ লাইনে চোরটোর নেই!'

ঝুলির মধ্যে খুঁদে একটি বাক্স। সেটি গামছার ওপর উপুড় করে ফেলতেই দশ-বারোটা ছোট বড় খাম প্যাকেট ছড়িয়ে পড়ল। হরু বলল, 'কি নাম ছিল মায়ের সেটা তো জান?' 'বগলাদেবী'। 'বরের কি নাম?' 'বর কেন আসবে, হরুদা, দাদুর মা-র তো বিয়ে হয়ে গেছিল।' 'আহা, কর্তার কি নাম ছিল?' 'ও, তাই বল। ভজহরি শর্মা।'

চাঁদের আলোয় ঘাঁটাঘাঁটি করে খুদে একটা নোংরা ন্যাকড়ায় সেলাই করা, গালা লাগানো প্যাকেট উট্‌কোর হাতে দিয়ে হরু বলল, 'এই নাও বগলাদেবী। আর কিছু পড়া যাচ্ছে না। ভুল হয়। তাই বলে চোর বলো না।' এই বলে হাউহাউ করে হরু হরকরা কেঁদে ফেলল। উট্‌কো অপ্রস্তুতের এক শেষ! 'ও হরুদা, আমি কখনো তোমাকে চোর ভাবতে পারি? ওরাও কেউ তোমাকে চোর বলেনি। যাবে একদিন আমাদের বাড়িতে? খালি বলছিল ডাকে সব চুরি যায়!'

শুনে হরু ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, 'তা যাব না। কিন্তু এই আমি তোকে বলে দিলাম, এই যে রং-ওঠা, নাম-ঠিকানা-ধোয়া, ভুল-নাম-লেখা তেরোটা চিটি বাকি রইল, এর পেরতেকটির মালিক খুঁজে বের করে তবে আমি ছাড়ব। তাম্পর ছুটি নেব। বয়স হয়েছে, আর পারিনে। তোরা তখন অন্য লোক দিয়ে চিঠি পাঠাস। প্যাকিট্‌টা বড়দাদুকে দিস্, ওনার মায়ের জিনিস। ঠিকানা নেই, তাই সেকাল থেকে

সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আবার বলে কি না ডাকে জিনিস চুরি যায়! ছিঃ!'

এই বলে হরুদা উঠে পড়ল। উট্‌কো বলল, 'ও হরুদা, ও-সব একশো বছর আগেকার চিঠিপত্র, ওর মালিক তুমি এখন কোথায় খুঁজে পাবে? ওগুলো মরা চিঠির আপিসে জমা দিয়ে দাও। এখন যেন কি নতুন নাম হয়েছে জ্যাঠা বলছিল।'

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তেরচা হয়ে একটা চাঁদের কিরণ উট্‌কোর হাতে ধরা প্যাকেটের ওপর পড়ল, একটু ফেটে গেছে, মনে হল ভেতরে কি চক্‌চক্‌ করছে। উট্‌কো বলল, 'ও হরুদা—ওদের কোথায় খুঁজবে?'

হরু হরকরা বলল, 'কেন, সেকালে!' এই বলে ওদের চোখের সামনে সেই চাঁদের কিরণটাতে টপ করে উঠে পড়ে, কিরণ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওদের চোখের বাইরে চলে গেল। উট্‌কো আর লংকা সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না।

বাড়ি পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বড়দাদুকে প্যাকেটটা দেবামাত্র তিনি সেটা কেটে খুলে হাতে একটা হীরের সীতাহার তুলে ধরে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এ যে দিদিমার সেই সীতাহার, মা-র কাছে কতবার শুনেছি। এই জলে-ধোয়া পুরনো ধুরধুরে প্যাকেট তুই কোথায় পেলি?' উট্‌কো হাঁউমাউ করে এমনি কাঁদতে লাগল যে দুঃখের চোটে জাল কেটে বেরিয়ে এসে গুবরে ওর মুখে মাথায় দুটো শিং-ই বুলিয়ে দিতে লাগল।

লংকা সব বলল। তা বড়রা কি সহজে কিছু বিশ্বাস করে। ঠিক হল কাউকে কিছু বলা হবে না। কাল সন্ধ্যায় নিজেরা গিয়ে হরু-হরকরাকে ধন্যবাদ আর কিছু বকশিশ্‌ দিয়ে আসবে। এমন বিশ্বাসী লোক আজকাল দেখা যায় না।

কোথায় হরু হরকরাকে পাবে যে ধন্যবাদ দেবে। পরদিন সন্ধ্যায় লংকার আর উট্‌কোর সঙ্গে অম্বিকাজ্যেঠা, কলকাতা থেকে ফোন করে ডেকে আনা উট্‌কোর বাবা, পাশের বাড়ির লংকার বাবা, ব্যোমকেশ কাকা, সীতেশদা গেল। বাবা আর জ্যাঠা ছাড়া সবাই শুনল বাঁশবনে মোটা মোটা খরগোশ শিকার করতে যাওয়া হচ্ছে। লাঠি, গুল্‌তি, এয়ার-গান্‌, এইসব সঙ্গে গেল।

কোথায় কি! লংকা আর উট্‌কো সেই বাঁশবাগানটাকে খুঁজেই পেল না, তা আশু পণ্ডিতের শালপাতার চায়ের দোকান আর হরু-হরকরা!! ওদের খোঁজাখুঁজি দেখে নবু মণ্ডলের কি হাসি! সে বলল, 'ছিল বটে বাঁশবন একশো বছর আগে। কোনকালে সব বেচেবুচে সাফ্‌! খরগোশ চাও তো ইলেমবাজার ছাড়িয়ে শালবনে খোঁজ। বাস্‌ যায়।' সব শুনে দাদু একেবারে থ'! উট্‌কো আর লংকা গাঁজাখুরি গল্প বলতে ওস্তাদ, কিন্তু হীরেগুলো তো আর গাঁজাখুরি নয়। উট্‌কোকে বলেওছিল হরুদা, কারো কাছে এ-সব কথা পেরকাশ করলে এমনই হবে।

আর কখনো ওরা সেই বাঁশবন খুঁজে পায়নি। চিঠিপত্র আজকাল পাঁচ দিনে, রেলের ডাকেই যায়। নয়তো স্বপনকাকা হাতে করে পৌঁছে দিয়ে আসে।

—